তফসীরে নূরুল কোরআন

তেইশ পারা

২৩

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

তেইশতম খন্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

তেইশতম খন্ড

২৩

তেইশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ.
তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ
এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

পঞ্চম প্রকাশ ঃ মে ২০১৫ইং

গ্রন্থ সত্ত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০

মোবাইল ঃ ০১৭১৩-০১৪৮৮৯, ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (V); 23. Published by Al-Balag Publications
12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A,
Dhaka-1207 Price : 350.00.

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

পরম করুণাময় অনন্ত অসীম দয়াময় আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৩ তম খন্ড রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দান করেছেন। আর এজন্যেও শোকর আদায় করি যে, তিনি তাঁর প্রদত্ত জীবন তাঁরই পবিত্র কালামের খেদমতে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করেছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ!

কোন গ্রন্থের তেইশ খন্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়া কোন ভাবেই সহজ বিষয় নয়। কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরত ও রহমতের সম্মুখে কোন কঠিন কাজই কঠিন নয়; এ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে যে কাজ হয়েছে, তা শুধু আল্লাহ পাকের রহমতেই হয়েছে। এখনও যা অবশিষ্ট রয়েছে, তা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাকের দয়া এবং তৌফিকেই সুসম্পন্ন হবে।

অগণিত দরুদ ও সালাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর শুভ দৃষ্টির বরকতে আল্লাহ পাকের রহমত অহরহ লাভ করছি এবং তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনার এ পর্যায়ে পৌঁছার তৌফিক পেয়েছি।

হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আল আওলাদ ও তাঁর আসহাবের প্রতি, পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষরাজির পাতাগুলোর সংখ্যা অনুসারে।

হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ও তাঁর আল-আওলাদ এবং তাঁর আসহাবের প্রতি, এমন দরুদ যা কোন দিন শেষ হবে না, যা চিরদিন অব্যাহত থাকবে এবং যে দরূদ আমাদেরকে তোমার অধিক দান লাভ করার মর্তবায় পৌঁছে দেবে।

পবিত্র কোরআন এমনি এক মহান গ্রন্থ, যার মহিমা অতুলনীয়, অকল্পনীয়।

পবিত্র কোরআন এমনি এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ, যা ভাষার অলংকারে, ভাবের উচ্ছ্বাসে এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অত্যন্ত বিস্ময়কর।

পবিত্র কোরআন এমনি এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ যা পদ্য নয়, গদ্য কিন্তু কবিতার ছন্দ ও স্বাদ তাতে অনুপস্থিত নয়।

পবিত্র কোরআন এমনি এক জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ, যার মধ্যে জ্ঞানের সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়; কিন্তু তা বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা সাধনের এ যুগে যখন বিজ্ঞানীরা মহাশূণ্যে তাদের গবেষণায় ব্যস্ত, তখন পবিত্র কোরআনই মহাশূণ্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। পবিত্র কোরআনের এসব তথ্যের সন্ধান পেয়েই ৪০ জন মার্কিন বিজ্ঞানী রচনা করেছেন 'The Evidence of God in an Expanding Universe' নামক একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের এবং তাঁর একত্ববাদের যে উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান রয়েছে, তার উপর গবেষণা করেই বিশ্ববিখ্যাত, ৪০জন বিজ্ঞানী উল্লিখিত গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আর কোরআনে করীম তাই ঘোষণা করেছেঃ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ.

'এবং বিশ্বাসীদের জন্যে পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে'। (সূরা জারিয়াত)

এমনিভাবে, পবিত্র কোরআন কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়; কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদান পবিত্র কোরআনেই রয়েছে।

সাধারণ অর্থে পবিত্র কোরআন কোন সাহিত্য গ্রন্থও নয়; কিন্তু তদানীন্তন আরবের প্রখ্যাত সাহিত্যিকরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম হয়েছে এবং তাদের অক্ষমতা অপারগতা পেশ করে বলেছেঃ

ليس هٰذا كلام البشر.

(এটি নয় মানুষের কথা) তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, আমরা কিভাবে পবিত্র কোরআনের পরিচিতি বর্ণনা করবো? মূলতঃ পবিত্র কোরআন নিজেই তার পরিচিতি বর্ণনা করছে, এরশাদ হয়েছে,

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

'এই কিতাব পথ প্রদর্শক, তাদের জন্যে যারা আল্লাহকে ভয় করে'।

(সূরা বাকারা)

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

'নিশ্চয় এই কোরআন মোমেনদের জন্যে হেদায়েত এবং রহমত'।

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ.

'আর কোরআন তো শুধু নসিহত, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে'।

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ ۢ بَلَغَ

'আর আমার নিকট এই কোরআন এজন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এই কোরআন পৌঁছে, তাদের সকলকে সতর্ক করি'।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট এমনি এক গ্রন্থ প্রেরণ করেছি, যাতে তোমাদের উল্লেখ রয়েছে, তবু কি তোমরা বুঝবেনা'? (সূরা আম্বিয়া)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

'(হে রসূল!) আপনার নিকট আমি এ গ্রন্থ নাযিল করেছি, যা প্রত্যেকটি জিনিষকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে'। (সূরা নাহল)

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ.

'আমি এ গ্রন্থে কোন ত্রুটি রাখিনি'। (সূরা আনআম)

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا.

'আর আমি প্রত্যেকটি জিনিষকে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি'।

(সূরা বনী ইসরাঈল)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ.

'আমি নিশ্চয় আমি এই কোরআনের মধ্যে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছি, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে'।

(সূরা যুমার)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ.....

'আর আমি নাযিল করি কোরআন, যা মোমেনদের জন্যে আরোগ্য এবং রহমত'। (সূরা বনী ইসরাঈল)

এ আয়াত সমূহে পবিত্র কোরআন স্বয়ং তার পরিচয় প্রদান করেছে এবং এমনি আরো বহু আয়াত পবিত্র কোরআনে রয়েছে, যাতে এর মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে। যারা পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে আল্লাহ পাক দয়া করে তাদের মনের কপাট খুলে দেন, তখন তারা সত্যের সন্ধান পায় এবং তারা পবিত্র কোরআনের স্বাদ উপলব্ধি করে এবং বরকত লাভে ধন্য হয়।

এখানে একথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, একদিন মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল পবিত্র কোরআনের শিক্ষার বাস্তবায়নে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে হিজরত করেন মাত্র একজন সাথী হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে নিয়ে। আর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে, আর তার দু' বছর পর বিদায় হজ্বে আগমন করেন এবং আরাফার ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন, তখন ১,২৬০০০ সাহাবায়ে কেরাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদায় হজ্বের আশি দিন পর যখন তাঁর ইন্তেকাল হয় তখন তাঁর আসহাবের সংখ্যা ছিল ১,৩০০০০। এর মাত্র তের বছর পর খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে পৃথিবীর এক বিরাট অংশে ইসলামের চন্দ্র তারকা খচিত পতাকা উড্ডীন হয়। পারশ্য এবং রোমান সাম্রাজ্য এ অত্যল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের দ্বারা পর্যুদস্ত এবং ভূলুণ্ঠিত হয়। আর তা সম্ভব হয় পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার যথার্থ বাস্তবায়ন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের ফলশ্রুতিতে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, যখন থেকে মুসলিম জাতি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা বিস্মৃত হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে গাফলত করেছে, তখন থেকেই মুসলমানদের অবনতি শুরু হয়েছে, আজ এ অবনতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইতিহাসের প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়ী মুসলিম জাতি এখন পতনোন্মুখ। শুধু তাই নয়; কাফের শক্তিগুলো মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ নিতে তৎপর হয়ে আছে। প্যালেষ্টাইন, বসনিয়া, চেচনিয়াসহ আরো বহু ক্ষেত্র একথারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

মুসলিম জাতিকে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে পুনরায় পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণে এগিয়ে আসতে হবে। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এর মর্মবাণী অনুধাবন করা পূর্বশর্ত।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা তফসীর বহু পূর্বেই রচিত হয়েছে। বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্যে এ সুযোগের অভাব অত্যন্ত পীড়াদায়ক, আর এ কারণেই আজ থেকে পনের বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল তফসীর নূরুল কোরআনের সাধনা। আলহামদুলিল্লাহ! আজ তফসীরে নূরুল কোরআনের তেইশতম খন্ড প্রকাশনার এ শুভ মুহূর্তে দরবারে এলাহীতে সেজদায়ে শোকরানা আদায় করি এবং সকল পাঠক পাঠিকার কাছে এ মহান গ্রন্থ পূর্ণ করার তৌফিকের জন্যে দোয়া চাই। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর এ সাধনা। হে আল্লাহ! তৌফিক দান কর এ মহান গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার এবং আমাদের সকলের প্রতি রহমত নাযিল কর, পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করে তার উপর আমল করার তৌফিক দান কর, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় আমাদের দোয়া কবুল কর। আমীন।

বিনীত
(মাওলানা) মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
গ্রন্থকার
২৫/১০/৯৫

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আখেরাতের চিরস্থায়ী শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে কাফেররা	১৩
আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের প্রমাণ	১৩
আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন	১৫
আয়াতের মর্মকথা	২৪
কাফেরদের ধৃষ্টতা	২৭
আল্লাহর রাহে দানের তাৎপর্য	২৮
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	৩০
কেয়ামত কবে হবে?	৩০
দোযখীদের প্রতি পৃথক হওয়ার আদেশ হবে	৩৭
শানে নুযুল	৪৬
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	৪৭
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	৫১
শানে নুযুল	৫২
পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান	৫৫
এ সূরার মর্মকথা	৬০
সূরা ইয়াসীনের ফজিলতের আরো কিছু বিবরণ	৬০
সূরা সাফ্ফা-ত প্রসঙ্গে	৬৩
এ সূরার ফজিলত	৬৪
কেয়ামতের দিন যা জিজ্ঞাসা করা হবে	৮১
মোমেনগণের মহান সাফল্য	৯৭
কাফেরদের কঠিন শাস্তি	৯৮
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা	১০৯
জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রসঙ্গে	১১৪
কাফেরদের ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা	১১৯
নেককার সন্তানের জন্যে দোয়া	১২১
হযরত ইলিয়াস (আঃ) প্রসঙ্গে	১৩৯
তসবীহ পাঠের মাধ্যমে বিপদ দূরীভূত হয়	১৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

আসমানী গজব দূরীভূত হলো ---------- ১৬০
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ---------- ১৬১
ফেরেশতাগণের অবস্থান ---------- ১৬৯
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা ---------- ১৭২
মুসলিম জাতির বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ---------- ১৭৪
সূরা ছোয়াদ প্রসঙ্গে ---------- ১৭৮
শানে নুযুল ---------- ১৭৯
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা ---------- ১৮৯
ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর ---------- ১৯১
সবর অবলম্বনের তালীম ---------- ১৯৫
আল্লাহ পাকের তৌফিক বিনা এবাদত সম্ভব হয়না ---------- ২০০
হযরত দাউদ (আঃ)-এর রায় ---------- ২০৬
হযরত দাউদ (আঃ) কেন পরীক্ষার সম্মুখীন হন? ---------- ২০৭
হযরত দাউদ (আঃ)-এর ক্রন্দন ---------- ২০৯
সাবভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যে ---------- ২১১
খলিফা এবং আধুনিক রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে পার্থক্য ---------- ২১৩
ক্ষমতা লাভের জন্যে প্রার্থী না হবার নির্দেশ ---------- ২১৫
বিশ্ব-সৃষ্টির গুঢ় রহস্য ---------- ২১৬
ভাল-মন্দের বিচার অনিবার্য ---------- ২১৯
শানে নুযুল ---------- ২২১
আল্লাহ পাকের কুদরতের খেলা ---------- ২২৯
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ ক্ষমতা ---------- ২৩৩
মানুষের কল্যাণেই ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আরজী ---------- ২৩৪
একটি সন্দেহ ও তার নিরসন ---------- ২৩৪
হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দোয়া সম্পর্কে আরও কিছু কথা ---------- ২৩৬
হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দোয়া ---------- ২৩৭
বিস্ময়কর ---------- ২৩৯
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুসংবাদ ---------- ২৪৬
নবী রসূলগণের বৈশিষ্ট্য ---------- ২৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
দোযখের শাস্তির ঘোষণা	২৫৩
দোযখের অবস্থা	২৫৪
দোযখের জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর	২৫৭
তৌহীদে বিশ্বাসের আহ্বান	২৬৩
ইবলিসের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার দৃষ্টান্ত	২৭৩
সূরা যুমার প্রসঙ্গে	২৭৮
নামকরণ	২৭৮
এ সূরার ফজিলত	২৭৯
এই সূরার আমল	২৭৯
শানে নুযুল	২৮২
মিথ্যাবাদী সত্যদ্রোহীদের শাস্তি অবধারিত	২৮৩
মানব সৃষ্টির ইতিকথা	২৮৭
এ আল্লাহ পাকই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী	২৮৯
আয়াতের মর্মকথা	২৯১
বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী	২৯৬
নেককার ও বদকার কখনও সমান হতে পারেনা	২৯৯
শানে নুযুল	২৯৯
রাতের এবাদত উত্তম	৩০১
আলেমের মর্যাদা	৩০২
শানে নুযুল	৩০৭
শানে নুযুল	৩১৩
জান্নাতে মর্যাদার পার্থক্য	৩১৫
শরহে সদরে'র ব্যাখ্যা	৩১৯
শানে নুযুল	৩২১
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	৩২৫

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

তেইশতম খন্ড তেইশ পারা

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾
ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي
شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّيٓ
ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي
يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ
أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى
الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২২) এবং আমার কী হয়েছে যে, আমি সেই মহান পবিত্র সত্ত্বার এবাদত করবো না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অথচ তোমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

(২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করবো? দয়াময় আল্লাহ পাক যদি আমাকে কষ্ট দিতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না আর তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না।

(২৪) এরূপ কাজ করলে আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো।

(২৫) নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন।

(২৬) তাকে বলা হলো, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর', সে বলে উঠলো, 'হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারতো'!

(২৭) কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং তিনি আমাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(২৮) আমি তার মৃত্যুর পর তার জাতির বিরুদ্ধে আসমান থেকে কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের কোন প্রয়োজনও ছিল না।

(২৯) একটি মাত্র গর্জন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এতেই তারা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

(৩০) মানুষের ব্যাপারে কি আক্ষেপের কথা! যখনই তাদের নিকট কোন রসূল এসেছেন তখনই তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, সিরিয়ার 'আনতাকিয়া' নামক জনপদে যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিত রসূলগণ তৌহীদের পয়গাম নিয়ে পৌঁছেন তখন ঐ জনপদবাসী তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁদেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এ সংবাদ পেয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে একজন মর্দে কামেল দ্রুত তাদের নিকট ছুটে আসেন এবং তাদেরকে বলেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে অনুসরণ কর, তাঁরা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চান না অথচ তাঁরা হেদায়েত প্রাপ্ত, তাঁরা তোমাদের কল্যাণকামী, তাঁরা তোমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিতে এসেছেন'। তিনি ছিলেন হাবীব নাজ্জার। তখন তাঁর জাতি তাঁকে বলে, 'এ ব্যক্তি আমাদের ধর্মের বিরোধী হয়ে পড়েছে, এই রসূলগণের অনুসারী হয়েছে। এই রসূলগণ যাঁর বন্দেগী করতে বলে এ ব্যক্তিও তাই বলে'।

কাফেরদের একথার জবাবে হাবীব নাজ্জার যা বলেছিলেন এ আয়াতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَالِيَ لَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

অর্থাৎ আমার কী হয়েছে যে, আমি সেই পবিত্র মহান সত্ত্বার বন্দেগী করবো না, যিনি আমাকে এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন, শুধু তাই নয়, বরং অবশেষে তোমাদের আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। এমন অবস্থায় আমি তাঁর বন্দেগী করবো না, তবে কার বন্দেগী করবো? যাঁর করুণায় ধন্য হয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্ব লাভ করেছি, অহরহ যাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত আমরা ভোগ করে চলেছি, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হওয়ার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারেনা।

হাবীব নাজ্জার এভাবে তাঁর জাতিকে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর কথার বর্ণনা-ভঙ্গি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নিজেকে নছীহত করার ভাষায় তিনি অন্যদেরকে নছীহত করেছেন।

এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হাবীব নাজ্জার একটি গর্তের মধ্যে থেকে আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। রসূলগণের বিরুদ্ধে তাঁর জাতির ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে তিনি দ্রুত সেখানে হাযির হন এবং তাদেরকে এভাবে উপদেশ দান করেন। এর পাশাপাশি তাদের ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হাবীব যখন লোকদেরকে রসূলগণের অনুসরণের আহবান জানান তখন তারা তাঁকে পাকড়াও করে বাদশাহর নিকট নিয়ে যায়। বাদশাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি রসূলগণের অনুসারী হয়েছ?' তখন তিনি বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে বলেনঃ

وَمَالِىَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝

'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবাদত করবো না, তবে কার এবাদত করবো'? অথচ আমাদের এবং তোমাদের সকলকেই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে'।[১]

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবী রসূলগণের পর এমন একটি দল রয়েছে, যাঁরা সত্যের সন্ধান লাভ করেন, তাঁদের রসনায় কলেমায়ে হক্ব উচ্চারিত হয়, তাঁরা নবী রসূলগণের অনুসরণ করে মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করেন, আখেরাতে নবী রসূলগণের পর যে মর্তবা রয়েছে, তা তাঁদেরকেই দান করা হবে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৮৪

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ্ পাকের প্রিয় বন্দা, মর্দে কামেল হাবিব নাজ্জার তাঁর পথভ্রষ্ট জাতিকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়ে বলেছেন, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন শুধু তাই নয়; বরং আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এমন অবস্থায় আমি কি করে তাঁর এবাদত না করে থাকি! তাঁর নিকট থেকে বিমুখ হয়ে জড় পদার্থের সম্মুখে মাথা নত করবো? মানবতার এমন অবমাননা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ۞

'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করবো? দয়াময় আল্লাহ্ পাক যদি আমাকে কষ্ট দিতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে না, আর তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবেনা'।

বস্তুতঃ যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি দয়াময়, করুণাময় তাঁকে বাদ দিয়ে এমন অসহায়, অক্ষম জড় পদার্থকে উপাস্য মনে করবো? যারা এত অসহায় যে, যদি আল্লাহ্ পাক আমাকে কষ্ট দিতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোন উপকারই করতে পারবে না, কেননা উপকার বা অপকার করার কোন শক্তিই তাদের মধ্যে নেই, এমন অবস্থায় আমি যদি তাদের সম্মুখে মাথা নত করি তবে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হবো। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنِّىْۤ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۞

'এমন অবস্থায় আমি স্পষ্টতঃ পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হবো'।

কোন কোন মুশরেক এ ধারণা পোষণ করে যে, এ মূর্তিরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশ করে তাদের পূজারীদের নাজাতের ব্যবস্থা করবে। পূর্ববর্তী আয়াতে এ ভুল ধারণার নিরসন করে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মূর্তিরা কোন প্রকার সুপারিশ করতে পারবেনা, যদি আল্লাহ্ পাক কোন বন্দাকে আযাব দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এ মূর্তিরা সুপারিশ করে কোন উপকার সাধন করতে পারবেনা। প্রথমতঃ সুপারিশ করারই তাদের কোন ক্ষমতা থাকবেনা, দ্বিতীয়তঃ তাদের কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবেনা, তৃতীয়তঃ তারা কোন পূজারীকে বিপদ থেকে উদ্ধারও করতে পারবে না, এক কথায় এ মূর্তিরা তাদের পূজারীদের কোন উপকার সাধনেই

সক্ষম হবেনা। এমন অবস্থায় এ অসহায় মূর্তিদের সম্মুখে মাথা নত করা পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ পথভ্রষ্টতাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কারো নিকট তা গোপন নয়।

إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ۝

এরপর হাবীব নাজ্জার সবার সম্মুখে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'তোমরা সবাই সাক্ষী থাক, জেনে রাখ, নিশ্চয় আমি ঈমান এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমার একথা শুনে রাখ'।

এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. ঐ নেককার ব্যক্তি তাঁর জাতির ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে রসূলগণকে সাক্ষী করে বললেন, 'আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনেছি'।

২. অথবা তিনি তাঁর পথভ্রষ্ট জাতিকে বললেন, 'তোমরা শুনে রাখ, তোমরা মান বা না মান, আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, আমি এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনেছি, যিনি তোমাদের প্রতিপালক'। এভাবে তিনি তাঁর জাতিকে ঈমান আনয়নে অনুপ্রাণিত করলেন। আর পূর্বোক্ত অর্থে রসূলগণকে তাঁর ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষী করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হাবীব নাজ্জার একথাটুকু বলতে পেরেছিলেন, এরই মধ্যে দুরাত্মা কাফেররা তাঁকে প্রহার করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তাঁকে ধরাশায়ী করে পদদলিত করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তাঁকে এত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় যে, তাঁর নাড়ী-ভূড়ি পর্যন্ত বের হয়ে গিয়েছিল।

আর তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, কাফেররা তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে আর ঐ অবস্থাতেও তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে হেদায়েত কর'।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, তাঁর ঘাড় কর্তন করে শহরের ফটকের সম্মুখে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। তাঁর কবর আনতাকিয়া শহরে রয়েছে।

তাঁর শাহাদতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়, এরশাদ হয়েছেঃ

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط

'তাঁকে বলা হয়, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর'। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়ার সকল দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে নাজাত দিলেন এবং চির শান্তির নীড় জান্নাতে পৌঁছে দিলেন, জান্নাতের দ্বার তাঁর জন্যে উন্মুক্ত করা হলো, তাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো, জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কণ্ঠ থেকে যে কথাটি উচ্চারিত হয়, তা হলো তাঁর জাতির জন্যে আক্ষেপ। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۝ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝

সে বলে উঠলো, 'হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারতো, কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং তিনি আমাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন'।

অর্থাৎ যে জাতি তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তাদের জন্যে তাঁর দরদের অন্ত ছিল না, তাই জান্নাতের নেয়ামত দেখে তিনি বলেছেন, 'যদি আমার জাতি জানতো যে, কি কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে জান্নাতের এত অগণিত নেয়ামত দান করেছেন, তাহলে তারাও আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতো এবং তাঁর রসূলগণের অনুসরণ করতো'!

বস্তুতঃ হাবীব নাজ্জার তাঁর জাতির কল্যাণের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।

হযরত ওরওয়াহ এবনে মাসউদ সাকাফী (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, 'হুজুর যদি অনুমতি দান করেন, তবে আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীন ইসলামের তবলীগের জন্য যেতে পারি'।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ কিন্তু এমন যেন না হয় যে, তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলে, হযরত ওরওয়াহ আরজ করলেন, হুজুর এর কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা আমার সম্প্রদায় আমার প্রতি এত শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করে যে, আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি তবে তারা আমাকে জাগ্রত করবে না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তাহলে যেতে পারেন। হযরত ওরওয়াহ (রাঃ) চলে গেলেন এবং তাঁর গোত্রের পূজনীয় লাত এবং উজ্জা নামক মূর্তির নিকট যেয়ে বললেন, 'তোমাদের বিপদ সন্নিকটে', একথা শ্রবণ করেই তাঁর গোত্রের লোকেরা রাগান্বিত হলো, তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ কর, মূর্তি পূজা বর্জন কর, এতেই রয়েছে শান্তি এবং নিশ্চিতভাবে

জেনে রাখ যে, এ মূর্তিগুলোর কোন গুরুত্ব নেই, সকল কল্যাণ ইসলামেই রয়েছে। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক দূরাত্মা তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাহাদত বরণ করলেন।

যখন এ সংবাদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলো তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এ ঘটনাটি এমনই যেমন সূরা ইয়াসীনের শুরুতে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

হযরত কা'ব আহবার (রঃ)-এর নিকট যখন হাবীব এবনে যায়েদ এবনে আসেমের উল্লেখ করা হল, তিনি বনু মাজেন এবনে নাজ্জার গোত্রের লোক ছিলেন, তাঁকে ইয়ামামার যুদ্ধে অভিশপ্ত মুসায়লামাতুল কাজ্জাব শহীদ করেছিল। তখন কা'ব (রঃ) বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ! এই হাবীবও সেই হাবীবের ন্যায়ই ছিলেন যার আলোচনা সূরা ইয়াসিনের শুরুতে রয়েছে'। মুসায়লামাতুল কাজ্জাব হযরত হাবীবকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো। তাকে তিনি বলেছিলেন, 'নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ পাকের রসূল'। তখন মুসায়লামা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার সম্পর্কে তুমি কি স্বাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল'? হযরত হাবীব (রাঃ) বললেন, 'আমি শুনিনা'। মুসায়লামা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, 'মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তুমি কি বল'? তিনি বললেন, 'আমি তাঁর রেসালতে বিশ্বাস করি'। এরপর সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, 'আমার রেসালত সম্পর্কে তোমার কি মত'? তিনি জবাব দিলেন, 'আমি শুনিনা'। তখন অভিশপ্ত মুসায়লামা বললো, 'তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তুমি শোন, আর আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বধির হয়ে যাও'। এরপর একবার জিজ্ঞাসা করে, আর তাঁর দেহের একটি অঙ্গ কেটে ফেলে, এরপর পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, আরেকটি অঙ্গ কাটে। এভাবে হযরত হাবীব (রাঃ)-এর দেহের প্রতিটি অঙ্গ একটি একটি করে কেটে ফেলা হয়। এতদসত্ত্বেও তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের উপর কায়েম ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। এরপর লোকদের উপর আল্লাহ পাকের গজব নাযিল হয়।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আনতাকিয়াবাসী যখন হাবীব নাজ্জারকে শহীদ করে ফেললো, তখন তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের গজব আপতিত হয় এবং অনতিবিলম্বে তাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়। হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর একটি মাত্র গর্জন এবং হুংকারেই আনতাকিয়াবাসী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৪

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ۝ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ۝

'আমি তার মৃত্যুর পর তার জাতির বিরুদ্ধে আসমান থেকে কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের কোন প্রয়োজনও ছিলনা। একটি মাত্র গর্জন ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা, এতেই তারা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে যায়'।

অর্থাৎ আনতাকিয়াবাসীর দৌরাত্ম এবং অত্যাচারের কারণে তাদের উপর আযাব নেমে আসে। এই বিরাট জাতিকে ধ্বংস করতে আল্লাহ্ পাক আসমান থেকে ফেরেশতাদের কোন সৈন্যবাহিনী নাযিল করেননি। এর কোন প্রয়োজনও হয়নি। যেমন বদর এবং খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের বাহিনী নাযিল করেছিলেন। আনতাকিয়াবাসীকে ধ্বংস করার জন্যে হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর একটি গর্জনই যথেষ্ট ছিল।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর সাহায্যে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করেছেন, আর একথার প্রমাণ পাওয়া যায় আয়াতের শেষ বাক্যটিতে।

وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ۝

অর্থাৎ কোন জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী প্রেরণের কোন প্রয়োজনই হয় না। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে বদরে এবং খন্দকে ফেরেশতা কেন পাঠানো হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ দু'টি যুদ্ধে ফেরেশতা পাঠানোর তিনটি কারণ ছিল। ১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে ২. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম প্রকাশ করার জন্যে, ৩. মুসলমানদের মনে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে, যেমন আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ঘোষণা করেছেন–

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ۝

'আর তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সুসংবাদ দিতে চেয়েছেন এবং তোমাদের মন যেন শান্ত থাকে, আর আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ব্যতীত তোমাদের কোন সাহায্য নেই'।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞

'মানুষের ব্যাপারে কি আক্ষেপের কথা! যখনই তাদের নিকট কোন রসূল এসেছেন, তখনই তারা তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে'।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের রসূলগণের বিরোধিতা করেছে, তাদেরকে বিদ্রুপ করেছে তাদের সম্পর্কে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, 'এ বন্দাদের প্রতি আক্ষেপ যে, তারা আল্লাহর রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে, যার ভয়াবহ পরিণতি তারা আজ দেখবে'।

তফসীরকার আবুল আলীয়া বলেছেন, যখন কাফেররা দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের আযাব দেখেছে তখনই তারা বলেছে, يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ

অথবা এ কাফেরদের উপরে জ্বীন, মানুষ এবং ফেরেশতাগণ কেয়ামতের দিন আফসোস করে বলবে, সত্য মেনে নিলে আজ তারা এ বিপদের সম্মুখীন হতোনা, তাই তাদের জন্যে শত আক্ষেপ!

এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ পাক এ পথভ্রষ্ট বন্দাদের জন্যে কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করে বলবেনঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۞

মুজাহেদ (রঃ)-ও একই মত পোষণ করেছেন।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্ পাক করুণাময়, তিনি অনন্ত অসীম দয়াময়, বন্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের অসীম দয়া মায়ার কারণেই কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক বন্দাদের জন্যে আক্ষেপ করে একথা বলবেন।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, মূলতঃ কেয়ামতের দিন কাফের মুশরেকদের জন্যে আক্ষেপ ও অনুতাপের দিন, আযাব দেখার পর প্রত্যেক কাফের ও মুশরেক সেদিন নিজেদের জন্যে আক্ষেপ করবে, আর এটিই স্বাভাবিক।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৫
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৮৬

দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং আল্লাহ পাকই তাঁর বন্দাদের দুর্গতির কারণে আক্ষেপ করে একথা বলবেন।

তৃতীয়তঃ আক্ষেপকারী হবেন মুসলমানগণ এবং ফেরেশতাগণ। মুসলমানগণ এবং ফেরেশতাগণ সেদিন কাফের মুশরেকদের মহা বিপদ দেখে আক্ষেপ করে একথা বলবেন।[১]

ইমাম কুরতবী (রঃ) আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আনতাকিয়াবাসী হাবীব নাজ্জারকে হত্যা করার পূর্বক্ষণে আল্লাহ পাক তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন এবং তাঁর সম্পর্কে এ আদেশ হয় যে, 'জান্নাতে প্রবেশ কর, দুনিয়ার কারাগার থেকে তুমি বের হয়ে এসেছ, এখন জান্নাতে অবস্থান কর'। তখন তিনি তাঁর জাতির কথা স্মরণ করে বলেন, 'যদি আমার জাতি জানতো যে, আল্লাহ পাক আমাকে কত বড় মর্যাদা দান করেছেন, কত নেয়ামত দানে ধন্য করেছেন, তবে তারাও আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতো'![২]

أَلَمْ يَرَوْا

كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن
كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ
أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ
مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن
ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ
الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾
وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৬২-৬৩
২। তফসীরে কুরতবী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৩১

তরজমা

(৩১) তারা কি লক্ষ্য করেনা? যে, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না।

(৩২) এবং অবশ্যই তাদের সবাইকে পাকড়াও করে একত্রে আমার নিকট হাযির করা হবে।

(৩৩) আর তাদের জন্যে একটি নিদর্শন হল মৃত শুস্ক জমীন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা খেয়ে থাকে।

(৩৪) আর তাতে আমি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান তৈরী করি। আর আমি তাতে ঝর্ণা প্রবাহিত করি।

(৩৫) যাতে তারা তার ফল খেতে পারে, অথচ তাদের হাত তা তৈরী করেনি, তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না?

(৩৬) পবিত্র, মহান তিনি, যিনি সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, মাটিতে যা উৎপন্ন হয় তার এবং তাদের নিজেদের এবং তারা যা জানেনা তারও।

(৩৭) রাতও তাদের জন্যে একটি নিদর্শন; আমি যখন রাত থেকে দিনকে বের করে আনি, তখন তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আনতাকিয়াবাসীর নাফরমানী এবং রসূলগণের বিরোধিতার ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর এক গর্জনের মাধ্যমে সমগ্র জাতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ লোকদের এমন ভয়াবহ পরিণাম নতুন কিছু নয়; বরং ইতোপূর্বেও যে সব জাতি আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, সত্যকে মেনে নিতে শুধু অস্বীকার করেনি; বরং সত্যের মোকাবেলায় তৎপর হয়েছে, নবী রসূলগণকে শুধু মিথ্যা জ্ঞান করেনি; বরং তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে এবং তাদের বিরোধিতাই শুধু করেনি; বরং তাদের প্রতি এবং তাদের সাথীদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, তাদের শাস্তি হয়েছে অনিবার্য। পরিণতি হয়েছে তাদের অত্যন্ত শোচনীয়। আদ জাতি, সামুদ জাতির পরিণতি এ পর্যায়ে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যারা এভাবে কোপগ্রস্ত হয়েছে তারা কখনো আর ফিরে আসবেনা। তাই যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে, তাদের পরিণতি এমনই হয়। মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে তাদেরও এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা

উচিত। দূর ও নিকট অতীতের মত মক্কাবাসী নাফরমানদেরও অনুরূপ ভয়ংকর শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে।

وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۝

'এবং অবশ্যই তাদের সবাইকে পাকড়াও করে একত্রে আমার নিকট হাযির করা হবে'।

আখেরাতের চিরস্থায়ী শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে কাফেররা

অর্থাৎ কেউ যেন একথা মনে না করে যে, নাফরমানদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে, তারা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আসলে কথা এখানেই শেষ নয়; বরং তাদের দুনিয়ার শাস্তি শেষ হলেও আখেরাতের শাস্তি রয়েছে এখনো বাকী। কেননা অবশেষে প্রত্যেককেই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির করা হবে, ঈমানদার ও নেককারদেরকে যেমন পুরস্কৃত করা হবে, ঠিক তেমনি পাপীষ্ঠ কাফের নাফরমানদেরকে তাদের নিজ নিজ অপরাধের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর সে শাস্তি হবে চিরস্থায়ী, কখনো তা শেষ হবেনা। আল্লাহর নাফরমানরা যেন কখনও এ সত্য ভুলে না যায়।[১]

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۝

'আর তাদের জন্যে একটি নিদর্শন হলো মৃত, শুষ্ক জমিন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা খেয়ে থাকে'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সে সব অবাধ্য অকৃতজ্ঞ লোকদের অবস্থা এবং পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা তৌহীদ, রেসালত ও আখেরাতকে অবিশ্বাস করতো এবং নবী রসূলগণের বিরোধিতা করতো, আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা দ্বারা তৌহীদ প্রমাণিত হয় এবং শেরকের বাতুলতা ঘোষিত হয়, এর পাশাপাশি আখেরাতের বাস্তবতা প্রমাণিত হয়।

অথবা বিষয়টি এভাবেও বলা যায়। পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে। আর এ আয়াত থেকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৮৬

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

অর্থাৎ যারা মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অবিশ্বাস করে বা অসম্ভব মনে করে তাদের জন্যে একটি জীবন্ত নিদর্শন হলো এ মৃত শুস্ক জমিন, যাকে আল্লাহ্ পাক বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নব জীবন দান করেন, তাদের লক্ষ্য করা উচিত, ধরণীর বুকে আল্লাহ্ পাকের কুদরতের জীবন্ত নমুনা বিদ্যমান রয়েছে, অনাবৃষ্টির কারণে বা গ্রীষ্মের তাপে সব কিছু যেন মৃত এবং শুস্ক ছিল। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক ধরণীকে পুনর্জীবন দান করেন, তাকে ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ করে তোলেন, ঠিক এমনিভাবেই আল্লাহ্ পাক মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রাণ সঞ্চার করে তাকে পুনর্জীবন দান করবেন, আল্লাহ্ পাকের পক্ষে এটি আদৌ কঠিন কাজ নয়।[১]

আল্লাহ্ পাকের অসীম কুদরতের প্রমাণ

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম ও বিস্ময়কর কুদরতের একটি প্রমাণ এই, জমীন যা সর্বদা তোমাদের সম্মুখেই রয়েছে, তার অবস্থার উপর চিন্তা কর, মৃত শুস্ক জমীনকে আল্লাহ্ পাক কিভাবে পুনর্জীবন দান করেন, কিভাবে তাকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করেন। কিভাবে তিনি ফলমূল উৎপন্ন করেন, যা তোমরা খেয়ে থাক।

অতএব, এ সমস্ত নেয়ামতের জন্যে মহান দাতা আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার হওয়া তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, তোমরা শোকর গুজার হওনা। এতদ্ব্যতীত, তোমরা সর্বদা লক্ষ্য কর যে আল্লাহ্ পাক জমীনের ভেতর থেকে তোমাদের জন্যে অনেক ফল-মূল বের করে আনেন, যার কোন অস্তিত্বই ছিলনা এমন বস্তু উৎপন্ন করেন যা তোমাদের ভোগ-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অতএব, মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করে জমীনের অভ্যন্তর থেকে বের করে আনা আল্লাহ্ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৩৪
তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৬৫

'আর জমীনে আমি খেজুর এবং আঙ্গুরের বাগান তৈরী করি। আর আমি তাতে ঝর্ণা প্রবাহিত করি যাতে করে তারা বাগানের ফল খেতে পারে, অথচ তাদের হাত তা তৈরী করেনি, তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না'?

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক মানব জাতির প্রয়োজনের আয়োজনে কত প্রকার ফলমূল উৎপন্ন করেন, তার হিসেব রাখাও কঠিন। সমস্ত বাগ-বাগিচা, তার নানা প্রকার ফল মূল সবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান এবং আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন। এসব উৎপাদনের জন্যে মানুষ জমীনে মেহনত করে জমীনকে নরম করে, সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু মানুষের হাত কি এসব ফলমূল তৈরী করে? কখনও নয়; বরং এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান। অতএব, এ অনন্ত অসীম দানের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষের কৃতজ্ঞ থাকা একান্ত কর্তব্য। আর যে হাত দ্বারা মানুষ মাটিতে বীজ বপন করে, সে হাতও আল্লাহ পাকেরই দান। যে মনে সে ইচ্ছা করে সে ইচ্ছা শক্তিও আল্লাহ পাকেরই দান এবং সে মনও আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি। অতএব, মানুষের নিকট যা কিছু রয়েছে অথবা যা কিছু সে লাভ করে সবই আল্লাহ পাকের দান, মহান দাতা আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতায় সেজদারত হওয়া তাই মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, আধুনিক বিজ্ঞানের বদৌলতে যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে মানুষ অনেক কিছুই লাভ করেছে। বিজ্ঞানীদের এ উদ্ভাবন শক্তিও আল্লাহ পাকেরই দান, তার নিজস্ব কিছুই নেই, তাই সর্বাবস্থায় প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতে হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

'তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না'?

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

'পবিত্র মহান তিনি, যিনি সব কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, মাটিতে যা উৎপন্ন হয় তার এবং তাদের নিজেদের এবং তারা যা জানেনা তারও'।

আল্লাহ্ পাকের কুদরতের নিদর্শন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে أَفَلَا يَشْكُرُونَ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পন্থা হলো আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা। এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর বন্দেগীর মাধ্যমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু কাফেররা তা করেনা, এতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে তথা শেরক করেছে যা সবচেয়ে বড় জুলুম। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াত শুরু করেছেন سُبْحٰنَ শব্দ দ্বারা, অর্থাৎ তিনি পবিত্র সর্বপ্রকার শেরক থেকে, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনিই সৃষ্টি করেছেন সকল কিছুকে জোড়ায়-জোড়ায়, এটি তাঁর সৃষ্টির মহিমা যে, সব কিছু তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, যেমন মানুষ নারী-পুরুষ, তেমনি পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু সবই রয়েছে নর-মাদীতে বিভক্ত। এমনিভাবে সাদা-কাল, দিবা-রাত্রি, সকাল-সন্ধ্যা, আলো-আঁধার। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে রয়েছে এ ব্যবস্থা যে, একটির জোড়া আরেকটি সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান। একটির সমতুল্য আরেকটি বর্তমান। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বাই বেজোড়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই, তিনি একমাত্র স্রষ্টা, আর সবই সৃষ্টি, সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে, কিন্তু তাঁর লয় নেই, তিনি চির বিরাজমান, সর্বত্র বিদ্যমান, তিনি ইচ্ছা করলে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে এক মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন এবং নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন। এজন্যে কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

'তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে বিদায় করতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন'।

অতএব, বিশ্ব সৃষ্টির এ মনোরম দৃশ্য দেখে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করা এবং তাঁর বন্দেগী করা পরিণামদর্শী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝

'আর তাদের জন্যে রাতও একটি নিদর্শন, আমি যখন রাত থেকে দিনকে বের করে আনি, তখন তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে জমীনের একটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষের আবাসস্থল, আর এ আয়াতে রাত ও দিনের গমনাগমণের নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল স্থানের নিদর্শন, আর এ আয়াতে হলো সময় বা কালের নিদর্শন। স্থান ও কালের বিষয়টি মানুষের বোধগম্য, তাই বুদ্ধিমান মাত্রেরই এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে, কিভাবে আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বের আলোকে ছিনিয়ে নেন এবং বিশ্ববাসীকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দেন, পুনরায় নির্ধারিত সময়ে সূর্যোদয়ের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেন, রাত ও দিনের এ পরিবর্তন বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমত অনুধাবনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ নিদর্শন। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ-

(সূরা আলে এমরান)

'নিশ্চয় আসমান ও জমীনের সৃজণে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে রয়েছে বহু নিদর্শন'।

যারা বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, যারা বিশ্বসৃষ্টির গতিধারা সম্পর্কে এতটুকু চিন্তা ও গবেষণা করে, তারা সর্বত্র এক মহাশক্তির অদৃশ্য ক্ষমতা লক্ষ্য করে। তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়। রাত ও দিনের এ গমনাগমন ব্যবস্থায় কখনো কোন পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়না, এক নির্ধারিত সময়ে যথা নিয়মে রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটছে, এটি সম্পূর্ণ এক আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। এর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য কখনো পরিলক্ষিত হয়না। সমগ্র বিশ্ববাসী একত্রিত হয়ে এবং তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেও আল্লাহ পাকের এ ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়। যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা, যিনি রাত ও দিনের পরিবর্তন করেন, যিনি নীলাভ আকাশকে তাঁর কুদরতের নিদর্শন স্বরূপ ঝুলিয়ে রেখেছেন, যিনি বিশাল বিস্তৃত জমীনকে বিছিয়ে রেখেছেন, তিনি ধরণীর বুকে অগণিত মানুষকে সৃষ্টি করে তাদের ভোগ-সম্পদের ব্যবস্থা রেখেছেন, তিনিই আল্লাহ, তিনিই মা'বুদে বরহক্ব, তিনিই বিশ্ব-স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিযকদাতা, তিনিই ভাগ্য নিয়ন্তা; শুধু তাঁরই বন্দেগী করা এবং তাঁর শোকর গুজার হওয়া মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنۢبَغِي
لَهَآ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا۟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَ
مَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ

তরজমা

(৩৮) আর সূর্য পরিভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণ।

(৩৯) আর চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মঞ্জিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, অবশেষে তা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খেজুর ডালের ন্যায় হয়ে যায়।

(৪০) সূর্যের পক্ষে সম্ভবই নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, আর রাতের পক্ষেও সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।

(৪১) আর তাদের জন্যে এটিও একটি বিশেষ নিদর্শন যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম।

(৪২) এবং (স্থলভাগে তাদের ভ্রমণের জন্যে) অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহন করে।

(৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করে (মেরে) ফেলতে পারি, এরপর কেউ তাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করতে আসবে না এবং তারা নিস্কৃতিও লাভ করবে না।

(৪৪) তবে শুধু আমার রহমতের ফলে এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পার্থিব জীবনের উপভোগ প্রদান করার সিদ্ধান্তের কারণে।

(৪৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সে আযাবকে ভয় কর যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তোমাদের পশ্চাতে (মৃত্যুর পরে) রয়েছে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

(৪৬) আর যখনই তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন নির্দেশ আসে, তখনই তারা তা উপেক্ষা করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ 'রাতও মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন, আমি যখন রাত থেকে দিনকে বের করে আনি, তখন তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে'।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, রাত ও দিনের পরিবর্তন কিভাবে হয়? এর জবাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ۞

'আর সূর্য পরিভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণ।

অর্থাৎ সূর্যের পরিভ্রমণের মাধ্যমে রাত ও দিন নির্দিষ্ট হয়, সূর্যোদয়ের মাধ্যমে রাতের আঁধার বিদূরিত হয় এবং দিনের আগমন হয়।

দ্বিতীয়তঃ সূর্যের গতিপথ সুনির্দিষ্ট, এর মধ্যে এদিক-সেদিক হবার কোন ব্যবস্থা নেই, এমনকি এক মুহূর্ত আগে পরে করারও কোন সম্ভাবনা নেই এবং এর কোন ক্ষমতাও নেই, কেননা সূর্য সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মহাজ্ঞানী, আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

তৃতীয়তঃ সূর্য অবিরাম তার কক্ষপথে পরিক্রমণরত রয়েছে। তার গন্তব্যস্থল যেমন সুনির্দিষ্ট ঠিক তেমনি তার কক্ষপথও রয়েছে সুনির্ধারিত। কখনও এর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়না, সূর্য যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু করে, সেখানেই পুনরায় ফিরে আসে, অর্থাৎ প্রতি দিন পূর্বাকাশ থেকেই সে উদিত হয়, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত সে পরিভ্রমণরত থাকবে। কিন্তু কেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক সে পূর্বাকাশের স্থলে পশ্চিমাকাশে উদিত হবে। এ পর্যায়ে হযরত আবু

জর (রাঃ) বর্ণিত এবং বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আমি একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলাম, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করলেন, 'তুমি কি জান এ সূর্য কোথায় অস্ত যায়'? আমি আরজ করলাম, 'আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই তা ভালভাবে জানেন'। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'সূর্য প্রতি দিন (অস্ত যাওয়ার পর) আল্লাহ পাকের আরশের নীচে সেজদারত হয় এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। আল্লাহ পাকের দরবার থেকে অনুমতি লাভের পর সূর্য পুনরায় পূর্বাকাশে উদিত হয়। অদূর ভবিষ্যতে একদিন তাকে বলা হবে, 'যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও'। তখন সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত হবে'।[১]

আলোচ্য আয়াতের مُسْتَقَرٌّ শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

১. কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো গন্তব্যস্থল, অর্থাৎ দৈনিক পরিভ্রমণের পর সূর্য যেখানে পৌঁছে তাকেই مُسْتَقَرٌّ বলা হয়েছে।

২. অথবা সূর্য এক বছর পরিভ্রমণ করে যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে তাকেই مُسْتَقَرٌّ বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ৩৬৫ দিন সূর্যের উদয় হবার জন্যে যেমন স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে, ঠিক তেমনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে অস্ত যাবার জন্যেও স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। এক বছরের মধ্যে সূর্য আর ঐ স্থানে উদিতও হবেনা, অস্তও যাবেনা, এভাবে পরিভ্রমণ করে সূর্য এক বছর পর যেখানে পৌঁছবে তাকেই مُسْتَقَرٌّ বলা হয়েছে।

৩. সকালে পরিভ্রমণ শুরু করে সূর্য উপরের দিকে যেতে থাকে, ঠিক দুপুরে যে মঞ্জিলে পৌঁছার পর সূর্যের উপরের দিকে পরিভ্রমণ বন্ধ হয় এবং নীচের দিকে পরিভ্রমণ শুরু হয়, সে মধ্যস্থলটিকেই مُسْتَقَرٌّ বলা হয়েছে কেননা, ঐ মঞ্জিলে সূর্যের গতি শ্লথ হয়ে যায়, মনে হয় সূর্য থেমে গেছে।

১। সূর্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৫-৩৭

৪. অথবা তা হলো সূর্যের পরিভ্রমণের শেষ মুহূর্ত অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের পূর্ব মুহূর্ত। কেননা কেয়ামত পর্যন্ত সূর্য তার পরিভ্রমণ অব্যাহত রাখবে। এরপর আল্লাহ পাকের হুকুমে তা বন্ধ হয়ে যাবে। সূর্যের উদয় বা অস্ত বলে কিছুই থাকবেনা।

৫. অথবা مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা মহান আরশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কেননা, বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূর্য প্রত্যেক রাতে আরশের নীচে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত হয় এবং পুনরায় উদিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভের পরই পুনরায় উদিত হয়, তাই আরশে এলাহীকে আলোচ্য আয়াতে مُسْتَقَرٌّ বলা হয়েছে।[১]

যাহোক, সূর্যের উদয়-অস্ত-পরিভ্রমণ এক কথায় সব কিছুই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সুনির্ধারিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, এতে কোন পরিবর্তন করার বা কোন প্রকার হস্তক্ষেপের ক্ষমতা কারোই নেই। এটি আল্লাহ পাকের কুদরতের এক বিস্ময়কর নমুনা ও জীবন্ত নিদর্শন। বুদ্ধিমান মাত্রকে এসব নিদর্শন দেখে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আনুগত্য প্রকাশ করা উচিত।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ۝

'আর চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মঞ্জিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, অবশেষে তা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খেজুর ডালের ন্যায় হয়ে যায়'।

পূর্ববর্তী আয়াতে সূর্যের পরিভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে চন্দ্রের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সূর্যের ন্যায় চন্দ্র এক অবস্থায় থাকেনা; বরং ছোট বড় হয়, আর চন্দ্রের জন্যে আল্লাহ পাক আটাশটি মঞ্জিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় চন্দ্র এসব মঞ্জিল পরিভ্রমণ করে। চন্দ্র এবং সূর্য প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে থাকে। চান্দ্র মাসের শুরু থেকেই চন্দ্রের আলো বৃদ্ধি পেতে থাকে, চোদ্দ তারিখ রাতে চন্দ্রের আলো পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর ঐ আলো কমতে শুরু করে, মাসের শেষে চন্দ্র অত্যন্ত সরু হয়ে শুষ্ক, বক্র খেজুর ডালের মত হয়ে যায়। এমনকি, দু' রাত একেবারে লুকিয়ে থাকে। এরপর এক তারিখ থেকে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে এবং ধারাবাহিকভাবে তার আলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। চন্দ্রের এ লুকিয়ে থাকা এবং আত্মপ্রকাশ করা, আলো কম হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া-এসবই আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৩৬-৩৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৪৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৮

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط

'সূর্যের পক্ষে সম্ভবই নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, আর রাতের পক্ষেও সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা'।

অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের জন্যে আল্লাহ পাক নিয়ম-নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সূর্যের কার্যক্রম চলে দিনের বেলায়, চন্দ্রের আলো বিকীরণ হয় রাতের অন্ধকারে। চন্দ্র যখন জ্যোৎস্নায় বিশ্বকে আলোকিত করে, সূর্য তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারেনা, ঠিক তেমনি দিনের জন্যে যে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, রাত সে সময়ে আসতে পারেনা। রাত ও দিনের গমনাগমনের সুনির্দিষ্ট, সুনিয়ন্ত্রিত সময়, নিয়ম-নীতি, পরিভ্রমণ পথ, এর মধ্যে কোনটিতেই কোন প্রকার পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোই নেই। এটি পুরোপুরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তাঁর অসীম কুদরতের জ্বলন্ত নিদর্শন। আল্লাহ পাক যেভাবে সমগ্র মহা জগতকে যুগ যুগ ধরে এভাবে কার্যকর রেখেছেন, তাঁর পক্ষে মানব জাতিকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত ও উত্থিত করা আদৌ কঠিন কিছু নয়। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ۝

'আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে'।

অর্থাৎ এর প্রত্যেকটি সৃষ্টিই, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। এসবের দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। আর সব কিছুই আল্লাহ পাকের নির্ধারিত নিয়ম-কানুনের আওতায় রয়েছে এবং চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জ সবই সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করছে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত রয়েছে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মানুষের সেজদার অর্থ হলো জমীনের উপর তার কপাল রেখে দেয়া, কিন্তু চন্দ্র সূর্যের সেজদার প্রকৃত রূপ আল্লাহ পাকই জানেন। এমনিভাবে মানুষের তসবীহ হলো রসনা দ্বারা সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা, কিন্তু চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জের তসবীহ পাঠের প্রকৃত রূপ আল্লাহ পাকই জানেন, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ

'প্রত্যেকেই তার নামায এবং তস্‌বীহের পন্থা সম্পর্কে অবগত'।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

'আর তাদের জন্যে এটিও একটি নিদর্শন যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের এবং তাঁর অপার করুণার নিদর্শন সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করে মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত এবং কৃতজ্ঞ থাকবে। আলোচ্য আয়াতেও এ পর্যায়ে আরো একটি নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে তা হলো, পৃথিবীর সামুদ্রিক ভাগে মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থা। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

অর্থাৎ যেভাবে চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয় এবং আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের নিদর্শন দেখতে পায়, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি মানুষকে নূহ (আঃ)-এর তরীতে আরোহণ করিয়েছিলেন। তদানীন্তন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যারা নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারা তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর নির্মিত নৌকায় আরোহণ করেছিল। আল্লাহ পাকই হযরত নূহ (আঃ)-কে একটি তরী নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন, এভাবে আল্লাহ পাক সেদিন মানব বংশকে রক্ষা করেছিলেন, যদি নূহ (আঃ)-এর নৌকায় সেদিন মোমেনগণ আরোহণ না করতেন তবে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই থাকত না। আজ যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধী হয়েছে, পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করছে, তারা এখন কোথায় থাকত? আল্লাহ পাকের করুণা-ধন্য হয়েই মানুষ পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করে আর আজো পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

তফসীরকারগণ এ আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যাও করেছেন, মানুষের জন্যে এটিও আল্লাহ পাকের একটি নিদর্শন যে, মানুষ নৌযানে আরোহণ করে সাগর-মহাসাগর পাড়ি দেয়, সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গের মোকাবেলায় মানুষের নৌযানগুলো কীট-পতঙ্গের চেয়ে অধিক কিছু নয়; কিন্তু আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহে তিনি সমুদ্রের ভয়াবহ তরঙ্গের আঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। এটিও আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত সমূহের মধ্যে অন্যতম এবং তাঁর বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ۞

'আর সমুদ্র যানের ন্যায় (স্থলভাগে) তাদের ভ্রমণের জন্য আল্লাহ পাক যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন'।

যেমন উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি। বস্তুতঃ মরুভূমির জাহাজ হলো উষ্ট্র এবং অশ্ব, এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান, আর এজন্যে মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ۞

'আর আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করে (মেরে) ফেলতে পারি, এরপর কেউ তাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করতে পারবেনা, তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষাও করতে পারবেনা'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। এটি আল্লাহ পাকের নিতান্ত করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তিনি মানুষকে এভাবে নিমজ্জিত করে মারেন না, তাদের সলিল সমাধি রচনা করেন না, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ۞

অর্থাৎ আল্লাহ পাক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষকে জীবন উপভোগ করার সুযোগ দান করেন। এটি তাঁর রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়। মানুষ অহরহ তাঁর এ রহমত ভোগ করতে থাকে, কিন্তু ভাগ্যাহত মানুষ আল্লাহ পাকের এ রহমত উপলব্ধি করেনা এবং আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হয়না। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ۞

'এবং অতি অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহ পাকের শোকর গুজার'।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۞

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সেই আযাবকে ভয় কর যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ 'যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে' এর অর্থ হলো, আখেরাত। আর وَمَا خَلْفَكُمْ 'যা পশ্চাতে রয়েছে' দ্বারা দুনিয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ আখেরাতের জন্যে নেক আমল সংগ্রহ কর আর দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান থাক, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়োনা।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, ইতোপূর্বে পৃথিবীতে যে কাফের মুশরেকরা আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়েছে তাদের সে সব ঘটনাবলীকে مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর وَمَا خَلْفَكُمْ দ্বারা আখেরাতের আযাবকে বোঝানো হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা আসমানী-জমিনী বালা মসিবতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ অর্থ হলো দুনিয়ার আযাব আর وَمَا خَلْفَكُمْ হলো আখেরাতের আযাব।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো আগের পরের গুনাহ সমূহ।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন এ মর্মে যে, হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! তোমাদের সম্মুখেই রয়েছে মহা বিচারের দিন, আর পেছনে রয়েছে সমগ্র জীবনের গুনাহ সমূহ; অথচ বিচারের মুহূর্ত আসন্ন, এমনি অবস্থায় তোমরা সতর্ক হও, আল্লাহ পাকের নাফরমানী তথা পাপাচার পরিহার কর, আখেরাতের জন্যে সম্বল সংগ্রহ কর, আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হও, যদি এ পথ অবলম্বন কর তবে আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হবে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের রহমত পেতে হলে তাঁর আযাবকে ভয় করতে হবে এবং তাঁর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে, শুধু এ পন্থায়ই মানুষ আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হতে পারে।[১]

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ۝

'আর যখনই তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন নির্দেশ আসে তখনই তারা তা উপেক্ষা করে'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৫৫
তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৮২-৮৩

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের আযাবকে ভয় করার নির্দেশ রয়েছে এবং আখেরাতের জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করা হয়েছে। এর পূর্বে কয়েকখানি আয়াতে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, এ দূরাত্মা কাফেরদের অবস্থা হলো, যত নিদর্শনই তাদের নিকট আসুক না কেন, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনা, সতর্কতা অবলম্বন করেনা; বরং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বর্ণিত নিদর্শন সমূহ থেকে তারা বিমুখ থাকে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের সম্পর্ক হলো পূর্ববর্তী অন্য একখানি আয়াতের সঙ্গে আর তা হলোঃ

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ - الاية

অর্থাৎ 'তাদের নিকট যে রসূলই আসুক না কেন, তারা তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করে', আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 'তাদের নিকট যে নিদর্শনই আসুক না কেন, তারা তা থেকে বিমুখ থাকে', অতএব, তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তাদের পরিণতি ভয়াবহ।

وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ
إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم
مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا
مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৪৭) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে রিয্ক দান করেছেন তা থেকে তোমরা কিছু ব্যয় কর, তখন কাফেররা মোমেনদেরকে বলে, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াব'? তোমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতেই রয়েছ।

(৪৮) আর এ কাফেররা বলে, '(কেয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল'।

(৪৯) তারা তো শুধু একটি হুংকারেরই অপেক্ষায় রয়েছে, যা তাদেরকে আক্রমণ করবে যখন তারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকবে।

(৫০) তাই তারা তখন ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবেনা, আর তাদের পরিবারের লোকদের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা।

(৫১) আর শিংগায় ফুঁক দেয়া মাত্র তারা কবর থেকে বের হয়ে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে।

(৫২) তারা তখন বলবে, 'হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠিয়ে দিল'? (তখন ফেরেশতাগণ বলবেন) 'এটি তাই, করুণাময় আল্লাহ পাক যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং নবী রসূলগণ যে সত্য ঘোষণা করেছিলেন'।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেরদের নিকট যত নিদর্শনই প্রদর্শন করা হোক, যত দলিল প্রমাণই উপস্থাপন করা হোক তারা তা থেকে বিমুখ থাকে, তাদের ভবিষ্যতের চিন্তাও নেই এবং অতীতের পাপাচারের শাস্তির ভয়ও নেই, তারা তাদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতায় অবিচল রয়েছে।

আর এ আয়াতে কাফেরদের একটি ধৃষ্টতার বর্ণনা রয়েছে, তা হলো মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করা, সমাজের দারিদ্র্য-প্রপীড়িত দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা, এ কাজটি সকল যুগে এবং সকল দেশ ও পরিবেশে প্রশংসনীয় এবং অভিনন্দিত হয়ে এসেছে, কিন্তু এ কাফেররা এমন ভাল কাজেও অনীহা প্রকাশ করেছে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ

'আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে রিয্ক দান করেছেন তা থেকে তোমরা কিছু ব্যয় কর, তখন কাফেররা মোমেনদেরকে বলে, 'যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন, তাকে আমরা কেন খাওয়াব'?

কাফেরদের ধৃষ্টতা

কাফেরদেরকে যখন মানবতার কল্যাণ সাধনের তথা দুর্গত মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার আহবান করা হয় তখন তারা তা অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখায়, তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে রিয্ক প্রদান করেছেন তা থেকে কিছু পরিমাণ ব্যয় কর, নিরন্নকে অন্ন দান কর, দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য কর কিন্তু তারা এর জবাবে বলে, আল্লাহ্ পাক যাদেরকে ইচ্ছা করলে খাবার দিতে পারতেন কিন্তু তিনি দেননি, আমরা কেন তাদেরকে দেব? আল্লাহ্ পাকের অভিপ্রায় হলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে দান করতেন। যখন তিনি তাদেরকে দান করেননি তখন তাদেরকে দান করা তাঁর মর্জির পরিপন্থী কাজ হবে, আমরা এ কাজ করবো না। এ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি শুধু মক্কার কাফেরদেরই নয়; বরং এ যুগের কোন কোন নাস্তিকও এমন অযৌক্তিক, আপত্তিকর মন্তব্য করে।

যে সত্য এ নির্বোধ কাফেররা এবং তথাকথিত শিক্ষিত নাস্তিকেরা উপলব্ধি করেনা তা হলো, আল্লাহ্ পাকের দান কোন উসিলার মাধ্যমে আসে, সরাসরি তিনি কারো জন্যে আসমান থেকে রিয্ক প্রেরণ করেন না, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। যেমন জমীন থেকে খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয়, মানুষ কৃষিকাজে মেহনত করে, তার ফলে খাদ্য-দ্রব্য লাভ করে। কিন্তু উৎপাদনকারী মানুষ নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহ পাক। মানুষ লাভ করে আল্লাহ্ পাকের দান, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ۝ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ۝ لَوْ نَشَآءُ
لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ۝ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۝

(সূরা ওয়াকেয়াহ ঃ ৬৩-৬৭)

'তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, এমন অবস্থায় তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। তখন তোমরা বলবে, 'আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে, আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি'।

অতএব, প্রকৃত দাতা আল্লাহ পাকই, কিন্তু তিনি দান করেন জমীন এবং মানুষের মেহনতের মাধ্যমে। আল্লাহ পাকের দান এভাবে লাভ হয়।

আল্লাহর রাহে দানের তাৎপর্য

এমনিভাবে আল্লাহ পাক কিছু লোককে পরীক্ষামূলক ভাবে অর্থ-সম্পদ দান করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর রাহে দান করার নির্দেশ প্রদান করেন, ধনীদেরকে গরীবদের দানের জন্যে উসিলা হিসেবে ব্যবহার করেন। এর দ্বারা ধনীদেরকে পরীক্ষা করা হয়, কে আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত ব্যয় করে? আর কে কার্পণ্য করে। অথচ হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, দানবীর ব্যক্তি আল্লাহ পাকের বন্ধু, আর কৃপণ আল্লাহ পাকের শত্রু। আল্লাহ পাক ধনীদেরকে দান করার যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তার তাৎপর্য হলোঃ হে আমার বন্দাগণ! আমি তোমাদেরকে যে অর্থ-সম্পদ দান করেছি তা থেকে তোমরা দরিদ্র লোকদেরকে দান কর, তোমাদের হাতে যে অর্থ-সম্পদ রয়েছে তা আমারই দান এবং তোমাদের নিকট আমার আমানত, আমি যখন ইচ্ছা তা তোমাদের নিকট থেকে নিয়ে নিতে পারি, অতএব তোমরা আমার নির্দেশ মোতাবেক আমার প্রদত্ত নেয়ামত ব্যয় কর এবং দুঃখী মানুষকে সাহায্য কর। আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তিকে ধন-সম্পদ দিয়ে শোকরের পরীক্ষা করেন, আর কোন ব্যক্তিকে দারিদ্র্য-প্রপীড়ত করে সবরের পরীক্ষা করেন। এর হেকমত একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। তবে বন্দার কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মোতাবেক জীবন যাপন করা, তাঁর নেয়ামতের শোকর করা, তাঁর রাহে দান করা, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন, এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রতি দিন সকাল থেকে দু'জন ফেরেশতা দোয়া করেন, একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! যে তোমার রাহে দান করে, তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দাও', আরেকজন ফেরেশতা দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ! যে তোমার রাহে দান করার ব্যাপারে কার্পণ্য করে, তার ধন-সম্পদ ধ্বংস কর'। আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা ধন-সম্পদ দান করেন এবং যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিতও করেন। এটি সম্পূর্ণ তাঁর মর্জির ব্যাপার। এজন্যেই ধনীকে দরিদ্র হতে এবং দরিদ্রকে ধনী হতে দেখা যায়, তবে উভয় অবস্থাই পরীক্ষামূলক। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মাধ্যমেই মানুষ জীবন-সাধনায় সাফল্য লাভ করে।

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ۝

'তোমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতেই রয়েছে'।

এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) যদি এ আয়াতকে কাফেরদেরকে কথা মনে করা হয় তবে এর অর্থ হবে, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা যে আমাদেরকে দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করার কথা বলছো তাতে প্রমাণিত হয় যে, তোমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছ কেননা, যাদেরকে আল্লাহ পাক দান করেননি তাদেরকে আমরা কেন দান করতে যাব? যদি তাদেরকে দান করা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় হতো, তবে স্বয়ং আল্লাহ পাকই তাদেরকে দান করতেন।

(দুই) কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ কথাটি কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের কথা, এমন অবস্থায় এ আয়াতের অর্থ হবে, কাফেররা আল্লাহর রাহে দান করার আহবানে সাড়া না দিয়ে নিজেদের পথভ্রষ্টতার প্রমাণ দিয়েছে। কেননা, যদি তারা আল্লাহর রাহে দান করতো তবে তারা ভাগ্যবান হতো। আল্লাহ পাক ধনীকে দরিদ্রের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়ে ধনীকে আরো ভাগ্যবান করতে চান, এভাবে ধনীর পরীক্ষা হয়, কিন্তু কাফেররা কার্পণ্য করে আল্লাহ পাকের দান থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাঁর কঠিন শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।[১]

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ۝

'আর এ কাফেররা বলে, '(কেয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

অর্থাৎ কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে এ প্রশ্ন করতো, যে কেয়ামতের কথা বলে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে তা কবে আসবে? কেয়ামতের কথা বলে তোমরা যে ভীতি প্রদর্শন কর তা যদি সত্য হয়, তবে কেয়ামত কবে আসবে তা আমাদেরকে জানাও, তার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে বল।

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহীদের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে হাশরের দিন তথা কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ۝

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৪০-৪১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৫০-৫১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২২৩, পৃষ্ঠা-১০

কাফেররা বলে যে, 'কেয়ামত কবে আসবে'? আল্লাহ্ পাক তাদের প্রশ্নের জবাবে এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামত আসবে অতর্কিতে আর সেই হঠাৎ করে আসা কেয়ামতের অপেক্ষা করছে এই কাফেররা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ۞

'তারা তো শুধু একটি হুংকারেরই অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আক্রমণ করবে যখন তারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকবে'।

অর্থাৎ এ কাফেররা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর হেদায়েত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, সঠিক পথকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আসলে তারা শুধু কেয়ামতের দিনেরই অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ কেয়ামতের দিন পর্যন্তও তারা আত্মসংশোধন করবে না।

আলোচ্য আয়াতের صَيْحَةً وَّاحِدَةً (একটি হুংকার) এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটি হলো হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর প্রথম শিংগায় ফুঁক যা তিনি কেয়ামতের পূর্বে দেবেন।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

কারো কারো মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, কাফেররা তো কেয়ামতকেই মানেনা, এমন অবস্থায় তারা 'কেয়ামতের অপেক্ষা করছে' কথাটির তাৎপর্য কি?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় 'অপেক্ষা করার' অর্থ হলো মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাপাচার, শেরক, কুফর বর্জন না করা। তারা সারা জীবনই শেরক কুফর ও পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে, পাপাচার পরিহার করার তথা আত্মসংশোধনের জন্যে হয়তো তারা কেয়ামতের অপেক্ষা করছে।

وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ۞

অর্থাৎ কেয়ামত এমন অবস্থায় আসবে যখন লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল থাকবে, কেউ ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, এমনকি কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকবে। কেয়ামত যে কায়েম হবে এ কথাটি কখনও তাদের স্মরণ হয়না, এমন অবস্থাতেই কেয়ামত আসবে।

কেয়ামত কিভাবে হবে?

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু' ব্যক্তি (ক্রেতা-বিক্রেতা) ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকবে, ব্যবসা এখনও চূড়ান্ত হয়নি, বিক্রেতা এখনও কাপড় সরিয়ে নেয়নি, এমন আকস্মিক অবস্থায় কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে। আর কেয়ামত এমন অবস্থায়

কায়েম হবে যে, মানুষ উষ্ট্রীর দুধ নিয়ে আসবে, পান করার পূর্বে কেয়ামত হয়ে যাবে। আর কেয়ামত এমন অবস্থায় হবে যে, মানুষ খাবারের লোকমা মুখে পুরে দেবে, কিন্তু খাওয়ার পূর্বেই কেয়ামত হয়ে যাবে, আর খেতে পারবেনা। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)।

ফরিয়াবীর সূত্রে অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামত এমন অবস্থায় হবে যখন লোকেরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকবে, কাপড় পরিমাপ করবে, উষ্ট্রীর দুগ্ধ দোহন করবে এবং এমনি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকবে (আর এমন অবস্থায় কেয়ামত আসবে)।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَّلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۝

'তাই তারা তখন ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবেনা, আর তাদের পরিবারের লোকদের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা'।

অর্থাৎ মানুষ নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত থাকবে এবং হঠাৎ কেয়ামতের জন্যে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, কেউ কোন ওসিয়ত করতে পারবেনা, তাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরেও আসতে পারবেনা, বরং যে যেখানে থাকবে সেখানেই শেষ হয়ে যাবে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ۝

'আর শিংগায় ফুক দেয়া মাত্র কবর থেকে বের হয়ে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে'।

অর্থাৎ যখন দ্বিতীয়বার হযরত ইস্রাফীল (আঃ) শিংগায় ফুঁক দেবেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে অনতিবিলম্বে সমস্ত মানুষ কবর থেকে বের হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হবার জন্যে চলতে থাকবে। প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দিলে সমস্ত মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে আর এর চল্লিশ বছর পর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দিলে সবাই জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে নিয়ে যাবেন।

আলোচ্য আয়াতের الاجداث শব্দটি جدث এর বহুবচন, এর অর্থ হলো কবর। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানুষ জীবিত হবে এবং হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত গমন করতে থাকবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁকের মধ্যবর্তী সময়ে লোকেরা সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়বে। কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতির তুলনায় কবরের কষ্টকে তারা সহজ মনে করবে।

ইমাম আহমদ, তিরমিজী, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম, এবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোযখের মধ্যে এমন একটি বিরাট গর্ত রয়েছে যাতে কাফেররা চল্লিশ বছর যাবত নীচের দিকে যেতে থাকবে, কিন্তু তবু তারা গভীর তলদেশে পৌঁছতে পারবেনা।

সাঈদ এবনে মনসুর, এবনুল মুনজের এবং বায়হাকী হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, দোযখের মধ্যে একটি গর্ত রয়েছে তার নাম 'ওয়েল'– যাতে দোযখীদের দেহের পূঁজ একত্রিত হয়, এ স্থানটি তৈরী করা হয়েছে সে সব লোকদের জন্যে, যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করে। হযরত ওসমান এবনে আফ্ফান (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'ওয়েল' হলো দোযখের মধ্যে একটি পাহাড়।

বাজ্জার হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোযখে একটি পাথর (তথা পাহাড়) রয়েছে, যাকে 'ওয়েল' বলা হয়।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ۞

'তারা তখন বলবে, 'কে আমাদেরকে নিদ্রার স্থল থেকে উঠিয়ে দিল'? (তখন ফেরেশতাগণ বলবেন) 'এটি তাই, করুণাময় আল্লাহ পাক যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং নবী রসূলগণ যে সত্য ঘোষণা করেছিলেন'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, দু' বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কাফেরদের উপর থেকে আযাব মূলতবি করা হবে এবং তারা ঘুমিয়ে পড়বে। দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দিলে তারা জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং একথা বলবে, আর এ সময় হবে চল্লিশ বছর।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মূলতঃ দোযখের ভয়াবহ আযাব দেখার পর কাফেররা কবরের আযাবকে দোযখের আযাবের তুলনায় হালকা মনে করবে, তাই তারা একথা বলবে।

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۝٥٢

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতাগণ জবাব দেবেন, এটি নতুন কিছু নয়, কেননা দয়াময় আল্লাহ পাক পূর্বেই এর ঘোষণা দিয়েছেন, নবী রসূলগণ তোমাদেরকে এ সম্পর্কে বারে বারে সতর্ক করেছেন, অতএব, সেই মহা দিনই তোমাদের নিকট উপস্থিত।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ কাফেরদের কথার এ জবাব দেবেন মোমেনগণ।

আর একথার উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে তাদের কুফরী নাফরমানীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তারা যে দুনিয়ার জীবনে পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো, সে কথা মনে করিয়ে তাদেরকে দোযখের শাস্তি ভোগের জন্যে প্রস্তুত করা।

আর এতে একথাও রয়েছে যে, আল্লাহ পাক পুনরুত্থানের যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করেছিলেন আর এ সম্পর্কে নবী রসূলগণ যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার সত্যতাও প্রমাণিত হয়েছে।[১]

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝٥٣
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٥٤ إِنَّ
أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۝٥٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ
عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ۝٥٦ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۝٥٧
سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝٥٨ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝٥٩
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِيْنٌ ۝٦٠ وَّأَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٦١

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, ৪ পৃষ্ঠা-৫৫৪১

তরজমা

(৫৩) এটি হবে একটি মাত্র হুংকার তখনই তাদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

(৫৪) অতএব, আজ কারো প্রতি কিছু মাত্র জুলুম করা হবেনা, যে যা করতো তারই ফল সে পাবে।

(৫৫) নিশ্চয় বেহেশতবাসীগণ সেদিন নিজ নিজ কাজে প্রফুল্ল থাকবে।

(৫৬) তারা এবং তাদের জীবন-সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়াতলে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে।

(৫৭) তাদের জন্যে সেখানে থাকবে সর্ব প্রকার ফলমূল এবং তারা যা চাইবে তাই পাবে।

(৫৮) পরম করুণাময় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে, 'সালাম'।

(৫৯) আর (ঘোষণা করা হবে) হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা আজ (মোমেনগণ থেকে) পৃথক হয়ে যাও।

(৬০) হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করিনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করোনা, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(৬১) আর তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর, এটিই সরল সঠিক পথ।

তফসীরুল কোরআন

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ۞

কেয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে আর এর জন্যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবেনা, বরং একটি হুংকারই যথেষ্ট হবে অর্থাৎ হযরত ঈসরাফীল (আঃ) শিংগায় ফুঁক দেবেন, তখন যে যেখানে আছে সেখান থেকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ছুটে আসতে বাধ্য হবে, পলায়ন করে আত্মরক্ষার কোন পথই থাকবেনা। কোরআনে করীমের সূরা জুমআয় এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۞

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ, নিশ্চয় তা তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে, এরপর তোমাদেরকে হাযির করা হবে মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত, এরপর তোমাদের জীবনের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হবে'।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۝

'অতএব, আজ কারো প্রতি কিছুমাত্র জুলুম করা হবেনা, যে যা করতো তারই ফল সে পাবে'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, কেয়ামতের দিন একথা ঘোষণা করা হবে যে, আজ সবার প্রতি সুবিচার করা হবে, কারো প্রতি কিছুমাত্র জুলুম করা হবেনা। একথার তাৎপর্য হলো, কারো লঘু পাপের কারণে তাকে গুরু দন্ড দেয়া হবেনা, ঠিক এমনিভাবে কারো প্রাপ্ত পুরস্কার থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হবেনা।

অথবা যা তার প্রাপ্য তা থেকে কমও দেয়া হবেনা, প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী তার সওয়াব বা পুরস্কার নির্ধারিত হবে। আর তা প্রত্যেকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। একথাটি পাপীষ্ঠদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মোমেনদেরকে আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্য ও সওয়াব তিনি অনেক বেশী দান করবেন যা কল্পনাতীত, কাফেরদের বিষয়টি সুবিচারের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে, আর মোমেনদের বিষয় দয়া এবং অনুগ্রহের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করা হয়েছেঃ

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ۝

'নিশ্চয় বেহেশতবাসীগণ সেদিন নিজ নিজ কাজে প্রফুল্ল থাকবে' এবং আনন্দিত ও উৎফুল্ল থাকবে। আল্লাহ্ পাকের মেহমানদারী হতে থাকবে, আনন্দ উল্লাসের কোন সীমা থাকবেনা। এজন্যে জান্নাতের আনন্দ মুখর জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেখানে এমন আনন্দ-সামগ্রী প্রস্তুত থাকবে যা পৃথিবীতে কেউ দেখেনি, আর কেউ তার কথা শ্রবণও করেনি এমনকি, কেউ তা কল্পনাও করেনি।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের شغل শব্দটির ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন।

কালবী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ পেয়ে তারা সেদিন এমন আনন্দ উপভোগ করবে যে, পাপীষ্ঠদের কি আযাব হয় তার খবরও তারা রাখবেনা।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, তারা সেদিন জান্নাতের অসংখ্য নেয়ামত লাভে এত মুগ্ধ-মত্ত থাকবে যে, দোযখীদের আযাবের কথা তারা চিন্তাও করবেনা।

এবনে কাইসান (রঃ) বলেছেন, তারা আল্লাহ পাকের মেহমানদারী গ্রহণে ব্যস্ত থাকবে, পরস্পর মোলাকাত করবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, বিশেষ কোন কাজে নয়; বরং প্রত্যেকে তার পছন্দনীয় কাজে সেদিন মশগুল থাকবে।

সুফী–সাধকগণ আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন কিছুই চিন্তা করেন না, তারা আল্লাহ পাকের নূরের মাঝে সর্বদা নিমজ্জিত থাকবেন। জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামতের দিকে আকৃষ্ট হবেন না, পানাহার বা অন্য কোন আনন্দদায়ক কাজে তারা মশগুল হবে না; বরং তারা আল্লাহ পাকের দীদার লাভের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকবেন।

আবু নায়ীম হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

যাহোক, জান্নাতে রকমারী আনন্দ সামগ্রী থাকবে, প্রত্যেকে তার পছন্দনীয় কাজে আনন্দিত অবস্থায় মশগুল থাকবেন।[১]

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ۝

'তারা এবং তাদের জীবন-সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়াতলে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে'।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে যে সুসজ্জিত আসন বা পালংকের কথা বলা হয়েছে, তা মুক্তা বা ইয়াকুত পাথরের তৈরী হবে।

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۝

'তাদের জন্যে সেখানে থাকবে সর্বপ্রকার ফলমূল এবং তারা যা চাইবে তাই পাবে'।

অর্থাৎ জান্নাতে সর্বপ্রকার ফলমূল, যাবতীয় আনন্দ-সামগ্রী মওজুদ থাকবে, জান্নাতবাসীগণ যখনই যা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবে, সঙ্গে সঙ্গে তা সরবরাহ করা হবে। আর আকাঙ্ক্ষার পর কাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্যে কারো কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হবে না; বরং মনের নিভৃত কোণে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তা জান্নাতবাসীগণ পেয়ে যাবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৫৬
তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৯১-৯২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৮৯

দ্বিতীয়তঃ কোন কিছু চাওয়া এবং চাওয়া অনুযায়ী অনতিবিলম্বে পাওয়ার মধ্যেও রয়েছে একটি বিশেষ আনন্দ।

তৃতীয়তঃ কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো দুনিয়াতে যে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আর জান্নাতের যে নেয়ামতের আরজু ছিল, তা পুরোপুরিই পাওয়া যাবে।

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

'পরম করুণাময় প্রতিপালকের তরফ থেকে বলা হবে, 'সালাম'।

জরীর এবনে আবদুল্লাহ বজলী থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীগণ তাদের আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকবেন, হঠাৎ তাদের উপর একটি নূর প্রকাশিত হবে, তারা তা দেখতে থাকবেন এবং তারা জানতে পারবেন, এটি হলো আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লী। তখন আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে সরাসরি অথবা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বলবেন, 'আসসালামু আলাইকুম, ইয়া আহলাল জান্নাহ'। অর্থাৎ হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তখন সমস্ত জান্নাতবাসী ঐ নূর দেখায় মশগুল হয়ে পড়বে, অন্য কোন দিকে তাদের মনযোগ থাকবেনা, কিছুক্ষণ পর সে নূর সরে যাবে, কিন্তু তার বরকত সমূহ বর্তমান থাকবে। (এবনে মাজা, আবিদদুনিয়া)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতাগণ জান্নাতবাসীগণকে 'সালাম' পৌঁছাবেন।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, জান্নাতের প্রত্যেকটি দুয়ার থেকে ফেরেশতাগণ একথা বলে প্রবেশ করবেন যে, হে জান্নাতবাসীগণ! করুণাময় প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি সালাম।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

'আর (ঘোষণা করা হবে) হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা আজ (মোমেনগণ থেকে) পৃথক হয়ে যাও'।

দোযখীদেরকে পৃথক হওয়ার আদেশ হবে

দুনিয়াতে ভাল-মন্দ পাশাপাশি থাকে কিন্তু কেয়ামতের দিন তা সম্ভব হবেনা, নেককারদের থেকে বদকার লোকদের দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। তফসীরকার মোকাতেল (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং জুযাজ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, পাপীষ্ঠদেরকে বলা হবে, তোমরা নেককার লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মোমেনদেরকে জান্নাতের দিকে এবং কাফেরদেরকে দোযখের দিকে প্রেরণ করা হবে।

যাহ্যাক (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দোযখে প্রত্যেক কাফেরের জন্যে একটি গৃহ নির্দিষ্ট থাকবে, যখন কোন দোযখী তার গৃহে প্রবেশ করবে তখন ঐ গৃহের অগ্নি দুয়ার সর্বকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হবে, ভেতর থেকে সে দেখতে পারবেনা, আর তাকেও দেখা যাবেনা।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যারা দোযখের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে, তাদেরকে লৌহ নির্মিত সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। ঐ সিন্দুকগুলোকে নতুন লোহার সিন্দুকে প্রবেশ করানো হবে, এরপর দোযখের তলদেশে তা নিক্ষেপ করা হবে। এজন্যে কোন দোযখী অন্য দোযখীর আযাবও দেখতে পাবেনা, সে ধারণা করবে যে, শুধু তাকেই এত কঠিন আযাব দেয়া হয়। আর অন্যের আযাব দেখে সান্ত্বনা পাবারও কোন ব্যবস্থা থাকবেনা।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কেয়ামতের দিন কাফেরদের বলা হবে, তোমরা দূরে সরে যাও, জান্নাতের চির সুখে তোমাদের কোন অংশ নেই, বেহেশতবাসীদের থেকে তোমরা তফাত থাক, তোমাদের স্থান অন্যত্র, তোমরা সেখানেই থাকবে।

এবনে আবি হাতেম হযরত হাসান (রঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা নেককার লোকদের থেকে দূরে সরে যাও।[১]

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۝

'হে বনী আদম! 'আমি কি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করোনা, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে মোমেনদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে। আর এ আয়াতে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৫৭
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯০

এরশাদ হয়েছে যে, কাফেরদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তিরস্কার করা হবে এভাবে যে, নবী রসূলগণের মাধ্যমে আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করিনি যে, তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়োনা, শয়তান তোমাদের জঘন্য শত্রু, সে তোমাদের চির বৈরী এবং প্রকাশ্য শত্রু, তার একমাত্র লক্ষ্য হলো তোমাদের সর্বনাশ করা, আমি নবী রসূলগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো–

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِیْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿٦١﴾

আর তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর, এটিই সরল সঠিক পথ, ইহকাল পরকালের শান্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে, কিন্তু তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করোনি, শয়তানের অনুগামী হয়েছ, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের স্থলে তাঁর বিরোধিতা করেছ। অতএব, এর শাস্তি ভোগ কর। দুনিয়াতে সরল-সঠিক পথ পরিহার করে বক্র পথ অবলম্বন করেছ, আজ তার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ দোযখের শাস্তি ভোগ কর। এজন্যে সর্ব প্রথম নেককারদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।

وَلَقَدْ اَضَلَّ
مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِیْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ
كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْیَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْیَوْمَ
نَخْتِمُ عَلٰۤی اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَیْدِیْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
یَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤی اَعْیُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰی
یُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰی مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا
مُضِیًّا وَّلَا یَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِی الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا
یَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا یَنْۢبَغِیْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ
مُّبِیْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّیُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَیًّا وَّیَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَی الْكٰفِرِیْنَ ﴿٧٠﴾

তরজমা

(৬২) নিশ্চয় শয়তান তোমাদের অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে, তবু কি তোমরা বুঝতে পারনি?

(৬৩) এ সেই দোযখ, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

(৬৪) আজ তোমরা তাতে প্রবেশ কর, কেননা তোমরা তাকে অবিশ্বাস করেছিলে।

(৬৫) আজ আমি তাদের মুখ সীল করে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

(৬৬) আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম তখন তারা পথের জন্যে দৌড়াতে থাকবে, কিন্তু কোথায় তারা পথ দেখতে পাবে?

(৬৭) এবং আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে যে যেখানে আছে সেখানেই বিকৃত আকৃতি করে দিতে পারতাম, এরপর তারা চলতে পারতো না এবং ফিরেও আসতে পারতো না।

(৬৮) আমি যাকে বয়ঃবৃদ্ধ করি তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই, তবু কি তারা বোঝে না?

(৬৯) আমি তাঁকে কাব্য রচনা শিক্ষা দেইনি; আর তা তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়, এটি হলো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কোরআন।

(৭০) যার মধ্যে জীবনী শক্তি রয়েছে এমন ব্যক্তিকে যেন ভয় প্রদর্শন করে আর কাফেরদের উপর যেন আযাবের কথা সাব্যস্ত হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে শুধু এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করার আহবান জানিয়ে এরশাদ হয়েছে, 'আর তোমরা শুধু আমার বন্দেগী কর এবং এটিই সরল সঠিক পথ'।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, পৃথিবীর অনেক লোকই এ আহবানে সাড়া দেয়নি, ইবলিস শয়তান অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, তারা শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করেছে, আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে এবং নিজেদের সর্বনাশের পথ বেছে নিয়েছে, যদি তারা বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী হতো, যদি তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করতো, তবে আজ এ মহা বিপদের সম্মুখীন হতো না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, সেদিন তারা জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয়

দেয়নি, সত্যকে গ্রহণ করেনি, নবী রসূলগণের অনুসারী হয়নি, তাই আজ তাদের শাস্তি অবধারিত।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ۝

'এ হলো সেই দোযখ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যখন দোযখের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে এবং দোযখ থেকে ভয়ংকর শব্দ হতে থাকবে, কাফের-মুনাফেক-মুরতাদ এক কথায় আল্লাহ পাকের সকল অবাধ্য লোকদেরকে দোযখের সন্নিকটে পৌঁছে দেয়া হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে, 'এ হলো সেই দোযখ যার সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল এবং তোমরা যাকে অস্বীকার করতে'।

اِصْلَوْهَا الْیَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۝

'আজ তোমরা তাতে প্রবেশ কর, কেননা তোমরা তাকে অবিশ্বাস করেছিলে', আর সেই অবিশ্বাস ও নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই আজ দোযখে প্রবেশ কর। দোযখের অগ্নি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, অতএব তোমরা সরাসরি দোযখে প্রবেশ কর আর তা তোমাদের কীর্তিকলাপের অনিবার্য পরিণামই।

اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤی اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَیْدِیْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ۝

'আজ আমি তাদের মুখ সীল করে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, কেয়ামতের দিন কাফের এবং মুনাফেকরা তাদের পাপাচারের কথা অস্বীকার করবে এবং শপথ করে বলবে যে, আমরা এসব পাপকার্যে লিপ্ত হইনি। তখন আল্লাহ পাক তাদের বাকশক্তি রহিত করে দেবেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির ছিলাম, তিনি তখন মুচকি হাসলেন এবং আমাকে বললেন, 'তুমি কি জান আমি কেন মুচকি হাসলাম'? আমি আরজ করলাম, 'আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই তা জানেন'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'এ বিষয়ে আমি মুচকি হেসেছি যে, কেয়ামতের দিন এক বন্দা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজ করবে, 'হে পরওয়ারদেগার! তুমি কি আমাকে জুলুম করা থেকে

আশ্রয় দাওনি'? (অর্থাৎ তুমি কি একথা ঘোষণা করোনি যে, কেয়ামতের দিন কারো প্রতি জুলুম করা হবেনা) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, 'অবশ্যই,' তখন বন্দা আরজ করবে, 'হে পরওয়ারদেগার! আজ আমার বিরুদ্ধে আমি কারো সাক্ষ্য মেনে নেবনা, তবে যে সাক্ষ্য আমার নিজের দেহের অংশ হবে, তা মানবো'। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, 'আজ তুমি নিজে এবং তোমার আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা (কেরামুন কাতেবীন) সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট'। এরপর তার মুখ সীল করা হবে এবং ঐ ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেয়া হবে। নির্দেশ অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। যেভাবে মানুষ রসনা দ্বারা কথা বলে ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বাকশক্তি দান করবেন। এরপর তাকে তার বাকশক্তি ফিরিয়ে দেয়া হবে, সে বলবে, 'তোমাদের জন্যে ধ্বংস, আমি তো তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যেই যা কিছু বলেছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেরাই আমার শত্রু হয়ে পড়েছ'।

নেসায়ী শরীফে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির করা হবে, যখন তোমাদের রসনা বন্ধ থাকবে, সর্ব প্রথম তোমাদের উরু এবং হাতকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, বন্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কে?' সে আরজ করবে, 'আমি তোমার বন্দা, তোমার নবীর প্রতি এবং তোমার কিতাবের প্রতি আমি ঈমান এনেছিলাম। নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতি আদায় করেছি'। এমনি আরো বহু নেক আমলের উল্লেখ করবে। তখন তাকে বলা হবে, 'আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি সাক্ষী হাযির করছি'। সে চিন্তা করবে, কাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে? তখন হঠাৎ দেখবে, তার বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে, এরপর তার উরুকে বলা হবে, 'তুমিই সাক্ষী দাও', তখন উরু, হাড় এবং গোশ্ত বলে উঠবে এবং ঐ মুনাফেকের মুনাফেকী এবং যাবতীয় গোপন পাপাচারগুলোর সুস্পষ্ট বিবরণ দেবে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, রসনা বন্ধ করে দেয়ার পর মানুষের বাহু সর্বপ্রথম কথা বলবে।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক মোমেন বন্দাকে তার গুনাহ্ সমূহের বিবরণ সম্মুখে রেখে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এসব ঠিক'? সে আরজ করবে, 'জ্বী-হ্যাঁ, সবই ঠিক'। আমার দ্বারা এসব গুনাহ্ হয়েছে', তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, 'যাও, আমি এসব মাফ করে দিলাম', তখন

এভাবে কথা হবে যে, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ জানবেনা, অন্য কারো নিকট তার গুনাহ প্রকাশ পাবেনা, এরপর তার নেকী সমূহ হাযির করা হবে এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে (হে ক্ষমা-প্রিয় প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ মাফ করে দিও, হে আল্লাহ! কেয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করোনা, আমাদের গুনাহ সমূহকে গোপন রেখ, আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়ায় স্থান দিও। হে দয়াবান প্রতিপালক! তোমার দরবার থেকে আজ পর্যন্ত কেউ মাহরুম হয়নি, আমাদেরকেও তোমার রহমত থেকে মাহরুম করোনা। তোমার শাস্তি থেকে আমাদেরকে নাজাত দিও, তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে নাজাত দিও এবং দোযখের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। হে দয়াময় পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে জান্নাত নসীব কর এবং তোমার দীদার লাভের সৌভাগ্য দান কর)। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীস এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম সংকলন করেছেন।

এভাবে কাফের এবং মুনাফেকদেরকেও আল্লাহ পাক হাযির করে তাদের কৃতকর্মের বিবরণ সম্মুখে রেখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এসব ঠিক?' সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে এবং শপথ করে বলবে, 'হে পরওয়ারদেগার! এসব তোমার ফেরেশতারা অসত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে'। তখন ফেরেশতা বলবেন, 'হায়! সে কি বলে?' তুমি কি অমুক দিন এ কাজ করনি'? ঐ কাফের বলবে, 'অবশ্যই নয়'। তখন আল্লাহ পাক তাদের রসনা বন্ধ করে দেবেন।[১] এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এ বিবরণ স্থান পেয়েছে, তবে তিনি একথাও বলেছেন, আমার ধারণা এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন যে, সর্ব প্রথম ঐ ব্যক্তির ডান উরু কথা বলবে, এরপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আবু ইয়ালা এবং হাকেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন কেয়ামতের দিন হবে তখন কাফেরদেরকে তাদের পাপাচারের কারণে তিরস্কার করা হবে, কিন্তু কাফের তার পাপাচারের কথা অস্বীকার করবে এবং ঝগড়া করবে, তখন আদেশ দেয়া হবে যে শপথ কর, কাফেররা শপথও করবে, এরপর আল্লাহ পাক তাদেরকে নিস্তব্ধ করে দেবেন (রসনার কার্যকারিতা স্তব্ধ করে দেবেন), এরপর তারা তাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে। পরে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-১৫-১৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ۞

'আর আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের জন্যে দৌড়াতে থাকবে, কিন্তু কোথায় তারা পথ দেখতে পাবে'?

আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে এ আয়াতে বিশেষভাবে সতর্ক করে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা যেভাবে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছ, তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছ এবং তাঁর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে চক্ষু বন্ধ করে রেখেছ, তোমরা কি চিন্তা করনা যে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে দিতে পারেন, তোমাদের দৃষ্টি শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন, জীবনের তরে তোমাদেরকে পঙ্গু করে দিতে পারেন, তখন তোমরা ইচ্ছা করলেও পথের সন্ধান পাবেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ তফসীর করেছেন হাসান বসরী (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা (রঃ), মোকাতেল (রঃ) এবং আতা (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের اعين শব্দটির অর্থ হলো, 'পথভ্রষ্টতার চক্ষু' আর طمس اعين এর ব্যাখ্যা হলো, চক্ষুগুলোকে বের করে দেয়া। অর্থাৎ 'পথভ্রষ্টতার চক্ষু'গুলোকে হেদায়েতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া। তাদের মতে আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, 'যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের পথভ্রষ্টতার চক্ষুগুলোকে বের করে দিতাম, গোমরাহী থেকে হেদায়েতের দিকে তাদেরকে নিয়ে আসতাম, এমন অবস্থায় তারা গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার পথ দেখতো না, কিন্তু আমি তা ইচ্ছা করিনি। এখন হেদায়েতের পথ তারা কোথায় দেখবে'?

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۞

'আর আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে যে যেখানে আছে সেখানে রেখেই তাদের আকৃতি বিকৃত করে দিতাম, এরপর তারা চলতে পারতো না, আর সে স্থান থেকে ফিরেও আসতো না'।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এই 'ফিরে না আসা'র ব্যাখ্যা হলো 'কুফর থেকে ঈমানের দিকে, অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের দিকে ফিরে আসতে পারতো না'।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কাফেরদের কুফরী, নাফরমানী, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়াই ছিল সমুচিত শাস্তি, কিন্তু আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতের কারণে তিনি

তাদেরকে শাস্তি দেন না; বরং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, কেননা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۖ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ۝

'আমি যাকে বয়ঃবৃদ্ধ করি, তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই, তবু কি তারা বোঝেনা'?

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের চেহারা বিকৃত করে দিতে পারতাম, তাদের চক্ষু বিনাশ করে দিতে পারতাম, মানবাকৃতি পরিবর্তন করে জীব-জন্তুর আকৃতি দিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু শুধু আমার রহমতের কারণে আমি তা করিনি, আর এ কাজকে তোমরা কঠিন মনে করোনা, আল্লাহ্ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর জন্যে কোন কাজই কঠিন নয়। (এরপর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে) তোমরা লক্ষ্য কর, আমি যাকে বয়ঃবৃদ্ধ করি, তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই, তার দৈহিক অবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করি, একজন সুস্থ, সবল, শক্তিমান যুবক কিছুদিন পরই বার্ধক্যে জর্জরিত হয়, তার সকল শক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসে, প্রতিনিয়ত তোমরা এ দৃশ্য দেখছ, এরপরও কি এ সত্য উপলব্ধি করতে পার না যে, আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দিতে পারেন, তোমাদের চক্ষুগুলোকে বিনাশ করে দিতে পারেন, তোমাদেরকে মানবাকৃতির স্থলে কোন চতুঃষ্পদ জন্তুর আকৃতি দিয়ে অপমানিত করতে পারেন?

মূলতঃ পৃথিবী অত্যন্ত গতিশীল, এখানকার কোন অবস্থাই স্থায়ী নয়; সর্বক্ষণ এখানে পরিবর্তন আসছে, মানব জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলেও এ সত্যটি উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয়না, মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়, অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে শৈশব তার অভাবেই কাটে, এরপর আসে কৈশোর, এ সময়ও মানুষের দুর্বলতা তাকে অন্যের সাহায্য প্রার্থী হতে বাধ্য করে। যৌবনে এসে সে শক্তি লাভ করে, আর এ কারণে সে তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কিন্তু এ অবস্থাও বেশীদিন স্থায়ী হয়না। কিছুদিন পরই তার চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। পর্যায়ক্রমে সে দুর্বল হতে থাকে, এমনকি বার্ধক্যের কারণে অতি শৈশব কালের ন্যায় পুনরায় সে অসহায় হয়ে পড়ে। এসবই মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরত এবং তাঁর ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ হয়। এভাবেই মানুষকে দুনিয়া থেকে আখেরাতে পৌঁছতে হবে এবং মানব জীবনে আসবে মহা পরিবর্তন। সেখানকার সুখ এবং শান্তি নির্ভর করে দুনিয়ার জীবন ধারার উপর। ঈমান এবং নেক আমল হলো পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সবচেয়ে বড় সম্বল, এ সম্বল যারা সংগ্রহ করে, তারা পরকালীন জীবনে হয়

সফলকাম। পক্ষান্তরে, যারা ঈমান ও নেক আমলের সম্বল অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাদের পরকালীন জীবন শুধু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবেনা; বরং মহা বিপদের সম্মুখীন হবে, তবুও কি কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করবেনা? বুঝবেনা?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ-الاية

'আমি তাঁকে কাব্য রচনা শিক্ষা দেইনি, আর তা তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়; এটি হলো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কোরআন'।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার কালবী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কোন কোন কাফের মনে করতো যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন কবি, আর তাঁর মাধ্যমে যে পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে উপহার দেয়া হয়, তা হলো তাঁর কাব্য। কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন-কল্পেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং কোরআনে করীম সম্পর্কে কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করার লক্ষ্যেই আল্লাহ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কোরআন কবির কাব্য নয়; বরং এক ধ্রুব সত্য উপদেশ, এতে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর আমার নবী কবি নন, তিনি সত্য নবী। কাব্য রচনা তাঁর জন্যে শোভনও নয়, তাঁর পবিত্র স্বভাব কাব্য প্রবণ নয়, তিনি পবিত্র কোরআনের বাহক, সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শক তিনি, মানব জাতির হেদায়েতের লক্ষ্যেই তাঁর আবির্ভাব, তাঁর মহান আদর্শ সার্বজনীন, বাস্তব, এখানে কল্পনার কোন স্থান নেই, কাব্য রসিকতার ঠাঁই নেই, জীবনের কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে, যে পথ অবলম্বন করে জীবনকে সার্থক করে তুলতে হয়, সে পথই প্রদর্শন করেছেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কাব্যের কোন সম্পর্ক নেই, কবির উর্বর মস্তিষ্ক থেকে যা বের হয় তা থেকে হয়তো শ্রবণ-সুখ পাওয়া যেতে পারে এমনকি, ক্ষণিকের আনন্দ পাওয়াও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু জীবনের বাস্তব শিক্ষা, জীবনের সরল সঠিক পথ সেখানে অনুপস্থিত, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীবনে একটি কবিতাও রচনা করেননি,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৬২

যে মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক তাঁকে প্রেরণ করেছেন, সে উদ্দেশ্য তাঁর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছে, গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষ হেদায়েতের আলো পেয়েছে তাঁর নিকট থেকে, তাঁর হেদায়েতও স্থায়ী, যা কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি কখনও কবিতা পাঠ করতেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'না', তা অপছন্দ করতেন'।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কোরআন কাব্যগ্রন্থ নয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও কবি নন। আর কাব্য রচনা তাঁর জন্য শোভনও নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন কোন বাণী কবিতায় পরিণত হয়েছে। যেমন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب

'আমি সত্য নবী, আমি আবদুল মোত্তালেবের পৌত্র'।

এমনিভাবে হযরত জন্দব এবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

هل انت الا اصبع رميت وفى سبيل الله ما كفيت

'এ-তো শুধু একটি অঙ্গুলি যা আহত হয়েছে, আর যে-কষ্ট তুমি পেয়েছ তা আল্লাহর পথেই হয়েছে'।

এ দু'টি বাণীই হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক থেকে উচ্চারিত হয়েছে। এগুলো কবিতায়ও পরিণত হয়েছে। কিন্তু তিনি কবিতা রচনা করার ইচ্ছা করেননি। আর এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্যে সময়ও তিনি নষ্ট করেননি। অনিচ্ছাকৃতভাবে এ বাণী কবিতায় পরিণত হয়েছে। আর ঘটনাক্রমে কারো রসনা থেকে যদি কোন কথা কবিতা হয়ে উচ্চারিত হয়, তাকে কবি বলা হয় না। যারা কাব্য চর্চা করে এবং কবিতা রচনা করে তাদেরকেই কবি বলা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি কবিতার পংক্তি এভাবে পাঠ করেনঃ

كفى بالاسلام والشيب للمرءنا هيا

(ইসলাম এবং চুল সাদা হওয়া মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্যে যথেষ্ট।)

তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর নবী! কবি তো কথাটিকে এভাবে বলেছেঃ

كفى الشيب والاسلام بالمرءنا هيا

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বারও এ পংক্তিটি পাঠ করলেন, কিন্তু পূর্বের ন্যায়ই পড়লেন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "আমি তাঁকে কাব্য রচনা শিক্ষা দেইনি; আর তা তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়"।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْآنٌ مُّبِينٌ۞

'এটি হলো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কোরআন'।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন কবির কাব্য নয়; বরং মানব জাতির জন্যে একটি সঠিক দিক-নির্দেশনা। এটি মহিমময় আল্লাহ পাকের মহান বাণী। এটি যাদুও নয় কাব্যও নয়; বরং মহান আল্লাহ পাকের হেকমতপূর্ণ তাৎপর্যবহ বাণী, যাতে রয়েছে মানব জাতির জন্যে বিশেষ উপদেশ।

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۞

'যেন যার মধ্যে জীবনী শক্তি রয়েছে এমন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করা হয় আর কাফেরদের উপর যেন আযাবের কথা সাব্যস্ত হয়'।

অর্থাৎ এই কোরআন এজন্যে নাযিল হয়েছে যেন যাদের মধ্যে জীবনের স্পন্দন রয়েছে, যারা কোরআনের ডাকে সাড়া দেয় তাদেরকে সতর্ক করা যায়, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে। আর কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে তাদের উপর আযাবের সিদ্ধান্ত যেন সাব্যস্ত হয়। কেননা যদি পবিত্র কোরআন নাযিল না হতো, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব না হতো তবে তারা বলতো, আমাদেরকে কেউ আখেরাত সম্পর্কে সাবধান করেনি। কিন্তু কাফেরদের জন্যে এখন আর এমন ওজর-আপত্তি পেশ করার সুযোগ রয়নি।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ
يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا
يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ
أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾

তরজমা

(৭১) তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আমি তাদের জন্যে আমার (কুদরতী) হাতে সৃষ্ট বস্তুগুলোর মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, ফলে তারা এগুলোর মালিক হয়েছে।

(৭২) আর আমি চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে তারা তন্মধ্যে কোনটিকে তাদের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে, আর কোনটিকে তারা খেয়ে থাকে।

(৭৩) তাদের জন্যে এ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে অনেক উপকার এবং পানীয় বস্তু, তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবেনা?

(৭৪) তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্যকে প্রভূ হিসেবে গ্রহণ করেছে, এ আশায় যে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

(৭৫) কিন্তু এসব প্রভূরা তাদের কিছুমাত্রও সাহায্য করতে পারবেনা, বরং তাদেরকে তাদের সৈন্যবাহিনী রূপে উপস্থিত করা হবে।

(৭৬) অতএব, (হে রসূল!) আপনাকে যেন তাদের আচরণ দুঃখ না দেয়। নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

(৭৭) মানুষ কি দেখেনা যে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু থেকে, এরপর সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী।

তফসীরুল কোরআন

পবিত্র কোরআনে তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (১) আল্লাহ পাকের একত্ববাদ (২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত এবং (৩) আখেরাত তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহের নসিহত। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এসব বিষয়েই আলোচনা স্থান পেয়েছে, এরপর পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কাফেরদের একটি ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে পুনরায় আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা শুরু হয়েছে। মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের অগণিত নেয়ামতের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহবান জানানো হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۝

অর্থাৎ মানুষ কি দেখেনা যে, তারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করে চলেছে, এ নেয়ামত সমূহের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুগুলো অন্যতম। আল্লাহ পাক মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন উষ্ট্র, অশ্ব, গরু, ছাগল প্রভৃতি। আল্লাহ পাক এ চতুষ্পদ জন্তুকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। বড় বড় জন্তুকে একটি ছোট বালক তার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় অনায়াসে, মানুষ এগুলোর দুগ্ধ পান করে, গোশ্‌ত খায়, এগুলোর চামড়া এবং পশম দ্বারা পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করে শীতের তীব্রতা থেকে আত্মরক্ষা করে, প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য এ জীব-জন্তু থেকেই তারা সংগ্রহ করে, এগুলোর দ্বারা তাদের অনেক প্রয়োজনের আয়োজন হয়। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ এবং অশেষ দান। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, যথানিয়মে তাঁর বন্দেগী করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ۝

'তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্যকে প্রভূ হিসেবে গ্রহণ করেছে এ আশায় যে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে'।

অর্থাৎ এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আত্মবিস্মৃত মানব জাতি অহরহ আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর পরিবর্তে অন্য কিছুকে প্রভূ হিসেবে

গ্রহণ করতে যায়, আর এ আশা করে যে, এসব তথাকথিত প্রভূ তাদেরকে সাহায্য করবে, দুঃসময়ে তাদের কাজে আসবে, অথচ সে আশায় গুড়ে বালি।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ

তাদের ঠাকুর-দেবতারা মানুষের কোন প্রকার সাহায্যই করতে পারবেনা, এমনকি, বানানো এ মূর্তিগুলো নিজেরাও নিজেদের কোন সাহায্য করতে পারবেনা, শুধু তাই নয়;

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ۝

বরং তারা নিজেরাই অভিযুক্ত আসামীর মত পাকড়াও হয়ে দরবারে এলাহীতে হাযির হবে।

অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গুজার থাকা, শুধু এভাবেই মানুষের এ জীবনের সাধনা সার্থক হবে এবং পরজীবনের সাফল্য সুনিশ্চিত হবে।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ

'(হে রসূল!) আপনাকে যেন তাদের আচরণ দুঃখ না দেয়'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দেয়া তো দূরের কথা, বরং তারা তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ করতো। আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করতে তারা দ্বিধাবোধ করতো না, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কবি, যাদুকর এবং পাগল বলতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। এমনি অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষে ব্যথিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের অন্যায় আচরণে মনক্ষুন্ন হবেন না, তাদের আপত্তিকর কথাবার্তায়, তাদের অপ্রিয় আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না। তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ পাক অবশ্যই যথাসময়ে নেবেন এবং তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেবেন। তাই তাদের অপ্রিয় ব্যবহারে আপনি সবর অবলম্বন করুন।

إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۝

'নিশ্চয় আমি জানি, যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে'।

অর্থাৎ তাদের মনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যে শত্রুতা গুপ্ত রয়েছে, আর যে সব অন্যায় অযৌক্তিক কথাবার্তা তারা প্রকাশ করে, আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই তাদের অন্যায় অনাচারের সঠিক বিচার অবশ্যই হবে, আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে অবগত।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۝

'মানুষ কি দেখেনা? যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু থেকে, এরপর সে হয়ে পড়েছে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে পরকালীন জিন্দেগীর তথা পুনরুত্থান এবং পুনরুজ্জীবনের-হাশর নশরের দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কাফেররা পরকালীন জিন্দেগীকে অস্বীকার করতো। তারা মনে করতো, মানুষের মৃত্যুর পর যখন তার দেহ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তার পুনরুজ্জীবন কি করে সম্ভব হতে পারে? তাই এ আয়াত থেকে এ সম্পর্কে দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে।

শানে নুযুল

মুজাহেদ (রঃ), একরামা (রঃ), ওরওয়া এবনে যুবায়ের এবং সুদ্দী (রঃ) থেকে বর্ণিত, আর বায়হাকী আবু মালিকের সূত্রে, এমনিভাবে আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত যে, এ আয়াত উবাই এবনে খালফ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

একটি পঁচা হাড় নিয়ে সে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় এবং আখেরাতের জিন্দেগীকে অস্বীকার করে বলে, সে এভাবে ধ্বংস হওয়ার পর কে তাকে পুনরুজ্জীবন দান করবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক তোকে পুনরুজ্জীবন দান করবেন এবং দোযখে নিক্ষেপ করবেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতের মর্মকথা এই যে, আল্লাহ পাক মানুষকে শুক্র বিন্দু থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, এরপর দ্বিতীয়বার তাকে সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন নয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۝

অর্থাৎ মানুষ কি তার সৃষ্টির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করেনা? কিভাবে সে অস্তিত্ব লাভ করেছে তা কি সে ভুলে গেছে? তার স্মরণ করা উচিত যে, আল্লাহ পাক একটি শুক্র বিন্দু থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যখন তার কোন অস্তিত্ব ছিল না, কোন নমুনা ছিল না, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের দয়ায় সে জীবনের যাবতীয় উপকরণ লাভ করেছে। ঠিক এমনিভাবে যখন মানুষ মৃত্যুর পর কঙ্কালে পরিণত হবে, তখন পুনরায় আল্লাহ পাকই তাকে নবজীবন দান করবেন।

বস্তুতঃ মানুষ যদি তার প্রথম সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়, যদি সে এ মহা সত্য উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ পাকই আমাকে অনস্তিত্বের শূণ্যগর্ভ থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন, তবে এ সত্য উপলব্ধি করতে বিলম্ব হবে না যে, তাঁর পক্ষে মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবন দান করা আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়। যিনি একটি শুক্র বিন্দুকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছেন, সেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ পাকের পক্ষে মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অতি সহজ কাজ। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করলেই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে, একদিন এমনও ছিল, যখন তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। আর এখন সে এক বাস্তব সত্য। কিন্তু এমন সময় আসবে যখন তার উপর মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হবে এবং এ পৃথিবীতে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না, আর তা আল্লাহ পাকের হুকুমেই হবে। এরপর আল্লাহ পাক তাকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তার জীবনের যাবতীয় কর্মের হিসাব নেবেন। কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى۝

'এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো, আর পুনরায় এই মাটি থেকে বের করবো'।

আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই এতে কার্যকর হবে। বিস্ময়কর বিষয় এই যে, যাকে আল্লাহ পাক এক ফোটা অপবিত্র পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন,

فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ۝

'সে আজ প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে'। সে সত্য উপলব্ধি করতে চায় না, বিতর্কে লিপ্ত হতে চায়। যিনি অপবিত্র উপকরণ দ্বারা এত সম্মানিত মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তৈরী করেন তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুজ্জীবন দেয়া আদৌ কঠিন কাজ নয়।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৬৭

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ
نَسِيَ خَلْقَهٗ ۖ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ
اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ﴿٧٩﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ
الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ اَوَلَيْسَ الَّذِيْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۗ بَلٰى ۚ وَهُوَ
الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾
فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

তরজমা

(৭৮) আমার সম্পর্কেও সে দৃষ্টান্ত পেশ করতে চায় অথচ নিজের সৃষ্টির ইতিকথা ভুলে যায়। সে বলে, এ হাড়গুলোকে কে জীবিত করবে, যখন এগুলো পঁচে গলে যাবে?

(৭৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই পুনর্জীবিত করবেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৮০) তিনিই তো তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন, তোমরা তা থেকেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে থাক।

(৮১) যিনি আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন না? হ্যাঁ, নিশ্চয় পারেন। তিনিই প্রকৃত স্রষ্টা আর তিনিই সর্বজ্ঞ।

(৮২) আল্লাহ পাকের নিয়ম-নীতি এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।

(৮৩) অতএব, পবিত্র মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমাদের সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

দূরাত্মা কাফেররা আল্লাহ্ পাকের শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করে এবং নিজের সৃষ্টির ইতিকথাই ভুলে যায়, তারা বলে যে, মানুষের পুনরুত্থান কি করে সম্ভব? একটি হাড় যখন পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন কার এ শক্তি আছে যে, তাকে নব জীবন দান করবে? অর্থাৎ যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব মনে করা হয়, তারা আল্লাহ্ পাকের পক্ষেও তাকে তেমনি অসম্ভব মনে করে এবং আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম শক্তিকে মানুষের শক্তির মত মনে করে, তাই তারা এমন অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন,

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِىٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۝

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই পুনর্জীবিত করবেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

অর্থাৎ এ হাড়গুলোকে সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ পাকই পুনর্জীবন দান করবেন, যিনি প্রথম এগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন।

পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহ্ পাক মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করবেন, মৃত্যুর সময় রুহকে দেহ থেকে পৃথক করা হয়, কিন্তু পুনরায় মানুষকে জীবিত করা হবে আর আল্লাহ্ পাকের পক্ষে এ কাজ আদৌ কঠিন কিছু নয়। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, হতভাগা কাফের আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে, অথচ তার নিজের সৃষ্টি তত্ত্বই সে ভুলে যায়, যদিও এ আয়াত উবাই এবনে খালফ অথবা আস এবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতের মধ্যে জবাব রয়েছে সকল যুগের কাফের মুশরেকদের, যারা এমন বেআদবীপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। প্রকৃত অবস্থা এই, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, যা সৃষ্টি নিজেও তার সম্পর্কে জানেনা স্রষ্টা তা জানেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ

'তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, পঁচা গলা হাড়গুলোকে একত্রিত করা এবং তাতে জীবন সঞ্চার করা এত বিস্ময়কর নয়, যত বিস্ময়কর হলো মানব দেহের নির্যাস

রূপে শুক্রকে বের করা এবং এ অপবিত্র বস্তু থেকে একজন সম্মানিত মানুষ তৈরী করা। ঐ একটি অপবিত্র বস্তুর মধ্যেই থাকে মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ এক কথায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এসব কিছুই ছিল আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞানে যা মানব সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ দূরাত্মা কাফেররা তাদের সৃষ্টির ইতিকথাকে ভুলে গিয়ে বলেছে, 'কে এই পঁচা গলা কংকালে প্রাণ সঞ্চার করবে'? আলোচ্য আয়াতে সরাসরি তাদের এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে যে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয় বারও তিনিই সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবারের সৃষ্টি থেকে কঠিনও নয়, বিস্ময়করও নয়।

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿۸۰﴾

'তিনিই তো তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন, তোমরা তা থেকেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে থাক'।

এ আয়াতেও আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আরবে দু' প্রকার বৃক্ষ রয়েছে, এক প্রকারকে বলা হয়, 'মীরখ', আর এক প্রকার হলো 'ইফার'। এ দু' প্রকার বৃক্ষের ডালাগুলো সবুজ হয় এবং তা থেকে ফোটা ফোটা করে পানি পড়তে থাকে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও উভয় প্রকার বৃক্ষের ডালাগুলোর পরস্পরের ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এটি কত বড় বিস্ময়কর বিষয় যে, আগুন পানি এক হতে পারেনা, অথচ এক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হয় এবং এভাবে তোমরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে থাক। যিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন বের করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করা আদৌ কঠিন কিছু নয়।

মসনদে আহমদে রয়েছে, একবার আকাবা এবনে আমর হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, আমাকে একখানি হাদীস শুনিয়ে দিন, যা আপনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বললেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, সে তার উত্তরাধিকারীদেরকে ওসিয়ত করলো যে, আমার মৃত্যু হলে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আমার লাশকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে, এরপর ঐ ছাইগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেবে, তারা তাই করেছিল, আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে তার ছাইগুলোকে একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবন দান করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এমনটি কেন করলে'? সে আরজ করলো, 'হে পরওয়ারদেগার! আপনার ভয়ে'। আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পথ চলার সময় এই হাদীস এরশাদ করেছিলেন যা আমি নিজে তাঁর জবান মোবারক থেকে শ্রবণ করেছি। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে ব্যক্তি বলেছিল, আমার দেহের ছাইগুলোকে দু' ভাগ করবে, একভাগ বাতাসে ছেড়ে দেবে, আরেকভাগ সমুদ্রে ফেলে দেবে। এরপর আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে সমুদ্র এবং বাতাস তার ছাইগুলো একত্রিত করে হাযির করলে আল্লাহ পাক তাকে পুনর্জীবন দান করেন। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক বৃক্ষ উৎপাদন করেন এবং এ সবুজ বৃক্ষ থেকে তিনি অগ্নি বের করেন, আর এটি কোন কঠিন কাজ নয়, এমনিভাবে জীবিতকে মৃত্যুমুখে পতিত করা এবং মৃতকে পুনর্জীবন দান করা আল্লাহ পাকের পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। এজন্যে আরবে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচরিত রয়েছেঃ

لكل شجر نار استمجد المرخ والعفار

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আঙ্গুর বৃক্ষ ব্যতীত সকল বৃক্ষেই অগ্নি রয়েছে।

যাহোক, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর পক্ষে মানুষকে সৃষ্টি করা, তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করা এবং তাকে পুনর্জীবন দান করে তাঁর দরবারে হাযির করা সবই সহজ এবং সবই সম্ভব। এ বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মোমেন মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। আর পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা সৌভাগ্যের ব্যাপার।[১]

أَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ

بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۞

'যিনি আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন না? হ্যাঁ, নিশ্চয় পারেন, তিনিই প্রকৃত স্রষ্টা আর তিনিই সর্বজ্ঞ'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বর্ণনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ যিনি বিশাল আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার অস্তিত্ব প্রদান করা কোন অবস্থাতেই কঠিন হতে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৩, পৃষ্ঠা-২০-২১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা--৫৭১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৫৪

পারেনা। তোমরা বিরাট বিস্তৃত নীলাভ আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং বিশাল বিস্তৃত জমীনের দিকেও তাকাও, যিনি আসমান জমীনের ন্যায় মহা সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে পাঁচ/ছয় ফুট ক্ষুদ্র মানুষের পুনঃসৃষ্টি কি আদৌ কঠিন হতে পারে? আসমানের নীচে জমীনের উপর কোটি কোটি মানুষ বাস করছে, আসমান জমীনের সৃষ্টির তুলনায় মানুষের সৃষ্টি নিতান্ত সামান্য ব্যাপার, এরপরও কি কোন বুদ্ধিমানের পক্ষে একথা চিন্তা করা সম্ভব হয় যে, মানুষকে পুনর্জীবন দেয়া আল্লাহ্ পাকের পক্ষে কঠিন হবে? অবশ্যই নয়, তিনি মহান স্রষ্টা, তিনি মহাজ্ঞানী, সৃষ্টি জগতের সব কিছুই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে। তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্য বিস্ময়কর, এজন্যে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

'মানুষের সৃষ্টি থেকে আসমান জমিনের সৃষ্টি অত্যন্ত বড় ব্যাপার'।

وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ

তিনি মহান স্রষ্টা, তিনি একের পর এক সৃষ্টি করে থাকেন, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۝

'আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা তো এমনই, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তার সম্পর্কে বলেন, 'হও', আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও', অমনি ঐ বস্তুটি অস্তিত্ব লাভ করে। তিনি যা কিছু করতে চান, তার জন্যে তাঁর একটি আদেশই যথেষ্ট।

মসনদে সংকলিত একখানি হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে আমার বন্দাগণ! তোমরা সবাই গুনাহগার, তবে যাকে আমি ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। তোমরা সবাই ফকির, যাকে আমি ধনী করি, আমি অত্যন্ত বড় দাতা, আমি যা ইচ্ছা তা করি। আমার পুরস্কারও একটি কথা, আর আমার আযাবও একটি কথা, আমি যা কিছু করতে চাই, আমি শুধু বলি, 'হও' তখন তা হয়ে যায়। সকল মন্দ বস্তু থেকে আল্লাহ পাকের মহান সত্ত্বা সম্পূর্ণ পবিত্র। যিনি আসমান জমীনের বাদশাহ, যাঁর হাতে আসমান জমীনের চাবি রয়েছে তিনি সকলের

স্রষ্টা, তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাবান। কেয়ামতের দিন সবাইকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তিনিই সুবিচারক, তিনিই নেয়ামতদাতা, তিনিই মানুষকে শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন, তিনিই আল্লাহ পাক, যাঁর হাতে সব কিছুর ক্ষমতা রয়েছে, তাই কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝

'বরকতময় সেই আল্লাহ পাক, যাঁর হাতে রয়েছে সমস্ত ক্ষমতা, আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বোপরি শক্তিমান'।

একথার তাৎপর্য হলো, সমগ্র বিশ্বজগতের সব কিছুর সমূহ কর্তৃত্ব এবং প্রভূত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই হাতে রয়েছে। অতএব, মানুষকে পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান করা তাঁর জন্যে কঠিন কোন বিষয়ই নয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, আল্লাহ পাক যাকে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন সে বিলক্ষণ জানে যে, আল্লাহ পাক শুধু একবার নয়; বরং হাজার বার সৃষ্টি করতে, মৃত্যুমুখে পতিত করতে এবং পুনর্জীবন দান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ

'তিনি মহা মহিমান্বিত, তাঁর হাতেই রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং তিনি সব বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান'।

অর্থাৎ যখন এ সত্য জানা গেল যে, আল্লাহ পাক মানুষকে একটি শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং একথাও প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ পাক মরা পঁচা হাড়গুলোতে পুনরায় প্রাণ দিতে সক্ষম, আর এ সত্যও উদ্ভাসিত হলো যে, আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা করতে পারেন এবং কোন কিছুকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলে তিনি শুধু আদেশ দেন 'হও' বলে, তখন তা হয়ে যায়। এমন অবস্থায় প্রত্যেকের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করা। কাফেররা তাদের মূর্খতা বশতঃ তাঁর শানে যে সব আপত্তিকর মন্তব্য করে তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর রহমত সবার উপরে রয়েছে অব্যাহত।

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'আর তাঁরই নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটির মধ্যে দু'টি কথা রয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলবে তাদের জন্যে পুরস্কারের

প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবে তাদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী।[১]

এ সূরার মর্মকথা

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরায় তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

(এক) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের কথা এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েয়েছেঃ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

'(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি রসূলগণের অন্যতম'।

(দুই) তৌহীদের অনেক দলিল প্রমাণ বর্ণনা করে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ

'অতএব, পবিত্র সেই আল্লাহ পাক, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা', তাই প্রত্যেককে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য।

وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۝

(তিন) 'আর তাঁরই নিকট সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'।

অর্থাৎ প্রত্যেককেই পুনর্জীবন দেয়া হবে এবং প্রত্যেকেরই পুনরুত্থান হবে, এভাবে হাশরের ময়দানে হাযির হবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা ইয়াসীনের ফজিলতের আরো কিছু বিবরণ

হযরত মা'কাল এবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা নিজেদের মৃত ব্যক্তিদের জন্যে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে থাক। (আহমদ, আবু দাউদ, এবনে মাজা, এবনে হাব্বান, হাকেম)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'ইয়াসীন' কোরআনের দিল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের লক্ষ্যে এ সূরা পাঠ করবে তাঁকে ক্ষমা করা হবে। এ সূরাকে তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্যে পাঠ করতে থাক। আল্লামা যজরী (রঃ) হেসনে হাসীন শরীফে এই হাদীস এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীনকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৭৩

আখেরাতের সাফল্য লাভের লক্ষ্যে পাঠ করবে, তাকে অবশ্যই ক্ষমা করা হবে। এ সূরাকে তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্যে পাঠ করতে থাক।

হযরত মা'কাল এবনে ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার বিগত জীবনের গুনাহ সমূহ মাফ করা হবে, এজন্যে তোমরা নিজেদের মৃতদের জন্যে এ সূরা পাঠ করতে থাক। (বায়হাকী)

তেবরানী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, এরপর তার মৃত্যু হবে, তবে সে শহীদের মর্তবা পাবে।

হযরত আবুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দায়লামী, আবুশ শেখ, এবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, যে মৃত্যু পথের যাত্রীর নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করা হয়, তবে তার মৃত্যু সহজ করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নিজের কোন প্রয়োজনে সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রয়োজনের আয়োজন করে দেবেন।

মুসতাদরাকে ইমাম আবু জাফর মোহাম্মদ এবনে ইমাম জয়নুল আবেদীনের কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। যে ব্যক্তি তার মনে কাঠিন্য উপলব্ধি করে তার কর্তব্য হলো, একটি পাত্রে জাফরান দ্বারা সূরা ইয়াসিন লিপিবদ্ধ করে পান করা।

সাঈদ এবনে যোবায়েরের কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, যে ব্যক্তি পাগলের উপর সূরা ইয়াসিন পাঠ করে ফুঁক দেবে, আল্লাহ পাক তাকে সুস্থ করে দেবেন।

ইয়াহয়া এবনে আবি কাসীর বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে এ সূরা পাঠ করবে, সারা দিন সে খুশীতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, ভোর পর্যন্ত সে আনন্দিত থাকবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৭৩-৭৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সাফ্‌ফা-ত

মক্কায় অবতীর্ণ, রুকু-৫, আয়াত-১৮২, বাক্য-৮৬০, অক্ষর-৩,৮২৯

سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّاثْنَتَانِ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ (١) فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ (٢) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ (٣)

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ (٤) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

الْمَشَارِقِ ؕ (٥) اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۣ الْكَوَاكِبِ ۙ (٦) وَحِفْظًا

مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ (٧) لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ

مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ (٨) دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ (٩) اِلَّا مَنْ خَطِفَ

الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ

مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ (١١) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ (١٢)

وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ (١٣)

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে (আরম্ভ করছি)

তরজমা

(১) শপথ সেই ফেরেশতাদের, যারা (আল্লাহ পাকের সম্মুখে) সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে,

(২) শপথ সেই ফেরেশতাদের, যারা কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে

(৩) এবং শপথ সেই ফেরেশতাদের, যারা জিকর তেলাওয়াতে রত থাকে।

(৪) নিশ্চয় তোমাদের (প্রকৃত) মাবুদ এক,

(৫) যিনি আসমান জমীন এবং তাদের অর্ন্তবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক এবং তিনি উদয়স্থল সমূহের প্রতিপালক।

(৬) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আসমানকে সৌন্দর্য দান করেছি নক্ষত্রপুঞ্জের সৌন্দর্য দ্বারা,

(৭) এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে,

(৮) ফলে তারা উর্দ্ধ জগতের কিছুই শ্রবণ করতে পারেনা, সব দিক থেকেই তাদের উপর মার পড়ে।

(৯) তাদেরকে তাড়াবার জন্যে আর তাদের জন্যে রয়েছে চিরকালীন শাস্তি।

(১০) তবে কেউ হঠাৎ করে শ্রবণ করে ফেললে জ্বলন্ত উল্কা পিন্ড তাদের পেছনে ধাওয়া করে।

(১১) (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার সৃষ্টি কঠিনতর? নিশ্চয় আমি তাদেরকে আঠালো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।

(১২) বরং (হে রসূল!) আপনি বিস্ময় বোধ করছেন, আর তারা করছে বিদ্রুপ।

(১৩) আর যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তা গ্রহণ করেনা।

সূরা সাফ্‌ফা-ত প্রসঙ্গে

১৮২ আয়াত বিশিষ্ট এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় তৌহীদ, রেসালত এবং কেয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। সূরা (ইয়াসিন) শুরু করা হয়েছে রেসালতের কথা দ্বারা। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে তৌহীদের বিষয় নিয়ে। এ সূরাতেও উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সূরা ইয়াসিনে সৃষ্টি ও লয় এবং পুনরুত্থানের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, আর আলোচ্য সূরায় তৌহীদ ও রেসালতের উপর সবিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

আরবের পৌত্তলিকরা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকত, তৌহীদকে অমান্য করতো, নক্ষত্রপুঞ্জের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করতো এমনকি, তারা একথাও বিশ্বাস করতো যে, মানুষের তকদীর নির্ধারণ ও পরিবর্তনে নক্ষত্রপুঞ্জের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্যে তারা নক্ষত্রপুঞ্জের পূজায় লিপ্ত ছিল। জ্বীন এবং শয়তানদের সম্পর্কে তাদের এ বিশ্বাস ছিল যে, তারা আসমানে গিয়ে উর্দ্ধ জগতের খবর এনে মানুষকে দিতে পারতো, আর গণকদের উপরও তাদের আস্থা ছিল প্রচুর, আর কেয়ামতকে অস্বীকার করতেও তারা দ্বিধা করতো না, আলোচ্য সূরায় মুশরেকদের এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তার প্রতিবাদ করা হয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়।[১]

নেসায়ী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হালকাভাবে নামায আদায়ের আদেশ দিতেন এবং তিনি নিজে নামাযে সূরা সাফ্‌ফা-ত তেলাওয়াত করতেন।[২]

এ সূরার ফজিলত

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা ইয়াসিন এবং সূরা সাফ্‌ফা-ত পাঠ করবে, এরপর আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করবে, আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করবেন এবং তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করবেন।[৩]

তফসীরুল কোরআন

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾

শপথ ঐ ফেরেশতাদের যারা নামাযীদের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষায় দন্ডায়মান রয়েছে। আর এ দন্ডায়মান অবস্থায় তারা আল্লাহ পাকের দরবারে বন্দেগীর হক্ব আদায় করে থাকেন।

অথবা এর অর্থ হলো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের বন্দেগীর সময় কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেমন নামাযী নামাযে এবং মুজাহেদগণ জেহাদে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৫৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-২২
৩। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৪

হযরত যাবের এবনে সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যেভাবে ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের সম্মুখে কাতারবন্দী হয়ে আদেশের অপেক্ষায় থাকেন (তোমরা কি নামাযে বা জেহাদে), এভাবে কাতারবন্দী হতে পার না? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! ফেরেশতাগণ কিভাবে কাতারবন্দী হয়ে থাকেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কাতারগুলোকে পূর্ণ করেন এবং সুদৃঢ় ভাবে কাতারে দন্ডায়মান হন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ফেরেশতাগণ মহাশূণ্যে ডানা ছড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, আল্লাহ্ পাকের মর্জি মোতাবেক কোন আদেশ লাভের পূর্ব পর্যন্ত।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, الصّٰفّٰتِ শব্দটির অর্থ হলো পাখী, কেননা অন্য আয়াতে وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ বলা হয়েছে।

যাহোক الصّٰفّٰتِ এর দু'টি অর্থ হতে পারে (১) আল্লাহ পাকের আদেশ শ্রবণের অপেক্ষায় দন্ডায়মান ফেরেশতাগণ অথবা (২) নামায এবং জেহাদ প্রভৃতি বন্দেগীতে সারিবদ্ধ অবস্থায় দন্ডায়মান মানুষকেই এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝

'শপথ সেই ফেরেশতাদের, যারা কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে'।

অর্থাৎ শপথ সেই ফেরেশতাদের, যারা মেঘমালাকে বাধা প্রদান করে এবং পরিচালনা করে তথা যেখানে বৃষ্টিপাতের আদেশ হয়, সেখানে মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। অথবা সেই ফেরেশতা যারা জ্বীন এবং শয়তানকে মানুষকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে বাধা প্রদান করেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা সে সব ফেরেশতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মানুষের অন্তরে সৎ কাজের ইচ্ছা সৃষ্টি করে পাপাচার থেকে বিরত রাখেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৯
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৫৭৮

অথবা যে সব ফেরেশতা মানুষকে শয়তানী প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করতে সহায়ক হয় এবং শয়তানদেরকে মন্দ প্ররোচনা দিতে বাধা দেন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা পবিত্র কোরআনের সে সব আয়াতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, শয়তানের দল আসমানী কথা-বার্তা যেন শ্রবণ করতে না পারে এ উদ্দেশ্যে যে ফেরেশতাগণ দায়িত্ব পালন করেন, এ শব্দ দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝

'এবং শপথ সেই ফেরেশতাদের, যারা জিকর তেলাওয়াতে রত থাকে'।

অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদের শপথ, যারা আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকে, যারা সে আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে যা আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট নাযিল হয়েছে।

অথবা এর অর্থ সেই নামাযীগণ, যারা নামাযের জামাতে হাযির হয়, যারা আল্লাহর রাহে জেহাদে রত হয়, যারা কাতারবন্দী হয়, যারা যুদ্ধরত অবস্থায়ও আল্লাহর জিকরে রত থাকে, কখনো আল্লাহর জিকর থেকে গাফেল হয়না।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা সে সব ফেরেশতা বা মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ শ্রবণের পর তা রপ্ত করে এবং অপরকে শুনিয়ে থাকে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য তিনটি বাক্য দ্বারা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অন্যান্য অনেক তফসীরকারও এ মতই পোষণ করেন।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, ফেরেশতারা আসমানে কাতারবন্দী থাকেন।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাদেরকে অন্য লোকদের উপর তিনটি বিষয়ে বিশেষ ফজিলত প্রদান করা হয়েছে (১) আমাদের কাতারগুলোকে ফেরেশতাদের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৬১
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৬৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৯

কাতারের ন্যায় করা হয়েছে, (২) আমাদের জন্যে সারা পৃথিবীকে মসজিদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং (৩) পানির অভাব হলে মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[১]

إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۞

'নিশ্চয় তোমাদের (প্রকৃত) মা'বুদ একই'।

অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান ফেরেশতাদের শপথ, যারা শয়তানদেরকে আসমানী সংবাদ সংগ্রহ করা থেকে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে এবং যারা সর্বদা জিকর তেলাওয়াতে রত থাকে, তাদের শপথ করে ঘোষণা করছি যে তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ একই, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই, তিনি এমন সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের শপথ করে তৌহীদের ঘোষণা করেছেন। একথার তাৎপর্য হলো, আসমান ও জমিনের সমস্ত ফেরেশতাগণ একথার স্বাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা, বিশ্ব প্রতিপালক এক আল্লাহ পাকই, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই।

আলোচ্য আয়াত সমূহে ফেরেশতাগণের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে (এক) ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে থাকেন (দুই) আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার উদ্দেশ্যে অথবা তারা মহাশূণ্যে ডানা মেলে কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহ পাকের আদেশ লাভের জন্যে অপেক্ষমান থাকেন। অথবা (৩) কাতারবন্দী হবার তাৎপর্য হলো, প্রত্যেক ফেরেশতার জন্যে স্থান এবং মর্তবা নির্দিষ্ট রয়েছে। সে নির্দিষ্ট স্থানে এবং মর্তবায় তারা কাতারবন্দী হয়ে থাকেন।

মক্কার কাফেররা বলেছিল–

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

'মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কি সকল মা'বুদকে এক মা'বুদই বানিয়ে দিলেন, এ তো এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারই জবাবে আল্লাহ পাক একথা ঘোষণা করেছেন যে, আসমান জমীনের সমস্ত ফেরেশতাগণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, তোমাদের প্রতিপালক এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-২৪

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ۝

'যিনি আসমান জমীন এবং তাদের অর্ন্তবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক এবং তিনি উদয়স্থল সমূহের প্রতিপালক'।

অর্থাৎ আসমান জমীন এবং তার মধ্যকার যাবতীয় কিছুর একমাত্র মালিক, একমাত্র স্রষ্টা ও পালনকর্তা এবং একচ্ছত্র পরিচালক।

আলোচ্য আয়াতে مشارق শব্দটির অর্থ নক্ষত্রপুঞ্জের উদিত হবার স্থান, অথবা সূর্যের উদয়স্থলকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রত্যেক দিনই একটি উদয়স্থল থাকে এবং একবার কোন স্থানে উদিত হলে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে আর সে স্থানে উদিত হয়না।

এদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সূর্যোদয়ের ৩৬৫টি স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। এমনিভাবে পশ্চিমাকাশে অস্ত যাওয়ার জন্যেও ৩৬৫টি স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রতি দিন সূর্য তার নির্দিষ্ট স্থানেই অস্ত যায়। কখনো এতে সামান্যতম ব্যতিক্রমও হয় না।

এর দ্বারা মহান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত এবং নেয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের এ শব্দ দ্বারা শুধু পূর্বাকাশে সূর্যোয়ের স্থানের কথা বলা হয়েছে, পশ্চিমাকাশে অস্ত যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ এই যে, দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তুর মধ্যে একটির উল্লেখ করলেই অন্যটি বুঝতে অসুবিধা হয়না। এতদ্ব্যতীত, অস্তের তুলনায় উদয়ের মধ্যেই আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের মহিমার অধিকতর প্রকাশ ঘটে। তাই مشارق বা উদয়ের স্থানের উল্লেখই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

আসমানের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পূর্যন্ত সূযোদয়ের স্থান সমূহ সুনির্দিষ্ট রয়েছে। এমনিভাবে নক্ষত্রগুলোর উদয়ের জন্যেও ভিন্ন ভিন্ন স্থান সুনির্ধারিত রয়েছে। এসব কিছু সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। ফেরেশতাগণের শপথের মাধ্যমে তৌহীদের বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অগণিত ফেরেশতাগণের আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে কাতারবন্দী থাকা এবং আসমান সমূহে প্রহরীর দায়িত্ব পালন করা এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করা একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ পাক এক, অদ্বিতীয়, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন। সমগ্র সৃষ্টি জগৎই আল্লাহ পাকের কুদরত, হেকমত ও মাহাত্মের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আসমান জমীন ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, ফেরেশতাসহ সবই এক বাক্যে ঘোষণা করছে, সবার প্রতিপালক এক

আল্লাহ পাক। তিনিই সব কিছুর একমাত্র মালিক, তাঁর একচ্ছত্র প্রভূত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, তৌহীদের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের দলিল প্রমাণ এবং কিছু নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ۝

'নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আসমানকে সৌন্দর্য দান করেছি নক্ষত্রপুঞ্জের সৌন্দর্য দ্বারা আর রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাকের কুদরতের একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা লক্ষ্য কর আল্লাহ পাক আসমানকে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন, দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানকে চাঁদোয়ার মত করে তৈরী করা হয়েছে আর এ আসমানকে অসংখ্য তারকারাজি দ্বারা সুশোভনীয় করা হয়েছে। চাঁদনী রাতে আলোকময় আকাশের এ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে হয়, 'সোবহানল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'। আল্লাহ পাক দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানকে যা মানুষ অহরহ দেখতে পায় তার সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন অগণিত তারকারাজির দ্বারা। এ অসংখ্য তারকারাজি নীলাভ আকাশের সৌন্দর্য বর্ধনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শোভা সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। কেননা, এগুলো আপনা আপনিই হয়ে যায়নি; বরং আল্লাহ পাক তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত এবং রহমতে এসব দান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এ তারকারাজি দ্বারা শুধু যে আসমানের সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে তাই নয়; বরং অভিশপ্ত শয়তান তাড়ানোর ব্যাপারেও নক্ষত্রপুঞ্জের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিছু কিছু তারকা এমনও রয়েছে, যা ইবলিস শয়তানের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, শয়তান বিতাড়নে যে তারকা ব্যবহৃত হয়, তা অন্য তারকা থেকে স্বতন্ত্র। এ তারকাগুলোর মধ্যে আগ্নেয় দাহিকা শক্তি থাকে, যা ইবলিস শয়তান ও তার অনুচরদের উপর নিক্ষেপ করা হয় যেন ইবলিস শয়তান বা তার কোন অনুচর ফেরেশতাদের কোন কথা শ্রবণ করতে না পারে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইতোপূর্বে শয়তানরা আসমানে পৌঁছে ওহী শ্রবণ করতো, একটি কথা শ্রবণ করে আর নয়টি মিথ্যা কথা তার সঙ্গে যুক্ত করে গণকদের নিকট পৌঁছাত। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যত দান করা হলো, তখন শয়তানদের আসমানে যাওয়া বন্ধ করা হলো, যদি যাওয়ার চেষ্টা করে তখন আগ্নেয় দাহিকা শক্তি সম্পন্ন তারকা তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়, এ সংবাদ যখন অভিশপ্ত ইবলিস পায় তখন সর্বত্র সে তার

অনুচর প্রেরণ করে, যারা আরবের দিকে যায় তারা 'নাখলা'র দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামাযে রত অবস্থায় দেখতে পায়। ইবলিসকে যখন এ সংবাদ দেয়া হয় তখন ইবলিস বলে, এ ব্যক্তির কারণেই আমাদের আসমানে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে।[১]

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ۝

'ফলে তারা উর্দ্ধ জগতের কিছুই শ্রবণ করতে পারেনা, সব দিক থেকেই তাদের উপর মার পড়ে'।

অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে শয়তানরা কোন গোপন কথা শুনতে পাবে, এমন শক্তি তাদের আর রয়নি। তাদের উপর সবদিক থেকেই আঘাত আসে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ۝

'তাদেরকে তাড়াবার জন্যে আর তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি বা কঠিন শাস্তি'।

অর্থাৎ আখেরাতের আযাব তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা দুনিয়ার শাস্তি উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, আর তারা অগ্নিকুন্ডে জ্বলতে থাকবে।

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۝

'তবে কেউ হঠাৎ করে কোন কিছু শ্রবণ করে ফেললে জ্বলন্ত উল্কা পিন্ড তাদের পেছনে ধাওয়া করে'।

অর্থাৎ যদি ফেরেশতাদের কথার কোন অংশ চুরি করে কেউ পলায়নে সচেষ্ট হয়, তখন তার উপর জ্বলন্ত উল্কা পিন্ড নিক্ষেপ করা হয়। এভাবে তার উপর ভীষণ মার পড়ে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে এভাবে শায়েস্তা করেন।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে; আল্লাহ পাক তারকারাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন (১) আসমানের সৌন্দর্য বর্ধনে (২) শয়তানদেরকে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-২৪

মারার জন্যে (৩) পথ-প্রদর্শনের জন্যে। এতদ্ব্যতীত, তারকারাজি সৃষ্টির অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন আল্লাহ পাক আসমানে কোন বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন, তখন ফেরেশতাগণ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাদের ডানা ঝাপটায়, কোন পাথরের উপর জিঞ্জির স্পর্শ করলে যেমন শব্দ হয়, ফেরেশতাগণের ডানা ঝাপটানোয় তেমন শব্দ শ্রুত হয়। যখন ফেরেশতাদের অন্তর থেকে অপেক্ষাকৃত কিছু ভয় দূর হয়, তখন তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী আদেশ করেছেন'? তখন অন্য ফেরেশতাগণ বলেন, 'আল্লাহ পাকের ফরমান সত্য, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের অধিকারী'। ফেরেশতাদের একথা কিছু শয়তান চুরি করে শ্রবণ করে এবং তাদের নিকট অন্যরাও এভাবে শ্রবণ করে। এভাবে উপরের শয়তান নীচের শয়তানকে জানিয়ে দেয়। একের পর এক শুনতে থাকে। যে শয়তান সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে, সে ঐ কথাটি যাদুকর কিংবা গণকের নিকট পৌঁছে দেয়। পরিণামে ঐ কথাটি যাদুকর গণকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এদিকে জ্বলন্ত উল্কা পিন্ড শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে যাদুকর এবং গণকরা ঐ কথার সঙ্গে আরো একশ'টি মিথ্যা কথা একত্রিত করে মানুষের নিকট বর্ণনা করে (এমন হবে, এমন হবে)। গণকদের কথামত যদি একটি কথাও সত্য হয়, তবে ঐ একটি কথার কারণেই ঐ গণকের প্রচার হয় এবং তার কথার সত্যায়ন হয়, এভাবে তার সম্পর্কে কথা বলা হয় যে, অমুক গণক এ বিষয়ে এমন কথা বলেছিল।

মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে যে, আমাদের পরওয়ারদেগার যখন কোন বিষয়ের আদেশ করেন, তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করেন। এরপর আরশের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করেন। এভাবে আল্লাহ পাকের নামের তসবীহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর দুনিয়াতে আসার পর শয়তানরা চুরি করে ঐকথা শ্রবণ করে পলায়ন করে এবং নিজেদের বন্ধুদের নিকট তা বর্ণনা করে।

ইমাম বোখারী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ফেরেশতাগণ মেঘখন্ডে অবতরণ করে আর একথার উল্লেখ করে যে বিষয়ের আদেশ আসমানে

হয়েছে, তাকে শয়তান চুরি করে এবং গণকদের নিকট পৌঁছে দেয়। গণকরা তার মধ্যে আরো একশ'টি মিথ্যা কথা একত্রিত করে প্রচার করে।[১]

এ আলোচনায় একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ পাক তারকারাজির দ্বারা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানের সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন, দ্বিতীয়তঃ ইবলিস শয়তান যেন ফেরেশতাদের কোন কথা শুনতে না পারে, তার জন্যে এ নক্ষত্রপুঞ্জকে ব্যবহার করা হয় এবং শয়তানরা যেদিক থেকেই আসুক না কেন, তাদের প্রতি তা নিক্ষেপ করা হয়।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, শয়তানরা এ কারণে ক্ষেত্রবিশেষে আহত অথবা দগ্ধ হয়।

এত একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন কোন কাফের ফেরকা তারকারাজির পূজা করে, তা গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, তারকারাজি দ্বারা আসমান আলোকময় হয় এবং শয়তান বিতাড়িত হয়, তা তারকাজির ক্ষমতায় নয়; বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতে। অতএব, তারকারাজি কোন অবস্থাতেই পূজনীয় হতে পারেনা।

পাশাপাশি একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ পাকের তাবেদার সৃষ্টি, আল্লাহ পাকের হুকুম পালনই তাদের কাজ। তারা মানুষের মত আল্লাহর নাফরমান হয়না; হতে পারেনা, ফেরেশতাগণ সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের অনুগত থাকেন। সেক্ষেত্রে যেসব পৌত্তলিক ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্ পাকের কন্যা (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক) বলে আখ্যায়িত করে, এ আয়াত সমূহ দ্বারা তাদের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতাও সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

অতএব, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনি এক আল্লাহ্ পাকই, সকল বন্দেগী, সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই জন্য, তিনি ব্যতীত সব কিছু তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

এ পর্যন্ত তৌহীদের বিবরণ ছিল। কেননা, সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার জীবন্ত প্রমাণ। আর সৃষ্টি যত বিস্ময়কর হয় ততই সে তার স্রষ্টার অধিকতর শক্তির প্রমাণ বহন করে। তাই আসমান, জমীন, চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ দেখে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৩-১৪

পরবর্তী আয়াতে সে সব পথভ্রষ্ট লোকদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, যারা একথা অসম্ভব মনে করে যে, আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতিকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন। তাদের উদ্দেশ্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ۝

'(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার সৃষ্টি অধিকতর কঠিন? নিশ্চয় আমি তাদেরকে আঠালো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি'।

যারা পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করে, পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস করে (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এ বিশাল বিস্তৃত আসমান এবং জমীন, এ ফেরেশতা প্রভৃতির সৃষ্টি অধিকতর কঠিন না তাদের সৃষ্টি? একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মানুষের সৃষ্টির তুলনায় এসব বিরাট বিশাল সৃষ্টি অধিকতর কঠিন, মানুষকে তো আল্লাহ পাক আঠালো মাটি দ্বারা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, পুনরায় তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করবেন, আর মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করবেন, এতে অবাক হবার কিছু নেই, আর এটি অবিশ্বাসেরও বিষয় নয়। যিনি আসমান জমীন সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাঁর পক্ষে ক্ষুদ্রাকার মানুষকে সৃষ্টি করা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার। দূরাত্মা কাফেররা কেন এ সত্য অনুধাবন করেনা?

কোন কোন তফসীরকার مَنْ خَلَقْنَا এর ব্যাখ্যা করেছেন, অতীতের উম্মতগুলোকে যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি প্রভৃতি, তারা মক্কাবাসীর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল, কিন্তু তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এমন অবস্থায় মক্কাবাসী তাদের নাফরমানী অব্যাহত রেখে কিভাবে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারে?[১]

কাফেররা বলতো, 'আমরা মাটি হয়ে গেলে পুনরায় নব সৃষ্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবো'? আল্লাহ পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন-কল্পেই এরশাদ করেছেনঃ মানুষকে আমি আঠালো মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি অতএব, তাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন কাজ নয়।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ۝

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৫

'বরং (হে রসূল!) আপনি বিস্ময়বোধ করছেন, আর তারা করছে বিদ্রুপ'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের ধৃষ্টতা, পথভ্রষ্টতা, মূর্খতা এবং অহেতুক দৌরাত্ম দেখে বিস্ময় বোধ করছেন, আর তারা আপনাকে নিয়ে উপহাস করছে, তারা বলছে, 'ইনি আজগুবি কথা বলছেন, মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে গেলে পুনরায় জীবিত হওয়া কি সম্ভব? মৃত্যুর পর অস্থি কংকালে পরিণত হয়ে গেলাম, এরপর কি আবার জীবিত হবো'? এ কেমন কথা?

কাফেরদের এ মূর্খতা এবং নির্বুদ্ধিতার কারণেই তারা সঠিক পথ অবলম্বন করেনা এমনকি, তাদেরকে উপদেশ দিলেও তারা উপদেশ গ্রহণ করেনা। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ۝

'আর যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা তা গ্রহণ করেনা'।

অর্থাৎ যখন পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় এবং অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাদেরকে এ জীবন ও পরজীবন সম্পর্কে সঠিক পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়, তখন তারা তা গ্রহণ করেনা।

অথবা এর অর্থ হলো, হাশরের ময়দানে হাযির হওয়া তথা পুনরুত্থানের প্রকৃষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত হবার পরও তাদের মূর্খতা নির্বুদ্ধিতার কারণে এবং তাদের অপরিণামদর্শীতার দরুন তারা সত্য উপলব্ধি করেনা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবার থেকে হেদায়েত লাভ করেনা।

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ
هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ
وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا
يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ
صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ
هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾
قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾

তরজমা

(১৪) আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখতে পায় তখন বিদ্রুপ করে

(১৫) এবং তারা বলে, 'এটি তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

(১৬) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?

(১৭) এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও?

(১৮) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আর তোমরা হবে লাঞ্ছিত,

(১৯) এটি একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ, আর তখনই তারা তা প্রত্যক্ষ করবে।

(২০) আর তারা বলবে, 'দুর্ভোগ আমাদের, এটিই তো কর্মফল দিবস'।

(২১) এটিই সেই বিচারের দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

(২২) (ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেয় হবে) একত্রিত কর, পাপীষ্ঠদেরকে ও তাদের স্ত্রীদেরকে এবং যাদের তারা পূজা করতো তাদেরকেও।

(২৩) আল্লাহ পাকের স্থলে তারা যাদের পূজা করতো, তাদেরকে দোযখের দিকে পরিচালিত কর।

(২৪) আর তাদেরকে দাড় করিয়ে রাখ, নিশ্চয় তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(২৫) তোমাদের কী হলো, তোমরা একে অন্যকে কেন সাহায্য করছো না?

(২৬) বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে।

(২৭) এবং তারা একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে,

(২৮) তারা বলবে, 'তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে'।

(২৯) তারা বলবে, 'তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলেনা'।

তফসীরুল কোরআন

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ۝

'আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখতে পায় তখন বিদ্রুপ করে'।

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ অনেক মোজেযা দান করেছেন। কাফেররা এমন কোন মোজেযা দেখলে তা নিয়ে উপহাস করতো, এ বিদ্রুপ এবং উপহাসে তারা আনন্দ লাভ করতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তো দূরের কথা, তাঁর নিকট থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেলে তারা বিদ্রুপ করতে একে অন্যকে ডেকে আনতো। আলোচ্য আয়াতের اٰيَةً শব্দটির অর্থ হলো এমন মোজেযা, যা দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতা প্রমাণিত হতো।

হযরত আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার মোজেযাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আবু জেহেলের অনুরোধে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলি মোবারকের ইঙ্গিতে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হলো, তখন তারা এমন বিস্ময়কর বিষয় দেখেও ঈমান আনলো না; বরং এর উপহাস করলো।

কাতাদা (রঃ), আবু নাজীহ (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৭
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩০

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এর অর্থ হলো কাফেররা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন মোজেযা দেখতো, তখন তারা অত্যন্ত বেশী ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো এবং অন্যদেরকেও বিদ্রুপ করার জন্যে ডেকে আনতো, কেননা কাফেররা মনে করতো এসব হলো যাদু, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

'এবং তারা বলে, 'এটি তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ পর্যায়ে আরবের বিখ্যাত বীর কুস্তিগীর রোকানার ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

মক্কার অধিবাসী রোকানাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি পাহাড়ের পাদদেশে বকরী চরাতে দেখলেন, তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন, সে বললো, 'আমি এসব কথা বুঝিনা, আমি কুস্তিগীর, আমাকে কুস্তিকে পরাভূত করতে পারলে আমি বিষয়টি চিন্তা করবো'। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যদি তোমাকে কুস্তিতে পরাজিত করি, তবে ইসলাম কবুল করবে তো'? সে বললো, 'জ্বী হ্যাঁ'। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রোকানার সঙ্গে কুস্তি লড়তে হলো, তিনি তাকে একে একে তিনবার ধরাশায়ী করলেন। এরপরও সে আরও কিছু মোজেযা দেখার জন্যে আবেদন করলো। তখন তিনি একটি বৃক্ষকে ডাকলেন, বৃক্ষটি তাঁর নিকট হাযির হলো। এরপরও রোকানা মক্কাবাসীর নিকট এসে বললো, ইনি বিরাট যাদুকর, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় (অবশ্য পরবর্তীতে রোকানা ইসলাম গ্রহণ করেন)।[১]

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝

'আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে'?

অর্থাৎ আমরা যখন মরে পঁচে মাটি হয়ে যাব, তারপরও কি পুনরায় জীবিত হবো? এটি কি কখনও সম্ভব? আর শুধু আমরাই নই, আমাদের পূর্ব পুরুষরাও কি পুনঃজীবন লাভ করবে?

قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دٰخِرُوْنَ ۝

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৭৭

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, 'হ্যা' অবশ্যই তোমাদেরকে পুনঃজীবন দান করা হবে আর তোমরা লাঞ্ছিত হবে'।

দুনিয়ার জীবনে যারা জীবনের মালিক আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, তাঁর বিধি-নিষেধ মানেনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনা, তাদের লাঞ্ছনা, অবমাননা অবধারিত।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ পর্যায়ে উবাই এবনে খালফের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সে মক্কার কোরায়শদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। কিন্তু সে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে অবান্তর প্রশ্ন করলো, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'হ্যাঁ'। আর মনে রেখো, 'আল্লাহ্ পাক তোমাকে পুনঃজীবন দান করবেন এবং দোযখে প্রবেশ করাবেন'।

বস্তুতঃ এটিই হলো লাঞ্ছনা।[১]

এ আয়াতে যারা পরকালীন জিন্দেগীকে অস্বীকার করে তাদের কথার জবাব রয়েছে এ মর্মে যে, তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে শুধু তাই নয়; বরং তোমাদের অন্যায়-অনাচারের শাস্তি স্বরূপ তোমরা লাঞ্ছিত অপমানিত হবে।[২]

আর তোমাদেরকে পুনঃজীবন দান করা এবং হাশরের মাঠে একত্রিত করা কোন কঠিন কাজই নয়, এর জন্যে একটি প্রচন্ড শব্দই যথেষ্ট হবে। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ۝

'এটি একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ, আর তখনই তারা তা প্রত্যক্ষ করবে'।

অর্থাৎ ইসরাফীল (আঃ) যখন শিংগায় ফুঁক দেবেন, তখন সবাই কবর থেকে বের হয়ে দলে দলে হাশরের ময়দানের দিকে অগ্রসর হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এটি হবে হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর দ্বিতীয় ফুঁক।

زجر শব্দটি আভিধাণিক অর্থ হলো, কোন জিনিসকে কোন স্থান থেকে হাঁকিয়ে বের করা, অথবা চিৎকার দিয়ে থামিয়ে দেয়া, যেমন আরবী ভাষায় প্রবাদ রয়েছেঃ

زجر الراعى غنمه

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৭৮
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৮৯৪

(রাখাল তার বকরীকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল)

বর্ণিত আছে, হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর প্রথম ফুঁকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মৃত্যুবরণ করবে, আর দ্বিতীয় ফুঁকের সময় সবাই পুনঃজীবন লাভ করবে। তাই আয়াতের শেষ বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ

(তারা হঠাৎ দেখতে শুরু করবে)

অর্থাৎ কবর থেকে বের হয়ে তারা চতুর্দিকে দেখতে থাকবে।

অথবা এর অর্থ হলো, কবর থেকে বের হয়ে তারা এর অপেক্ষা করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কী ব্যবহার করা হয়।

وَقَالُوا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ۝

'আর তারা বলবে, 'হায় আক্ষেপ! এ-তো আমাদের ধ্বংসের দিন, আমাদের আমলের বদলা পাওয়ার দিন'।

তখন বলা হবে–

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ۝

'এটিই সেই বিচারের দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে'।

এটিই সেদিন যেদিন নেককার এবং বদকার পৃথক করা হবে, এভাবেই কাফেররা কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করবে। কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখে কাফেররা যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তেমনি দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। সেদিন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হবে ঃ

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ۝

'একত্রিত কর পাপীষ্ঠদেরকে ও তাদের স্ত্রীদেরকে এবং তারা যাদের পূজা করতো তাদেরকেও'। এর দ্বারা তাদের ঠাকুর দেবতা এবং শয়তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের দিন জালেমদেরকে অন্য জালেমদের সঙ্গে, সুদখোরদেরকে অন্য সুদখোরদের সঙ্গে এবং মদ্যপায়ীদেরকে মদ্যপায়ীদের সঙ্গে একত্রিত করে উঠানো হবে।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৭৯

বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কাতাদা (রঃ) এবং কালবী (রঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানের সঙ্গে একই জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে উঠানো হবে তথা হাশরের ময়দানে হাযির করা হবে।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, ازواج শব্দটি কাফের মুশরেকদের স্ত্রীদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত এ কাফেররা যত কিছুর পূজা করতো, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটি দ্বারা ইবলিস শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেনঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ

'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি? যে তোমরা শয়তানের পূজা করোনা'।

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ۞

'আল্লাহ পাক ব্যতীত তারা যাদের পূজা করতো তাদেরকে দোযখের দিকে পরিচালিত কর'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো তাদেরকে দোযখের পথ দেখিয়ে দাও।

এবনে কাইসান বলেছেন এর অর্থ হলো, তাদেরকে দোযখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাও।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তাদেরকে দোযখের পথ দেখিয়ে দাও।

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ۞

'আর তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখ, নিশ্চয় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, কাফেরদেরকে যখন দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদেরকে পুলসেরাতের নিকট দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আদেশ হবে, তাদেরকে এখানেই থামিয়ে দাও, নিশ্চয় তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, কাফেরদেরকে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, কাফেরদেরকে শুধু তৌহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কেননা, কাফেররা তৌহীদেই বিশ্বাস করেনা, তাই অন্যান্য আমল সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা।

কেয়ামতের দিন যা জিজ্ঞাসা করা হবে

মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু রেজা আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন বন্দার পা পুলসেরাত স্পর্শ করতে পারবেনা, যে পর্যন্ত না তাকে চারটি প্রশ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। (১) জীবন কী কাজে ব্যয় করেছ? (২) শরীরকে কী কাজে দুর্বল করেছ? (৩) এলম অর্জন করার পর কী আমল করেছ? (৪) অর্থ-সম্পদ কোথা থেকে রোজগার করেছ আর কোন পথে ব্যয় করেছ?

তিরমিজী এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস সংকলন করেছেন এবং তেবরানী হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এমনি হাদীস সংকলন করেছেন।

আবদুল্লাহ এবনে মোবারক 'আজ যোহদ' গ্রন্থে হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার সবচেয়ে বড় ভয় লাগে এ বিষয়ে যে, যখন হিসাব হবে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি যা জানতে, তার উপর কী আমল করেছ'?

ইমাম আহমদ (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বন্দার নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি যা জানতে তার উপর কী আমল করেছ?

এবনে আবি হাতেম আবকা এবনে আবদুল্লাহ কেলায়ীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, দোযখের একাধিক সেতু রয়েছে। প্রত্যেককেই এ সেতু অতিক্রম করে যেতে হবে।

আর প্রত্যেক সেতুর নিকট লোকদেরকে দাঁড় করানো হবে। ফেরেশতাগণ বলবেন, এদেরকে দাঁড় করাও, জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ফলে যাদের ধ্বংস হবার তারা ধ্বংস হয়ে যাবে (অর্থাৎ দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে)। আর যারা নাজাত পাবার তারা নাজাত পেয়ে যাবে। দ্বিতীয় সেতুর নিকট পৌছলে তাদেরকে আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হবে, অর্থাৎ আমানত সঠিকভাবে আদায় করেছে কি-না তা জিজ্ঞাসা করা হবে, এর ফলে যাদের ধ্বংস হবার তারা ধ্বংস হবে, আর যারা নাজাত পাবার তারা নাজাত পেয়ে যাবে। এরপর তৃতীয় সেতুর নিকট পৌছলে তাদেরকে আত্মীয়তার হক্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আত্মীয়তার হক্ব সঠিকভাবে আদায় করেছিল কি-না তা জিজ্ঞাসা করা হবে। এর ফলে যাদের ধ্বংস হবার তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যারা নাজাত পাবার তারা নাজাত পেয়ে যাবে। সেদিন আত্মীয়তার বন্ধন ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে আর বলবে, 'হে আল্লাহ! যে আমাকে জড়িয়ে রেখেছে, তাকে তুমিও জড়িয়ে রাখ। আর যে আমার সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে, তুমিও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর'।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ পর্যায়ে তিনি একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন বনী আদম পা নাড়াতে পারবেনা, যে পর্যন্ত না সে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেয় (১) জীবন কি কাজে ব্যয় করেছ? (২) যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছ? (৩) অর্থ-সম্পদ কিভাবে আয় করেছ? (৪) অর্থ-সম্পদ কি কাজে ব্যয় করেছ? (৫) যা জেনেছিলে তার উপর কি আমল করেছিলে?

আল্লামা আলুসী (রঃ) আরো লিখেছেন, দোযখে পৌছার পূর্বেই এ প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হবে, অর্থাৎ কবর থেকে বের হয়ে দোযখের দিকে যাওয়ার পথেই এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।[২]

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ۝ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ۝

'তোমাদের কী হলো, তোমরা একে অন্যকে কেন সাহায্য করছো না? বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-৮০

অর্থাৎ তাদেরকে সেদিন ধমক দিয়ে বলা হবে যে, এ কঠিন বিপদ মুহূর্তে তোমরা কেন একে অন্যকে সাহায্য করছো না? যদি সাহায্য করার সাধ্য থাকে, তবে সাহায্য কর না কেন? একথাটি হবে সম্পূর্ণ বিদ্রুপাত্মক, কেননা সেখানে সাহায্য করার সাধ্য যে কারো নেই একথা সবারই জানা; বরং সেদিন তারা হবে অত্যন্ত অসহায়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) مُسْتَسْلِمُوْنَ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন خاضعون অর্থাৎ কাফেররা সেদিন অসহায় অবস্থায় থাকবে। আর হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তাবেদার ও অনুগত হবে।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ۝

'এবং তারা একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে'।

অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা এবং তাদের অনুসারীরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, বরং তারা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে, একে অন্যকে তিরস্কার করবে।

قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ۝

তারা বলবে, অর্থাৎ অনুসারীরা তাদের নেতাদের বলবে, অথবা কাফেররা তাদের শয়তানদের বলবে, তোমরা তো অনেক শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে। যেহেতু ডান হাতে বাঁ হাতের অনুপাতে অধিকতর শক্তি থাকে, তাই اليمين। শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর এজন্যেই যাহ্যাক (রঃ) মুজাহেদ (রঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, اليمين। শব্দটি আলোচ্য আয়াতে শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ তারা তাদের নেতাদেরকে বলবে, তোমরা তো দুনিয়াতে শপথ করে বলতে যে, তোমরা যে ধর্মমতের দিকে আহবান কর, তা সত্য বলে তোমরা শপথ করতে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, اليمين। শব্দটির অর্থ হলো শক্তি। অর্থাৎ অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে বলবে, তোমরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্যে বাধ্য করেছ এবং বল প্রয়োগ করে তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর দুশমনে পরিণত করেছ।

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ۝

'তারা বলবে, 'তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না'।

যেহেতু অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে বলবে, তোমরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছ, আমাদের সর্বনাশের জন্যে আজ তোমরাই দায়ী। জবাবে নেতারা বলবে, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। তোমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলে, আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট হবার জন্যে বাধ্য করিনি। অতএব, আমাদের প্রতি দোষারোপের চেষ্টা বৃথা। আজ প্রত্যেককে তার কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর একথা সত্য যে, তোমরা স্বেচ্ছায় ভ্রান্ত পথকে পছন্দ করেছিলে।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا
قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ
يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾
إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ
أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾

তরজমা

(৩০) আর তোমাদের উপর আমাদের তো কোন প্রভাবই ছিলনা, তোমরাই বরং সীমা লঙ্ঘনকারী ছিলে।

(৩১) অতএব, আমাদের উপর আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্যে পরিণত হলো, নিশ্চয় আমাদেরকে শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।

(৩২) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, কেননা আমরা নিজেরাও ছিলাম পথভ্রষ্ট।

(৩৩) তারা সবাই সেদিন শাস্তি ভোগে শরীক থাকবে।

(৩৪) নিশ্চয় আমি পাপীষ্ঠদের ক্ষেত্রে এমনই করে থাকি।

(৩৫) নিশ্চয় তারা এমন ছিল যে, যখন তাদেরকে বলা হতো, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তখন তারা অহংকার করতো।

(৩৬) আর তারা বলতো, 'আমরা কি একজন উন্মাদ কবির কথায় আমাদের দেব-দেবীদের পরিত্যাগ করবো'?

(৩৭) বরং তিনি সত্য ধর্ম নিয়েই এসেছেন এবং অন্যান্য নবী রসূলগণকেও সত্য বলে ঘোষণা করেছেন।

(৩৮) নিশ্চয় তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের দিন কাফেররা তাদের নেতাদের বলবে যে, তোমরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছ, যদি সেদিন আমরা তোমাদের অনুসারী না হতাম, তবে আজ এত বড় বিপদের সম্মুখীন হতাম না। একথার জবাবে তাদের নেতৃস্থানীয়রা বলবে, আমাদের কারণে নয়; বরং তোমরা নিজেরাই ছিলে অবিশ্বাসী, এতদ্ব্যতীত আরো একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, তোমাদের উপর আমাদের তেমন কোন প্রভাব ছিলনা, তাছাড়া পাপাচারে লিপ্ত হবার জন্যে আমরা তোমাদের উপর কোন প্রকার বল প্রয়োগও করিনি। আমরা কি কুফরী নাফরমানী করার জন্যে তোমাদেরকে বাধ্য করেছিলাম? এমন অবস্থা তো ছিল না, তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বও ছিলনা, অতএব একথাই সত্য যে, তোমরা নিজেরাই অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ছিলে, আর কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের জন্যে দায়ী হতে হবে।

সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ 'যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবে, এমন জ্বীন ও মানুষ দ্বারা আমি দোযখকে পরিপূর্ণ করে দেব'।

আল্লাহ পাকের এ ঘোষণাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এমন অবস্থায় অবশ্যই আমাদেরকে আযাবের স্বাদ ভোগ করতে হবে। কাফের নেতারা আরো বলবে, আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, তাই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি, অর্থাৎ আমরা উভয় দলই পথভ্রষ্ট ছিলাম, শুধু কথা এতটুকু যে, যে ভ্রান্ত পথের পথিক আমরা ছিলাম, সে পথে চলার জন্যে তোমাদেরকেও আহবান করেছি, যেন তোমরাও আমাদের মত হয়ে যাও।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ۝

'তাই নিশ্চয় তারা সেদিন শাস্তি ভোগে শরীক থাকবে'।

অর্থাৎ কাফের সর্দার এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা অথবা কাফের এবং তাদের সঙ্গীয় শয়তানরা সেদিন কঠিন কঠোর আযাবে শরীক থাকবে।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কেয়ামতের দিন কাফের নেতাদের এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে দোযখে প্রবেশের পূর্বে যে বাক-বিতন্ডা হবে, তার কিছুটা উল্লেখ ছিল। এরপর আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে তাদের ব্যাপারে যে ফরমান জারী হবে তারই উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে, অর্থাৎ সেদিন তাদের উভয় দলই শাস্তি ভোগে শরীক হবে, যেমন দুনিয়াতে কুফর ও নাফরমানীতে তারা উভয়ে শরীক ছিল।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ۝

'নিশ্চয় আমি পাপীষ্ঠদের ক্ষেত্রে এমনই করে থাকি'।

দুনিয়াতে কুফরী ও নাফরমানীর ক্ষেত্রে যারা নেতৃত্ব দিত এবং যারা তাদের অনুসরণ করতো, সবাই একই অপরাধে অপরাধী ছিল। তাদের অমার্জনীয় অপরাধ ছিল এই, তারা আল্লাহ পাকের তৌহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করতো না এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করতো, ইসলামের অগ্রযাত্রাকে বাধা দিতে সর্বক্ষণ তৎপর থাকত, মুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতো।

اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ۝

'যখন তাদেরকে বলা হতো, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তখন তারা অহংকার করতো এবং এ মহা সত্যকে অস্বীকার করতো'।

দ্বিতীয়তঃ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাতেন, তখন তারা অহংকার করে বলতো, একজন উন্মাদ কবির কথায় কি আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবো? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ۝

'আর তারা বলতো, 'আমরা কি একজন উন্মাদ কবির কথায় আমাদের দেব-দেবীদের পরিত্যাগ করবো'?

'কবি', 'মজনুন' শব্দগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কেই দূরাত্মা কাফেররা উচ্চারণ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ۝

'বরং তিনিই সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন এবং অন্যান্য নবী রসূলগণকেও সত্য বলে ঘোষণা করেছেন'।

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় রসূল উন্মাদ বা কবি নন, তিনি আল্লাহর প্রিয় রসূল, তিনি সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন, তথা তৌহীদের মহান শিক্ষা নিয়ে এসেছেন এবং তিনি অন্যান্য নবী রসূলগণের সত্যতার কথা ঘোষণা করেছেন।

একথার তাৎপর্য হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দাবী নতুন কিছু নয়; বরং ইতোপূর্বেও পৃথিবীতে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, এমনিভাবে তিনি যে আজ তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাচ্ছেন, এটিও নতুন কোন কথা নয়; বরং পৃথিবীতে যত নবী রসূলগণ ইতোপূর্বে আগমন করেছেন, তাঁরা সবাই মানুষকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন।

اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ۝

'নিশ্চয় তোমাদেরকে অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে'। কেননা তোমরা আল্লাহর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দাওনি, সত্যের পথে চলতে তোমরা সম্মত হওনি, তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করোনি। যেভাবে তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলে, ঠিক তেমনি তোমরা আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আর এটি কোন জুলুম নয়; বরং তোমাদের কীর্তিকলাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। দুনিয়াতে যেমন কর্ম হবে, আখেরাতে তেমনই হবে ফল।

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ
مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ
لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ
الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ
أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ
فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾

তরজমা

(৩৯) আর তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল ভোগ করবে।

(৪০) কিন্তু আল্লাহ পাকের মনোনীত বন্দাগণ এর ব্যতিক্রম।

(৪১) তাদের জন্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট জীবিকা

(৪২) ফলমূল, আর তারা হবে অত্যন্ত সম্মানিত।

(৪৩) নেয়ামতের বাগানে-

(৪৪) তারা মুখোমুখি হয়ে উপবিষ্ট হবে তাদের আসনে।

(৪৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে ঘুরে ঘুরে, পরিচ্ছন্ন সূরা পূর্ণ পাত্রে।

(৪৬) স্বচ্ছ শুভ্র (সূরা) পানকারীদের জন্যে যা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু।

(৪৭) তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা, আর তা পান করে কেউ মাতলামীও করবেনা।

(৪৮) তাদের নিকট থাকবে ডাগর চোখা অবনমিত দৃষ্টি সম্পন্না হুরীগণ।

(৪৯) তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।

(৫০) তারা একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

(৫১) তাদের কেউ বলবে, 'আমার ছিল একজন সঙ্গী'।

(৫২) সে বলতো, 'তুমি কি একথায় বিশ্বাসী'

(৫৩) যে, আমরা যখন মরে যাব, মাটি হয়ে যাব এবং অস্থি কংকালে পরিণত হয়ে যাব, এরপরও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে'?

(৫৪) আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও'?

(৫৫) এরপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে দোযখের মধ্যস্থলে।

(৫৬) তখন সে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! তুই তো আমাদেরকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলি'!

তফসীরুল কোরআন

وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۝

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, পাপীষ্ঠরা আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে, আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না। অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার জীবনে যা কিছু করতে তারই প্রতিফল এখানে ভোগ করবে। বস্তুতঃ সেদিন মানুষের কীর্তিকলাপই আল্লাহ পাকের আযাবের আকারে প্রকাশ পাবে। আর তাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা, তারা শুধু তাদের কর্মফলই ভোগ করবে। তাদের কুফরী ও নাফরমানী, অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার তিক্ত স্বাদ তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদন করবে। সেদিন তাদের লাঞ্ছনা, অবমাননা হবে অবধারিত।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ۝

'কিন্তু আল্লাহ পাকের প্রিয় ও মনোনীত বন্দাগণের অবস্থা হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত'। তারা সেদিন জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করে মহা আনন্দে থাকবে। তারা যে সুখ-সামগ্রী লাভ করবে তা শুধু বর্ণনাতীতই নয়; বরং কল্পনাতীতও, তাদের মান মর্যাদা হবে অতুলনীয়।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ۝

'তাদের জন্যে থাকবে সুনির্দিষ্ট উপজীবিকা', যা হবে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঐ রিয্কের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এক. বেহেশতের নেয়ামত ক্ষণস্থায়ী হবেনা; হবে চিরস্থায়ী।

দুই. আর এ নেয়ামত সমূহ হবে সুস্বাদু, দুনিয়ার কোন চক্ষু যা দেখেনি, আর তা এমন মজাদার যা কেউ শ্রবণও করেনি এবং এমন স্বাদের কথা কেউ চিন্তাও করেনি।

তিন. আর এ সুস্বাদু রিয্‌ক সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে ঘোষণা করা হয়েছে, তবে একথা সত্য যে, প্রত্যেককে তার আমল মোতাবেকই রিয্‌ক দেয়া হবে।

চার. এখানে এও উল্লেখ্য, জান্নাতের রিয্‌ক 'রিয্‌ক' হিসেবে নয়; বরং আনন্দ সামগ্রী হিসেবেই প্রদান করা হবে কেননা, বেহেস্তে কেউ ক্ষুধার্ত হবেনা।

অতএব, রিয্‌কের প্রয়োজনে 'রিয্‌ক' নয়; বরং আনন্দ উল্লাসের খাতিরেই রিয্‌ক পরিবেশন করা হবে।

فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ۝ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ۝ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ۝

'তাদের জন্যে রয়েছে রকমারী ফল-মূল, তারা হবে অত্যন্ত সম্মানিত, তারা অবস্থান করবে নেয়ামতের বাগানে। তারা মুখোমুখি হয়ে উপবিষ্ট হবে তাদের আসনে'।

অর্থাৎ তাদের আনন্দ-উল্লাস বৃদ্ধির নিমিত্তে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ফলমূল সরবরাহ করা হবে। কেননা, তারা হবে অত্যন্ত সম্মানিত, তাই তাদের সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতেই হবে এ আদর-আপ্যায়ন। তারা অগণিত নেয়ামতের বাগানে অবস্থান করবে। আপনজনেরা বেহেশতী পরিবেশে, আনন্দ-উল্লাসে মুগ্ধ থাকবে, বন্ধু-বান্ধবরা দুনিয়ার জীবনের কথা আলোচনা করবে। নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হয়ে অতীতের স্মৃতি-চারণ করবে এবং জান্নাতের সুখ-সামগ্রী ভোগ করে মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা হয়ে থাকবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍۭ۝ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ۝

জান্নাতী সাকীরা তাদের নিকট স্বচ্ছ, সুস্বাদু সূরা-পূর্ণ পাত্র নিয়ে হাযির হবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন যে, জান্নাতের সূরা দুধের চেয়ে অধিকতর সাদা হবে, এ সূরার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, দুনিয়ার সূরার মত তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবেনা, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ۝

'তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা, আর তা পান করে কেউ মাতলামীও করবেনা'। তাতে পেটে ব্যথা হবে না, কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকবেনা; বরং অত্যন্ত সুগন্ধ হবে। দুনিয়ার সূরা পানে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়, কিন্তু জান্নাতের সূরায় এমনি কোন ক্ষতিকর উপাদান থাকবেনা; বরং তা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, দুনিয়ার সূরায় চারটি ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে, (এক) নেশা, (দুই) মাথা ব্যথা (৩) বমির উদ্বেগ (৪) প্রস্রাব। কিন্তু জান্নাতের সূরায় এসব কিছুই থাকবেনা। কোন রকম কষ্ট বা ক্ষতিকর কিছুই থাকবেনা।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ۝ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ۝

তাদের নিকট থাকবে ডাগর চোখা, অবনমিত দৃষ্টি সম্পন্না হুরীগণ, তারা বর্ণে সৌন্দর্যে যেন সুরক্ষিত ডিম্ব, তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, স্বামী ব্যতীত অন্যদের দিকে তারা ফিরেও তাকাবেনা।

অর্থাৎ তাদের দৈহিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি নৈতিক এবং চারিত্রিক সৌন্দর্যও থাকবে। তারা থাকবে মুক্তার মত সংরক্ষিত, ডিমের উপর যেমন হালকা, মসৃণ; স্বচ্ছ আস্তরণ থাকে, তেমনি হবে তাদের দেহ।

এবনে আবি হাতেমে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (কেয়ামতের পূর্বে) কবর থেকে সর্ব প্রথম আমিই বের হয়ে আসবো, যখন লোকদেরকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে তখন তাদের পক্ষে আমিই বক্তব্য রাখবো। আর যখন লোকেরা নিরাশ হয়ে পড়বে তখন আমিই তাদেরকে সুসংবাদ শোনাবো। আর আমিই তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সুপারিশ করবো। আল্লাহ পাকের হামদের পতাকা সেদিন আমার হাতেই থাকবে। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে, তারা সবাই ঐ পতাকাতলে অবস্থান করবে। সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমার সম্মানই অধিকতর হবে। আর একথা আমি গর্ব করে বলছি না। কেয়ামতের দিন এক হাজার খাদেম আমার অগ্র পশ্চাতে ঘোরাফেরা করবে, তারা সংরক্ষিত ডিম্ব অথবা মুক্তার মত স্বচ্ছ-সুন্দর, আকর্ষণীয় হবে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-২৯

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ۝

'তারা একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে'।

অর্থাৎ জান্নাতে বন্ধু-বান্ধবরা জান্নাতী পরিবেশে আনন্দ-উল্লাসে, গল্প-স্বল্পে আনন্দ উপভোগ করবে। জান্নাতের অতি আনন্দমুখর পরিবেশে তারা দুনিয়ার জীবনের স্মৃতিচারণ করবে।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ۝

'তাদের কেউ বলবে, আমার ছিল একজন সঙ্গী সে বলতো, তুমি কি একথায় বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরে যাব, মাটি হয়ে যাব এবং অস্থি-কংকালে পরিণত হয়ে যাব, এরপরও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে'? হিসাব-নিকাশের জন্যে আমাদেরকে হাযির করা হবে? এ ব্যক্তি কেয়ামতকে অস্বীকার করতো।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের قَرِيْنٌ শব্দ দ্বারা শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এমন অবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে, 'দুনিয়াতে শয়তান আমার সাথী ছিল'।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এ শব্দ দ্বারা শয়তান নয়, বরং মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ এমন সাথী ছিল যে কেয়ামতকে অস্বীকার করতো।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ)-এর মতে, قَرِيْنٌ শব্দ দ্বারা 'ভাই' কে বোঝানো হয়েছে, তারা দুনিয়াতে দু' ভাই ছিল।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তারা দুনিয়াতে দু' ভাই ছিল। তাদের একজন ছিল কাফের, তার নাম ছিল মাতরুস, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি মোমেন ছিল, তার নাম ছিল ইয়াহুদা। এ দু' ব্যক্তির ঘটনা 'সূরা কাহফে' বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, ঐ জান্নাতী ব্যক্তি বললো, আমার ঐ সাথী আমাকে ভর্ৎসনা করে বলতো, তুমি একেবারেই নির্বোধ কেননা, আমরা যখন মরে পঁচে মাটি হয়ে যাব, তখন আবার কিভাবে জীবিত হবো? আর তোমার মতে, আমাদের নাকি দুনিয়ার জীবনের হিসাব নিকাশও দিতে হবে? সে লোকটিকে এখন আর এখানে দেখছিনা, এর অর্থ হলো সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ۝

তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এরশাদ হবে, তুমি কি তার অবস্থা দেখতে চাও? দোযখে সে কী অবস্থায় আছে, তা কি তুমি জানতে চাও? ফেরেশতা তখন বলবে, ইচ্ছা করলে জান্নাত থেকে দোযখীদের অবস্থা দেখা যেতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জান্নাতীদের জন্যে এমন সুযোগ থাকবে যে, তারা ইচ্ছা করলে দোযখীদের অবস্থা অবলোকন করতে পারবেন।

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ ۝

'এরপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তার সাথীকে দেখতে পাবে দোযখের মধ্যস্থলে'।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি দোযখীদের মধ্যে তার সাথীকে দেখবে যে, সে দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করছে।

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۝

তখন সে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! তুই তো আমাদেরকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিলি'! অর্থাৎ তোর কথা মেনে চললে আজ আমার ধ্বংসও হতো অনিবার্য, ভোগ করতে হতো দোযখের কঠিন শাস্তি, আল্লাহ্ পাক দয়া করে আমাকে রক্ষা করেছেন, আমি দুনিয়ার জীবনের মোহে মাতোয়ারা হয়ে আখেরাতকে ভুলে যাইনি; আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হইনি, তাই আল্লাহ্ পাক আমাকে দোযখের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَمَا نَحْنُ
بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾ اِنَّ
هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾ اَذٰلِكَ
خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾
اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ
الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٦٦﴾
ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى
الْجَحِيْمِ ﴿٦٨﴾

তরজমা

(৫৭) আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি না হতো, তবে আমিও এ বন্দী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(৫৮) তবে কি আমাদের আর মৃত্যু নেই?

(৫৯) প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা।

(৬০) নিশ্চয় এটি অবশ্যই মহা সাফল্য।

(৬১) সাধকদের এমন সাফল্যের জন্যেই সাধনা করা উচিত।

(৬২) বল, এটিই উত্তম আপ্যায়ন অথবা জাক্কুম বৃক্ষ?

(৬৩) নিশ্চয় আমি পাপীষ্ঠদের জন্যে তা আপদ স্বরূপ রেখেছি।

(৬৪) এটি এমন এক বৃক্ষ, দোযখের গভীর মূল থেকেই যার উৎপাদন।

(৬৫) তার গুচ্ছ যেন শয়তানের মাথা।

(৬৬) এরপর তারা তা ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা পেট ভরবে।

(৬৭) এরপর তাদের জন্যে তাতে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ দেয়া হবে।

(৬৮) অবশেষে তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে ফিরে যেতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, একজন জান্নাতী ব্যক্তি তার দোযখে নিক্ষিপ্ত সাথীকে দেখতে চাইলে আল্লাহ পাক তাকে তার দোযখী সাথীর অবস্থা দেখার অনুমতি দান করবেন। দোযখে নিক্ষিপ্ত ঐ ব্যক্তির চরম শাস্তি দেখে সে বলবে, তুমি তো প্রায় আমাকে ধ্বংসই করে ফেলেছিলে! দুনিয়ার জীবনে তোমার কথা মেনে চললে আজ আমাকে দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হতো। আর আলোচ্য আয়াতে ঐ জান্নাতী ব্যক্তি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হয়ে যা বলবে, তার উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ۝

'যদি আল্লাহ পাকের অশেষ দান ও অনুগ্রহ আমার প্রতি না থাকত তবে আমিও দোযখের বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'।

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যদি হেদায়েত নসীব না হতো এবং যদি আল্লাহ পাক আমাকে রক্ষা না করতেন এবং আমিও তোমার মত পথভ্রষ্ট হতাম, তবে আজ দোযখের কঠিন শাস্তি আমাকেও ভোগ করতে হতো।

এতে ঐ জান্নাতী ব্যক্তি হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে এবং দুনিয়ার জীবনে সীরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ লাভ করা যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত ছিল তা প্রকাশ করে।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দু' ব্যক্তি ব্যবসায়ে শরীক ছিল। তাদের নিকট আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত হয়। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ ছিল আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল তার বিপরীত, ব্যবসা সম্পর্কে সে তেমন অবগত ছিলনা। প্রথম ব্যক্তি তার অংশীদারকে বললো, যেহেতু ব্যবসায়ে আপনি অনভিজ্ঞ, সেহেতু আপনার সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা আর সম্ভব নয়। তাই সঞ্চিত সম্পদের অর্ধেক নিয়ে আপনি পৃথক হোন। অবশেষে তাই হলো। ব্যবসায়ী বন্ধু এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিরাট অট্টালিকা ক্রয় করলো এবং তার সাবেক সাথীকে ডেকে দেখিয়ে দিল। সে-ও অট্টালিকার প্রশংসা করলো। অট্টালিকা থেকে বের হয়ে সে আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া করলো, 'হে আল্লাহ! আমার সাথী এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে এ ক্ষণস্থায়ী জগতের একটি মহল ক্রয় করেছে। আমি তোমার নিকট জান্নাতের একটি মহল চাই। আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এতীম মিসকীনদের মধ্যে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করছি'। অবশেষে সে তাই করলো। এর কিছু দিন পর তার সাবেক ব্যবসায়ী সাথী তার বিয়ের জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবস্থা করলো এবং তাতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করলো, তার সাবেক সাথীকেও দাওয়াত করলে সে হাযির হলো, এরপর সে পুনরায় দোয়া করলো, 'হে আল্লাহ! আমার সাথী যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ তার বিয়েতে ব্যয় করলো, আমি এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ তোমার রাহে সদকা করছি। আমি এর বিনিময়ে তোমার নিকট জান্নাতের হুর চাই'। এর কিছুদিন পর ঐ ব্যবসায়ী ব্যক্তি দু' হাজার স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা দু'টি বাগান ক্রয় করলো এবং নয়ন জুড়ানো বাগান দু'টিও তার সাবেক সাথীকে দেখিয়ে দিল। সে পুনরায় আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলো, 'হে আল্লাহ! আমার সাথী দু' হাজার স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা দু'টি বাগান ক্রয় করেছে, আমি দু' হাজার স্বর্ণমুদ্রা তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সদকা করলাম'। এরপর উভয়েরই ইন্তেকাল হয়ে যায়। সদকাকারী ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌঁছানো হয়। হুর এবং দু'টি বাগান সহ জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত তাকে প্রদান করা হয় যা দুনিয়ার মানুষের জন্যে কল্পনাতীত। তখন ঐ ব্যক্তির মনে হলো তার সে সঙ্গীর কথা, ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বললেন, সে তো দোযখে রয়েছে, তুমি ইচ্ছা করলে তাকে দেখতে পার। এরপর সে তাকে দোযখে অগ্নি দগ্ধ হতে দেখে। তখন সে যা বলে তাই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে-

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّى.........

'আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি না হতো, তবে আমিও দোযখের বন্দীদের অর্ন্তভুক্ত হতাম'।[১]

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ۝

'তবে কি আমাদের আর মৃত্যু নেই? প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা'।

তফসীরকারগণ এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন। (১) পূর্ববর্তী আয়াতে যে জান্নাতী ব্যক্তির উল্লেখ ছিল, এ আয়াতের কথাটি তারই।

অর্থাৎ দোযখে তার সাথীকে দেখার পর ঐ জান্নাতী ব্যক্তি আল্লাহর শোকর আদায় করবে এবং ঐ দোযখী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলবে, তুমি দুনিয়ার জীবনের পর আখেরাতের এ জীবনকে অস্বীকার করতে, তুমি বলতে, মরে পঁচে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর পুনর্জীবন সম্ভব নয়, আর আমরা আখেরাতের জীবনের প্রতি বিশ্বাস করতাম এবং এর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করতাম। তাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাতের অন্তহীন নেয়ামত দান করেছেন, আমাদের এ জীবন দুনিয়ার জীবনের মত ক্ষণস্থায়ী নয়; বরং এটি চিরস্থায়ী। মৃত্যু আর কখনও আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা; প্রথম মৃত্যু যা দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় হয়েছিল, এরপর আর আমাদের কোন মৃত্যু আসবেনা। আমরা জান্নাতের চিরস্থায়ী অধিবাসী (আলহামদুলিল্লাহ)! তোমরা দোযখবাসীরা স্বচক্ষে দেখে নিলে, দুনিয়ার জীবনের পর আখেরাতের জীবন সত্য, যা তোমরা অস্বীকার করতে, এখন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর যাতনা ভোগ কর।

(২) আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হলো, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের কথাটি জান্নাতবাসীর, তারা ফেরেশতাদের সঙ্গে একথা বলবেন। জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশের পর মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতি দিয়ে জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে জবেহ করা হবে। জান্নাতবাসীগণ ও দোযখবাসীরা এ দৃশ্য দেখবে তাই জান্নাতবাসীগণ তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ফেরেশতাদেরকে বলবেন,

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ۝ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ۝

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৩০-৩১

'তবে কি এরপর আমাদের আর মৃত্যু নেই'? তখন ফেরেশতাগণ এ সুসংবাদ দেবেন, 'এরপর আর মৃত্যু নেই', এতদ্ব্যতীত জান্নাতবাসীদের কোন প্রকার আযাবেরও আশঙ্কা নেই। তাদেরকে কখনো কোন আযাব দেয়া হবেনা। বস্তুতঃ দুনিয়ার জিন্দেগীর কয়েক বছর আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করলে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে অতিবাহিত করলে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর অন্তহীন সুখ শান্তি লাভ করা যায়।[১]

মোমেনগণের মহা সাফল্য

তখন জান্নাতবাসীগণ একথাও বলবেন,

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۝

'নিশ্চয় এটি অবশ্যই মহা সাফল্য'।

পার্থিব জীবনের কয়েকটি দিন শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ লাভ করা নিশ্চয় বিরাট সাফল্য।

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُونَ۝

'এমন সাফল্যের জন্যে সাধক মাত্রেরই সাধনা করা উচিত'।

অর্থাৎ আখেরাতের জিন্দেগীর এমনি সাফল্যের জন্যে মানুষ মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। মানুষ দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের জন্যে সর্বক্ষণ নিজেকে ব্যাপৃত রাখে অথচ দুনিয়ার সাফল্য আসে দুঃখ-যাতনার মাধ্যমে, দ্বিতীয়তঃ এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী, এ জীবনও ক্ষণভঙ্গুর, আর এখানের সাফল্যও নিতান্ত অস্থায়ী, তাই অন্যত্র আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য'। -(সূরা নেছা)

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

'আর আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী'। -(সূরা আলা)

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৯৪

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মৃত্যুকে যখন জবেহ করা হবে তখন জান্নাতবাসীগণ আনন্দ প্রকাশার্থে ফেরেশতাগণকে বলবেন, 'এরপর আমাদের তো মৃত্যু নেই'? ফেরেশতাগণ জবাবে বলবেন, 'না, আর মৃত্যু নেই, জান্নাতের এ জীবন চিরস্থায়ী'। তখন জান্নাতীগণ বলবেন–

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

'নিশ্চয় এটি হলো এক বিরাট সাফল্য'।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, হয়তো এটি আল্লাহ্ পাকেরই কালাম। এরপর আল্লাহ্ পাকই এরশাদ করেছেনঃ

لِمِثْلِ هٰذَا

অর্থাৎ এমনি শান্তি, নেয়ামত এবং মহা সাফল্যের জন্যে সাধনা করা একান্ত করণীয় কাজ।[১]

কাফেরদের কঠিন শাস্তি

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ۝

'বল, এটিই উত্তম আপ্যায়ন অথবা জাক্কুম বৃক্ষ'?

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জান্নাতবাসীগণের আপ্যায়ন ও নেয়ামত সমূহের বর্ণনার পর এ আয়াত থেকে দোযখীদের শাস্তির বর্ণনা স্থান পেয়েছে এবং প্রশ্ন করা হয়েছে, জান্নাতের এ সাদর আপ্যায়ন এবং চিরসুখ ও চিরশান্তির এ আয়োজন উত্তম? নাকি দোযখের জাক্কুম বৃক্ষ উত্তম?

অতএব, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর এর কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য? আর কোন্‌টি বর্জনীয়?

তফসীরকারগণ লিখেছেন, দোযখীদের জন্যে অত্যন্ত ভয়ংকর কষ্টদায়ক খাদ্য হবে জাক্কুম বৃক্ষ। ক্ষুধার জ্বালায় কাতর অবস্থায় তাদেরকে জাক্কুম দেয়া হবে যা গলাধঃকরণ করা তাদের জন্যে হবে চরম কষ্টকর। অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, অতীব বিস্বাদ এ বৃক্ষ দোযখীদের খেতে বাধ্য করা হবে, দোযখে নিক্ষিপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে জাক্কুম দেয়া হবে, এরপর আরো যে কত কষ্ট রয়েছে তা আল্লাহ্ পাকই জানেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৭

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি জাক্কুমের একটি ফোটা পৃথিবীর সমুদ্রগুলোর মধ্যে ফেলে দেয়া হয়, তবে পৃথিবীর মানুষের জীবন যাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর দ্বারা আঁচ করা যায় যে, জাক্কুম কত কষ্টদায়ক বস্তু!

আবু ইমরান খাওলানীর বর্ণনায় রয়েছে যে, জাক্কুম থেকে মানুষ যতখানি টেনে নেবে, ততখানি গোশ্‌ত সে মানুষের দেহ থেকে টেনে নেবে।[১]

إِنَّا جَعَلْنَٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّٰلِمِينَ ۝

'নিশ্চয় আমি পাপীষ্ঠদের জন্যে তা আপদ স্বরূপ রেখেছি'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হতে পারে এ বিপজ্জনক বৃক্ষটি সারা দোযখেই ছড়িয়ে আছে, যেমন 'তুবা' নামক বৃক্ষটি জান্নাতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, আমি জালেমদের জন্যে জাক্কুম বৃক্ষকে একটি পরীক্ষা স্বরূপ করে রেখেছি কেননা, জাক্কুম বৃক্ষের কথা ঘোষণার পর কাফেররা এ সম্পর্কে উপহাস করেছে, তারা বলেছে, দোযখের অগ্নিতে বৃক্ষ কি করে থাকবে? অগ্নি তো বৃক্ষকে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলে, অথচ এই নবী বলছেন, দোযখে এ জাক্কুম বৃক্ষটি উৎপন্ন হবে। আল্লাহ পাক একথাও এরশাদ করেছেন, 'হ্যাঁ' এ বৃক্ষটি অগ্নি থেকেই সৃষ্টি হবে, আর তার খাবারও অগ্নিই হবে'।

অভিশপ্ত আবু জেহেল একথা শ্রবণ করে হাসতে লাগল এবং জাক্কুমের প্রতি বিদ্রুপ করতে লাগল এবং বললো, 'আমি তো খেজুর এবং মাখন খাব, কেননা মাখনের আরেকটি নাম হলো জাক্কুম'।

যাহোক, এটি একটি পরীক্ষা, যারা নেককার তারা জাক্কুম শব্দটি শ্রবণ করেই ভীত-সন্ত্রস্ত হলো, আর যারা মন্দ লোক তারা বিদ্রুপ করলো।[২]

এবনে জোবারী কোরায়শ সর্দারদেরকে বললো, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জাক্কুমের ভয় দেখান, অথচ গ্রামীন ভাষায় 'জাক্কুম' বলা হয় মাখন এবং খেজুরকে। আবু জেহেল এবনে জোবারীকে তার বাড়ীতে ডেকে আনল এবং বাঁদীকে বললো, আমাদের জন্যে জাক্কুম নিয়ে আস। বাঁদী মাখন এবং খেজুর নিয়ে আসল। তখন আবু জেহেল বললো, জাক্কুম খাও, এটি সেই জাক্কুম, যে সম্পর্কে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে ভয় দেখায়।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৮
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৩৩
৩। তফসীরে মাজাহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৮

এ কারণে আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াত নাযিল করলেনঃ

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ الشَّيٰطِينِ ۝

'এটি এমন এক বৃক্ষ, দোযখের গভীর মূল থেকেই যার উৎপাদন'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, দোযখের ভেতরেই আল্লাহ্ পাক একটি বৃক্ষ উৎপন্ন করেছেন যার নাম জাক্কুম, এটি অত্যন্ত বিস্বাদ, দুর্গন্ধময় এবং বিষাক্ত, জালেম এবং কাফেরদের শাস্তির জন্যেই তা তৈরী করা হয়েছে। দোযখীরা যখন ক্ষুধার্ত হবে তখন তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ জাক্কুম খেতে দেয়া হবে।

এবনে জরীর কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল বলেছিল, তোমাদের সাথী বলেন, অগ্নির মধ্যেও নাকি একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হবে অথচ অগ্নি বৃক্ষকে শেষ করে দেয়, সেখানে বৃক্ষ কি করে উৎপন্ন হতে পারে! আমরা তো খেজুর এবং মাখনকেই জাক্কুম মনে করি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ বৃক্ষটি দোযখের গভীর থেকে বের হয়ে আসবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর মূল হবে দোযখের গভীরে এবং তার শাখাগুলো দোযখের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়বে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক জাক্কুমের ফলকে 'শয়তানের মাথা'র মত বলে এরশাদ করেছেনঃ

মূলতঃ কোন জিনিস যদি অত্যন্ত মন্দ এবং ঘৃণ্য হয়, তবে তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্যে তাকে শয়তান আখ্যা দেয়া হয়। তাই জাক্কুম বৃক্ষের ফলকেও 'শয়তানের মাথা'র সদৃশ বলা হয়েছে। শয়তানকে তার প্রকৃত আকৃতিতে দেখা যায় না, কিন্তু মানুষ তার মনে শয়তানের জন্যে একটি মন্দ আকৃতি নির্দিষ্ট করেই রাখে। আর এ মন্দ আকৃতির সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে জাক্কুম বৃক্ষের ফলকে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আরবের মরুভূমিতে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ফল হয় অত্যন্ত তিক্ত, আরবরা তাকে (শয়তানদের মাথা) বলে, আর জাক্কুমের ফলকে তাই বলা হয়েছে।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, কোন বস্তুকে অত্যন্ত সুন্দর দেখলে আরবরা তাকে ফেরেস্তার ন্যায় বলে, আর কোন কিছুর আকৃতি মন্দ হলে তাকে শয়তানের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৮-২৯

সাথে দৃষ্টান্ত দেয়। যেমন উর্দু ভাষায়ও কোন কথা যদি অনভিপ্রেত ভাবে দীর্ঘ করা হয় তখন তাকে 'শয়তানের আঁতে'র ন্যায় দীর্ঘ বলা হয়। অথচ শয়তানের আঁত কেউ দেখেনি। অনভিপ্রেত ভাবে দীর্ঘ কথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশার্থেই তাকে 'শয়তানের আঁত' আখ্যা দেয়া হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে জাক্কুমের ফলকে 'শয়তানের মাথা' বলে তার প্রতি এমনি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে।[১]

فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ۝

'এরপর তারা তা ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা তাদের পেট ভরবে'।

অর্থাৎ এ দুর্গন্ধময়, বিস্বাদ এবং বিষাক্ত জাক্কুম সামান্য খেয়ে ছেড়ে দিলে চলবেনা; বরং পরিমাণে অনেক, পেট ভরে খেতে বাধ্য করা হবে। ঈমানদার ও নেককার লোকদেরকে জান্নাতে উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য এবং সূরা পরিবেশন করা হবে এবং তারা হবে সেখানে অত্যন্ত সম্মানিত।

পক্ষান্তরে, অবাধ্য কাফের দোযখীদের জন্যে বরাদ্দ রয়েছে বিষাক্ত জাক্কুম ফল, যার বীভৎস আকৃতি দর্শনেই পিত্ত তরল হয়ে যায়, এরপর তারা তষ্ণার্ত অবস্থায় যখন পানি চাইবে তখন তাদেরকে দেয়া হবে দোযখের ফুটন্ত পানি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ۝

'এরপর তাদের জন্যে তাতে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ দেয়া হবে', যা পান করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাড়ি-ভূঁড়ি বের হয়ে পড়বে।

ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ

'অবশেষে তাদেরকে অগ্নিকুন্ডে ফিরে যেতে হবে', তথা তাদেরকে দোযখে ফিরে যেতে হবে যা হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা। এত একথা প্রমাণিত হয় যে, জাক্কুম ফল এবং ফুটন্ত পানি তাদেরকে পানাহারের জন্যে দেয়া হবে। এরপর তাদেরকে দোযখে পৌঁছে দেয়া হবে।

অথবা জাক্কুম এবং ফুটন্ত পানি পানাহার করাবার জন্যে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করা হবে এবং পানাহার শেষে পুনরায় তাদেরকে দোযখে পৌঁছানো হবে।

১। তফসীরে মাআলেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৭০-৭১

তফসীরকারগণ লিখেছেন, দোযখের বাইরেই কাফেরদেরকে 'জাক্কুম' এবং 'হামীম' (ফুটন্ত পানি) পানাহার করানো হবে। এরপর তাদেরকে দোযখে পৌঁছানো হবে, যা তাদের শাস্তির চিরস্থায়ী স্থান।[১]

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ
فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾
سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾

তরজমা

(৬৯) নিশ্চয় তারা তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে।

(৭০) ফলে তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ছুটেছে।

(৭১) তাদের পূর্বে পূর্ববর্তী বহু লোকই পথভ্রষ্ট হয়েছে।

(৭২) আর নিশ্চয় আমি তাদের মধ্যেই সতর্ককারী (নবী রসূলগণ) প্রেরণ করেছিলাম।

(৭৩) অতএব, দেখুন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

(৭৪) কিন্তু আল্লাহ পাকের মনোনীত বন্দাগণ এর ব্যতিক্রম।

(৭৫) আর নিশ্চয় নূহ আমাকে (সাহায্য লাভের জন্যে) ডাক দিয়েছিল; আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী!

১। তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ)· খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৭১

(৭৬) এবং আমি তাকে সপরিবারে ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করেছি।

(৭৭) আর আমি তারই বংশধরদেরকে বিশ্বে বসবাসের জন্যে অবশিষ্ট রাখি।

(৭৮) আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখে দিয়েছি।

(৭৯) সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

(৮০) নিশ্চয় এভাবেই আমি নেককারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(৮১) সে ছিল আমার মোমেন বন্দাদের অন্যতম।

(৮২) এরপর আমি অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের মুশরেক, অবাধ্য এবং পাপীষ্ঠদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদেরকে দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, তার পূর্বে তাদেরকে বিষাক্ত জাক্কুম ফল খেতে এবং ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে যার কারণে তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত বের হয়ে আসবে।

আর আলোচ্য আয়াতে তাদের এ কঠিন শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ۝ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ۝

'নিশ্চয় তারা তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে, ফলে তারাও তাদের পূর্ব পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণে ছুটেছে'। অর্থাৎ এ কাফেররা তাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসরণের কারণেই বিপদগ্রস্ত হয়েছে, তাদের পূর্ব পুরুষরা ছিল বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট। তারা ছিল বাতিলপন্থী, অপরিণামদর্শী, তাদের অন্ধ অনুকরণ করেছে এ কাফেররা, তাই তাদের অনিবার্য পরিণাম হয়েছে দোযখের কঠিন শাস্তি। যদি তারা পরিণামদর্শী হতো এবং বিবেক বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতো, তবে পূর্ব পুরুষদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে অবগত হতো। কিন্তু তারা তা করেনি, তাদের দেখাদেখি এরাও অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়েছে, পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ۝

'তাদের পূর্ববর্তী বহু লোকই পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর নিশ্চয় আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী (নবী রসূলগণকে) প্রেরণ করেছিলাম'।

অর্থাৎ আজ যারা তৌহীদের আহবানে সাড়া দিচ্ছে না এবং যারা সত্যের প্রতীক শান্তির দূত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করছে, তা

নতুন কিছু নয়, কেননা ইতোপূর্বে অনেকেই সত্যকে শুধু বর্জন করেনি; বরং সত্য বিরোধিতায় তৎপর হয়েছে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে। আর তারা এমনও ছিল না যে, তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়নি এবং তাদের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়নি, বরং যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে আল্লাহ পাক নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, যাতে করে তারা মানুষকে হেদায়েত করেন এবং কুফরী ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন, কিন্তু তারা সতর্ককারীগণের উপদেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাই তাদের পরিণাম এতো ভয়াবহ হয়েছে।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

'অতএব, দেখুন, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের পরিণাম কতো ভয়াবহ হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ পাকের মনোনীত প্রিয় বন্দাগণের অবস্থা এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম'।

এ আয়াতে যদিও সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানব জাতিকে শিক্ষা দেয়া। অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি দেখুন এবং সমগ্র বিশ্ববাসীও দেখুক যে, ইতোপূর্বে যারা আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করেছে, তাঁর প্রেরিত নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে, তাদের পরিণাম কত শোচনীয় হয়েছে, তারা আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করেছিল, নবী রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল, তৌহীদে অবিশ্বাস করেছিল। আল্লাহর বিধানকে অমান্য করার এমনকি, উপহাস করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল, পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের গজব আপতিত হয়েছে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

কিন্তু আল্লাহ পাকের প্রিয়, পছন্দনীয় এবং মনোনীত বন্দাগণের অবস্থা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যেহেতু তারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলেছে, তাই তারা চির সুখ ও শান্তির কেন্দ্র জান্নাতের অধিবাসী হয়েছে। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত তারা অহরহ ভোগ করছে। যিনি এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানব জাতিকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন, যিনি মানব জাতির প্রয়োজনের আয়োজনে, তাদের কল্যাণার্থে পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর বিধান মেনে চলা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে যারা ব্যর্থ হবে তাদের শাস্তি অবধারিত।

وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ۞

'আর নিশ্চয় নূহ আমাকে (সাহায্য লাভের জন্যে) ডাক দিয়েছিল, আর আমি উত্তম সাড়া দানকারী'।

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহীদ, জান্নাত ও দোযখের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং একথাও এরশাদ হয়েছে যে, যুগে যুগে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, যাতে করে স্ব-স্ব যুগের মানুষকে তাঁরা সতর্ক করেন।

একথা বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, যেভাবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদেরকে এবং তাদের অনুসারীদেরকে দুনিয়ার আযাব থেকে রক্ষা করেছেন, তেমনি তাদেরকে আখেরাতের আযাব থেকেও রক্ষা করবেন। এ পর্যায়ে সাতটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্ব প্রথম আলোচ্য আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ۞

'আর নিশ্চয় নূহ আমাকে (সাহায্য লাভের জন্যে) ডাক দিয়েছিল, আর আমি উত্তম সাড়া প্রদানকারী তথা প্রার্থনা শ্রবণকারী'।

হযরত নূহ (আঃ) সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ' বছর তাঁর জাতিকে হেদায়েতের সর্বাত্মক প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু তারা শুধু যে তাঁর হেদায়েত মানেনি তাই নয়; বরং নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতে থাকে। তখন নূহ (আঃ) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করেন। আল্লাহ পাক তাঁর ফরিয়াদ কবুল করেন এবং তাঁকে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জাতির মধ্যে আর কেউ ঈমান আনবেনা, এরপর যখন তিনি তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর জাতির বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করেছিলেন এ মর্মে যে, তাদেরকে ধ্বংস করা হোক। আল্লাহ পাক তাঁর ফরিয়াদ কবুল করেছিলেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ۞

'এবং আমি তাকে সপরিবারে ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করি'।

অর্থাৎ মহা প্লাবন থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের اهل শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো পরিবারবর্গ, কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে', আল্লাহ

পাক তাদেরকে রক্ষা করেছেন। আর তাঁর বংশধরদেরকেই পৃথিবীতে বসবাসকারী রেখেছেন।

যারা নেককার, পরহেযগার, ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ পাক সেদিন রক্ষা করেন। আর যারা অবিশ্বাসী, নাফরমান তারা সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কেননা তারা হযরত নূহ (আঃ)-এর আহবানে সাড়া দেয়নি; তাঁর প্রতি শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপই নয়; বরং তারা চরম জুলুম অত্যাচার করেছে। তাই আল্লাহ পাক তাঁর ফরিয়াদ কবুল করে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۝

'আর তারই বংশধরদেরকে বিশ্বে বসবাসের জন্য অবশিষ্ট রাখি'।

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে ছিলেন হাম, সাম ও ইয়াফেস।

বর্ণিত আছে যে, আরবদের পূর্ব পুরুষ হলো নূহ (আঃ)-এর পুত্র সাম আর আফ্রিকাবাসীদের পূর্ব পুরুষ হলো হাম এবং রুমীদের পূর্ব পুরুষ হলো ইয়াফেস।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক তরী থেকে অবতরণের পর হযরত নূহ (আঃ)-এর পরিবারবর্গ ব্যতীত অবশিষ্ট লোকদের মৃত্যু হয়। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۝

'আর আমি তারই বংশধরদেরকে বিশ্বে বসবাসের জন্যে অবশিষ্ট রাখি'।

এ বর্ণনা দ্বারা দু'টি কথা প্রমাণিত হয়। ১. হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের প্রলয়ংকরী বন্যার কারণে তদানীন্তন পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীই ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি যারা ঈমান আনে এবং তাঁর তরীতে আরোহণ করে, কেবল মাত্র তাদেরকেই আল্লাহ পাক রক্ষা করেন। ২. হযরত নূহ (আঃ)-এর বশংধর ব্যতীত পৃথিবীতে আর কারো বংশধারা অব্যাহত রয়নি, পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের পদচারণা হবে, সবই নূহ (আঃ)-এর বংশধর। এজন্যে তাঁকে 'দ্বিতীয় আদম' বলা হয়।

হযরত সাঈদ এবনুল মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর যে তিন পুত্র মহা প্লাবন থেকে রক্ষা পান তারা হলেন সাম, হাম এবং ইয়াফেস। তাঁর মতে, আরব, পারশ্য এবং রুমের অধিবাসীগণের পূর্ব পুরুষ হলো সাম। আর আফ্রিকার

অধিবাসীরা হলো হামের বংশধর এবং ইয়াফেসের বংশধর হলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াবাসী এমনকি, ইয়াজুজ মাজুজ পর্যন্ত। তবে এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হলো, হযরত নূহ (আঃ) সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হননি; তিনি প্রেরিত হয়েছেন শুধু তাঁর জাতির জন্যে, সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হবেনা, তাঁর দ্বীনই সর্বশেষ দ্বীন, তাঁর মহান আদর্শ সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে, তাঁর হেদায়েত ব্যতীত কোন হেদায়েত নেই, তাঁর আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত নাজাত লাভের দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ۞

'আমি তা পরবর্তী লোকদের স্মরণে রেখে দিয়েছি'।

অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধরদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনি হযরত নূহ (আঃ)-এর সুনাম, সুখ্যাতি পৃথিবীতে স্থায়ী করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ সত্যের জন্যে হযরত নূহ (আঃ) যে অবদান রেখেছেন, তার কারণে তিনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ۞

'সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক'।

এর অর্থ হলো, আজো বিশ্ববাসী তাঁকে সালাম জানায়, অথবা ভবিষ্যতে বিশ্বের অধিবাসীরা নূহ (আঃ)-এর প্রতি সালাম করবে, তাঁর জন্যে দোয়া করবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ বাক্যটি আল্লাহ পাকেরই কথা, অর্থাৎ আল্লাহ পাকই নূহ (আঃ)-এর প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন, এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, 'আমি নূহের জন্যে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে সুনাম সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছি'।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۞

'নিশ্চয় এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি'। যেমন নূহকে দিয়েছি, তাঁর প্রতি আমি সালাম প্রেরণ করেছি এবং ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে আমি তাঁর জন্যে সুনাম রেখে দিয়েছি।

إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝

'কেননা, সে ছিল আমার মোমেন বন্দাদের অন্যতম'। তার ঈমান ও নেক আমলের কারণেই তাঁকে এ প্রতিদান দেয়া হয়েছে, আর এতে রয়েছে নেককার মোমেনদের জন্যে বিশেষ সুসংবাদ।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ۝

পক্ষান্তরে, হযরত নূহ (আঃ)-এর শত্রু পক্ষ প্রলয়ংকরী বন্যায় ভেসে যায় এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করে দেন, কেননা তারা সত্যের বিরোধিতা করেছিল, মানবতার অকল্যাণ সাধনে লিপ্ত হয়েছিল এবং আল্লাহ পাকের নবীর শানে বেআদবী করেছিল, তারই শাস্তি স্বরূপ তারা চিরতরে ধ্বংস হয়েছে।

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ
تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى ٱلنُّجُومِ ﴿٨٨﴾
فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ
فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ
ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا
تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

তরজমা

(৮৩) আর নিশ্চয় ইব্রাহীম নূহের পথের পথিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(৮৪) (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন তিনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট বিশুদ্ধ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিলেন।

(৮৫) যখন তিনি তাঁর পিতা ও জাতিকে বলেন, 'তোমরা কিসের উপাসনা করছো'?

(৮৬) তোমরা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত মিথ্যা দেবতাদেরকে চাও?

(৮৭) বিশ্ব প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

(৮৮) এরপর তিনি একবার নক্ষত্রমালার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন

(৮৯) এবং বললেন, 'আমি অসুস্থ'।

(৯০) তখন তারা তাঁকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল।

(৯১) এরপর তিনি অতি সর্ন্তপণে তাদের দেবতা মহলে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, 'তোমরা আহার কর না কেন'?

(৯২) তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কথা বলনা কেন'?

(৯৩) এরপর তিনি তাদের প্রতি সজোরে আঘাত হানলেন,

(৯৪) তখন তাঁর সমাজের লোকেরা তাঁর নিকট ছুটে আসলো।

(৯৫) তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা যা নিজেরাই তৈরী কর, তারই উপাসনা কর কেন?

(৯৬) অথচ আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন'।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ۝

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হযরত নূহ (আঃ)-এর পথের পথিক বলা হয়েছে। এর কারণ এই, হযরত নূহ (আঃ) যেভাবে তৌহীদের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করার কারণে তাঁর জাতির অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন, তেমনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কেও তৌহীদের জন্যেই কাফেরদের তরফ থেকে চরম জুলুম অত্যাচার সইতে হয়েছে। তৌহীদের প্রচার-প্রসারে, এখলাস ও আন্তরিকতায়, ঈমানের দৃঢ়তায় এবং মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জুলুম অত্যাচার ও সবর অবলম্বনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর পথের পথিকই ছিলেন।

মূলতঃ সমস্ত নবী রসূলগণ একই পথের পথিক, তাঁদের মত ও পথ অভিন্ন, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সমর্থক, তৌহীদ, রেসালত এবং হাশর এসব ব্যাপারে তাঁরা

একই মূল নীতির অনুসারী। হযরত নূহ (আঃ)-এর দু' হাজার ছয়শ' চল্লিশ বছর পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগমন করেন।

আল্লামা জমখশরী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত 'তফসীরে কাশ্যাফে' এ তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং ইমাম রাজী (রঃ) ও আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) সহ অন্যান্য তফসীরকারগণও এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মধ্যে আরেকটি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। হযরত নূহ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক প্রলয়ংকরী বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। ঠিক এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক নমরুদের অগ্নিকুন্ড থেকে নাজাত দিয়েছেন। দু'টি ঘটনাই অলৌকিক, এমনকি অবিশ্বাস্য। কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরতের কাছে সবই সহজ এবং সম্ভব, কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি রক্ষা করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে ধ্বংস করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে অপমানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন, সকল ক্ষমতার মূল উৎস তিনিই।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যে জাতির কথা বলা হয়েছে, তারা ইরাকের 'বাবেল' শহরের অধিবাসী ছিল, মূর্তিপূজা এবং নক্ষত্র পূজার মত শেরক ও কুফরে তারা লিপ্ত ছিল। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতারও উল্লেখ রয়েছে, তার নাম ছিল আজর, সে শুধু মূর্তি পূজাতেই লিপ্ত ছিল না; বরং মূতি নির্মাণই ছিল তার পেশা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাকে এবং তার সমাজকে সুস্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তোমরা এসব কী করছো? নিজ হাতে যা তৈরী কর, তারই উপাসনা কর? এর চেয়ে অযৌক্তিক এবং অসুন্দর কাজ আর কিছুই হতে পারেনা।

إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

'যখন তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাযির হয়েছিলেন'।

অর্থাৎ তাঁর অন্তর থেকে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য সব কিছুর মায়া মহব্বত দূরীভূত করেছিলেন, শুধু আল্লাহ পাকের দিকেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন, তাঁর অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে তখন আল্লাহ পাকের প্রেম-ভালবাসা ছাড়া কিছুই ছিলনা, সত্যিকার অর্থে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রেমিক। সকল প্রকার

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৭৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১০০
তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৪৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩২

দুর্বলতা থেকে তাঁর অন্তর ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র। আল্লাহ-পাকের প্রেম ভালবাসাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ পাকের নির্দেশেই তিনি সুদূর সিরিয়া থেকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় এসে স্ত্রী হাজেরা (আঃ) ও দুগ্ধ পোষ্য শিশু ইসমাঈলকে একা রেখে চলে যান। অথচ সেখানে তখন কোন জন-মানুষের সন্ধান ছিলনা। এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা কত সুদৃঢ় থাকলে এমন কাজ করা যায় তা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয়; হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ৮৫ বছর বয়সে যে পুত্রের জন্ম হয়, সে যখন এগার বছর বয়স্ক, তখন আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিলেন তাঁকে জবেহ করতে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিনা-দ্বিধায় এ আদেশ পালনে যত্নবান হন। এটিও ছিল আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর নজিরবিহীন প্রেম ভালবাসার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই তিনি তাঁর জাতিকে পৌত্তলিকতা বর্জন করে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ۝ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ۝

‘যখন তিনি তাঁর পিতা ও জাতিকে বলেন, ‘তোমরা কিসের উপাসনা করছো’? তবে কি তোমরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত মিথ্যা দেবতাদেরকে চাও’?

এ প্রকার বর্ণনা-ভঙ্গির তাৎপর্য হলো তাঁর জাতির এ অপকর্মের প্রতিবাদ করা অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত যাদের উপাসনা করছো তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অসত্য, অলীক, এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই।

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

বিশ্ব প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তাঁর অস্তিত্ব এবং একত্ববাদ সম্পর্কে তোমরা কি সন্দিহান? তিনি যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একথা কি তোমরা জাননা? তাঁর গজব সম্পর্কে তোমরা কি কিছুই ভেবে দেখনি? যদি তা না হয়, তবে কোন্ সাহসে তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিকে তাঁর সমতুল্য মনে করছো এবং এ অক্ষম, অপদার্থ জড়বস্তুকে তোমরা ভাল মন্দের নেয়ামক মনে করছো। যিনি বিশ্বস্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি সর্বশক্তিমান তাঁর সাথে শেরক করা যে অমার্জনীয় অপরাধ, একথা কি তোমরা অবগত নও?

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ۝ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ۝

‘এরপর তিনি একবার নক্ষত্রমালার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, ‘আমি অসুস্থ’।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। তাই তিনি ক্ষণিকের জন্যে নক্ষত্র মালার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, 'আমি অসুস্থ'। হয়তো তিনি তখন কিছুটা অসুস্থ ছিলেন, অথবা এর অর্থ হলো, 'আমি নিজেকে সুস্থ মনে করছিনা', আর এ পৃথিবীতে দেহ এবং মন একসঙ্গে কজনেরই বা সুস্থ থাকে! দেহ সুস্থ থাকলে মন ভাল থাকেনা, কখনও এর বিপরীত অবস্থাও দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা সহ তাঁর জাতির অপকর্ম দেখে তাঁর মনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাই তিনি বলেছেন, 'আমি অসুস্থ'।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি একটি বিশেষ দিনে ঈদের দিনের উৎসব উদযাপন করতো। শহরের বাইরে উম্মুক্ত ময়দানে মেলা বসত। তারা সেদিন তাদের প্রতিমাগুলোর সম্মুখে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী খাদ্যবস্তু রেখে দিত এবং মেলায় চলে যেত। মেলা থেকে ফিরে এসে প্রতিমার সম্মুখে রক্ষিত খাবারগুলো গ্রহণ করতো। তাদের ধারণা ছিল, প্রতিমার সম্মুখে থাকার কারণে খাদ্য দ্রব্য বরকতময় হয়।

যাহোক, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর গোত্রীয় লোকেরা বললো, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন তারকারাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, 'আমি অসুস্থ', যেহেতু তারা বিশ্বাস করতো যে, সৃষ্টির বুকে সূচিত পরিবর্তনে নক্ষত্ররাজির একটা প্রভাব রয়েছে এবং তারা নক্ষত্রের পূজক ছিল। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রথমে নক্ষত্রের দিকে তাকালেন এবং এরপর বললেন যে, আমি অসুস্থ বোধ করছি, আর এ কারণে তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না। এভাবে তিনি তাদের সঙ্গে মেলায় যাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করলেন। এ কৌশলে তিনি একটি মহৎ কাজের সুযোগ পেলেন।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ۝

'তখন তারা তাঁকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল' আর এ সুযোগে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিলেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ۝

'এরপর তিনি অতি সর্ন্তপণে তাদের দেবতা মহলে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, 'তোমরা আহার কর না কেন? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কথা বল না কেন'?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের চলে যাওয়ার পর নিরাপদ সুযোগে তাদের মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং মূর্তিগুলোকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের সম্মুখে এত-ভোগ্য সামগ্রী পড়ে রয়েছে, অথচ তোমরা আহার করনা কেন? আরো জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কথা বলনা কেন? নিতান্ত জড় পদার্থের এ মূর্তিগুলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এসব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হবেনা, একথা তাঁরও জানা ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে এজন্যে প্রশ্ন করেছেন, যেন তাঁর পথভ্রষ্ট জাতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে যে, তাদের উপাস্যরা সত্যিই চরম অসহায়। তাদের আহার করার শক্তি-সামর্থ্যও নেই। এমনিভাবে তাদের কথা বলারও কোন শক্তি নেই, যাদের উদ্দেশ্যে পূজারীরা সর্বদা কথা বলে থাকে। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করলেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝

'এরপর তিনি তাদের প্রতি সজোরে আঘাত হানলেন'।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শপথ করেছিলেন যে, এ মূর্তিগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দেবেন। অবশেষে তিনি তাই করলেন।

এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে (এক) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর ডান হাত দ্বারা মূর্তিগুলোর উপর আঘাত করেছিলেন। অথবা يمين শব্দটির অর্থ শপথ, অর্থাৎ তিনি পূর্বে কৃত শপথ অনুযায়ী মূর্তিগুলো ভেঙে দিলেন। শুধু অক্ষত রেখে দিলেন সবচেয়ে বড় মূর্তিটিকে। এরপর যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মেলা থেকে ফিরে আসে তখন তারা দেখে যে, তাদের মূর্তিগুলো ভেঙে খন্ড-বিখন্ড হয়ে রয়েছে, তারা অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হলো এবং বিতর্কের সূত্রপাত হলো। অবশেষে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, যেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মেলায় গমন করেননি, তাই হয়তো তিনিই এ কান্ড করেছেন। তারা সবাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট হাযির হলো। তিনি তাদেরকে বললেন, বড় মূর্তিটি তো এখনো বহাল রয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা কর না কেন? যাহোক, অনেক বাক-বিতন্ডার পর তারা বুঝলো যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ই এ কাজটি করেছেন। তিনি তাদেরকে ঐ মুহূর্তে উপদেশ দিলেন, তিনি বললেন, যা স্বহস্তে তোমরা তৈরী কর তারই পূজা কর! অথচ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ পাকই তা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তৌহীদ সম্পর্কে উপদেশ মেনে নিতে তারা প্রস্তুত হলোনা, তখন তারা সিদ্ধান্তে আসল, একটা বৃহৎ অগ্নিকুন্ড তৈরী কর এবং তাতে তাঁকে নিক্ষেপ

কর। তারা তাই করলো, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে তাদের প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ড থেকে পরিত্রাণ দিলেন।[১]

জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রসঙ্গে-

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ

তারকারাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'আমি অসুস্থ'। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শরীয়তে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুমতি ছিল, কিন্তু আমাদের শরীয়তে তা নিষিদ্ধ। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় এ বিদ্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, কেননা পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তারকারাজির তাতে কোন হাত নেই। যে কোন ঘটনার কোন কোন আলামত হয়তো তারকারাজির মধ্যে দেখা দেয়; কিন্তু তারকারাজির তাতে কোন কার্যকারিতা নেই। যেমন ঔষধ সেবনের পর আল্লাহ পাক আরোগ্য দান করেন, কিন্তু ঔষধ আরোগ্য দানকারী নয়; আরোগ্যের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে। বিষপানে নীলকণ্ঠ হতে হয়, কিন্তু মৃত্যু আসে অন্য কারো ইচ্ছায় নয়, শুধু আল্লাহ পাকের হুকুমে। এমনিভাবে, তারকারাজির প্রভাবে কিছু হয় একথা বিশ্বাস করা হারাম, তবে আল্লাহ পাকের হুকুমে যা কিছু হয় তার কোন কোন নিদর্শন তারকারাজির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে জ্যোর্তি বিজ্ঞানীদের ভূমিকা হলো তারা সে আলামতগুলো দেখে বলতে চেষ্টা করে যে, পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আর তাদের বক্তব্য সর্বদা সঠিক হয় না। তাই কোন অবস্থাতেই ধারণা করা যাবেনা যে, তারকারাজির প্রভাবেই ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে, এটি নিষিদ্ধ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম 'এলমুন নুজুম' বা জ্যোতিষ শাস্ত্রকে হারাম করেছেন, এর কারণ হলো এই, কেউ যেন একথা বিশ্বাস না করে, পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে তারকারাজির কোন প্রভাব বা কার্যকারিতা রয়েছে।

হযরত যায়েদ এবনে জোহানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হোদায়বিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলো, সকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়ালেন, এরপর তিনি লোকদের দিকে ফিরে এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি জান, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন'? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'আল্লাহ পাক ও তাঁর

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৭৫-৯৩

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই তা জানেন'। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমার বন্দাদের মধ্যে কিছু লোক আমাকে মানে আর কিছু লোক আমাকে মানেনা। যারা বলেছে, আল্লাহ পাকের রহমতে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমাকে মানে, আর যারা বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে, আমার প্রতি তাদের ঈমান নেই, তারা নক্ষত্রকে মানে। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখনই আল্লাহ পাক আসমান থেকে বরকত (বৃষ্টি) নাযিল করেন, তখন একদল লোক কাফের হয়ে যায়, কেননা তারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণেই বৃষ্টি হয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মুনকেজ মিনাদ্দালালে' লিখেছেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং জ্যোর্তি বিজ্ঞান আল্লাহ পাক কোন নবীর প্রতি নাযিল করেননি; ফলে এ দু'টি বিজ্ঞানই কাফেরদের হাতে রয়ে গেছে। আর এ দু'টি বিজ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান নিশ্চিত কিছু নয়; বরং ধারণা প্রসূত।

জ্যোতিষীরা হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্ম এবং তাঁর হাতে ফেরাউনের পতনের খবর দিয়েছিল যা অবশেষে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও সত্য যে, জ্যোর্তি বিজ্ঞানীরা গায়ব জানেনা, তবে তারা নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কে গবেষণা করে কিছু ধারণা করতে পারে।

ইমাম বোখারী (রঃ) জুহরী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সিরিয়ার 'এলিয়া' নামক প্রদেশের শাসনকর্তা এবনে নাতুর সিরীয় খৃষ্টানদের পাদরী ছিল। রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াস যখন এলিয়াতে আসে, তখন সকালে তার চেহারা অত্যন্ত বিষন্ন ছিল, তার এক মোসাহেব জিজ্ঞাসা করলো, আপনার শরীর ভাল তো? একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে? হেরাক্লিয়াস অত্যন্ত বড় জ্যোর্তি বিজ্ঞানী ছিল। সে নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি লক্ষ্য করতো, সে জবাব দিল, আজ রাতে নক্ষত্রপুঞ্জের গবেষণায় জানা গেছে, খতনাকারীদের বাদশাহ জন্মগ্রহণ করেছেন, তুমি আমাকে বল, পৃথিবীতে কোন্ জাতি খতনা করে? মোসাহেবরা বললো, ইহুদীরা ব্যতীত আর কেউ খতনা করেনা। আর তাদের ব্যাপারে আপনার ভয় করার কোন কারণ নেই, সারা দেশে আদেশ জারী করুন, যেখানে কোন ইহুদী পাওয়া যায়, তাকে হত্যা করা হোক। হেরাক্লিয়াস এ পরামর্শে মশগুল ছিল, ঠিক এমন সময় গাস্‌সানের রাজার প্রেরিত এক ব্যক্তি আসলেন, যিনি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের খবর নিয়ে এসেছেন। হেরাক্লিয়াস তার নিকট থেকে সব খবর জানার চেষ্টা করলো এবং একথাও জিজ্ঞাসা করলো যে, আরবরা কি খতনা করে? তিনি

বললেন, 'হ্যাঁ'। হেরাক্লিয়াস তখন বললো, এ জাতির বাদশাহ্ জন্মগ্রহণ করেছে, তখন হেরাক্লিয়াস 'হেম্মাস' নামক স্থানে চলে যায় এবং একজন প্রখ্যাত জ্যোতিষীকে আদেশ দেয় যে, এ সম্পর্কে আরো গবেষণা কর। কয়েকদিন পর ঐ ব্যক্তি হেরাক্লিয়াসকে লিখে জানায় যে, আপনি যা বলেছেন তা-ই সত্য। খতনাকারীদের বাদশাহ্ জন্মগ্রহণ করেছেন, আর তিনি নবী।

শেখ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) লিখেছেনঃ আবু নায়ীম 'দালায়েলুন নবুওয়্যতে' উল্লেখ করেছেন, জুহরী (রঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল মালিক এবনে মারওয়ানের যুগে দামেশকে এবনে নাতুরের সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, হয়তো এবনে নাতুর মুসলমান হবার পর পর জুহরী (রঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। এ বর্ণনায় একথাও প্রমাণিত হয়, জ্যোর্তি বিজ্ঞানের সাধনায় পৃথিবীর কোন কোন আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা হয়তো অবগত হওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু ঈমান ও আকীদা নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে, সেজন্যে এ সাধনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অনেক সময় এ সাধনা নিরর্থকও হয় এবং সময়ের অপচয় ঘটে। ঈসায়ী ধর্মে এটি বৈধ ছিল, কিন্তু ইসলামী শরীয়তে তা বৈধ নয়।[১]

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا
فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ
يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫

তরজমা

(৯৭) তারা বললো, 'তার জন্যে একটি ইমারত (অগ্নিকুন্ড) তৈরী কর, এরপর তাকে ঐ অগ্নিকুন্ডে ফেলে দাও'।

(৯৮) তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংকল্প করেছিল, তাই আমি তাদেরকে অধঃপতিত করলাম।

(৯৯) এবং ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন'।

(১০০) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নেককার সন্তান দান করুন।

(১০১) এরপর আমি তাকে এক সহনশীল সুপুত্রের সুসংবাদ দান করি।

(১০২) পরে যখন সে তার পিতার সঙ্গে কাজ করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি জানাও'? পুত্র বলে, 'হে পিতা! আপনার প্রতি যে নির্দেশ হয়েছে তা আপনি পালন করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবর অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'।

(১০৩) এরপর যখন উভয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তখন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন।

(১০৪) তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, 'হে ইব্রাহীম'!

(১০৫) তুমি অবশ্যই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ, নিশ্চয় আমি এভাবেই নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(১০৬) নিশ্চয় এটি ছিল প্রকাশ্য পরীক্ষা।

(১০৭) এবং আমি তাকে ইসমাঈলের পরিবর্তে একটি বিরাট জন্তু জবেহ করতে দেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর জাতির পৌত্তলিকতা বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন তথা মূর্তিগুলোকে ভেঙে দিলেন এবং বাস্তবে এগুলোর অসহায়ত্ব প্রমাণ করে তাদেরকে এ সম্পর্কে উপদেশ দিলেন, তখন তারা উপদেশ গ্রহণের স্থলে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِى الْجَحِيمِ۝

তারা বললো, 'তার জন্যে একটি ইমারত (অগ্নিকুন্ড) তৈরী কর, এরপর তাকে ঐ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ কর'।

মূলতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ কথার কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে না পেরে তাঁর জাতি তাঁকে পুড়িয়ে মেরে ফেলার ইচ্ছা করলো, পরস্পরের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, একটি ইমারত তৈরী কর এবং তাতে জ্বালানী সংগ্রহ করে আগুন ধরিয়ে দাও। যখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন ইব্রাহীমকে (আঃ) তাতে নিক্ষেপ কর।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ পথভ্রষ্ট জাতি চারিপার্শ্বে পাথর একত্রিত করে একটি দেয়াল নির্মাণ করে যা দৈর্ঘ্যে ছিল ত্রিশ হাত, আর প্রস্থে ছিল দশ হাত। এর মধ্যে তারা জ্বালানী কাঠ একত্রিত করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি তাঁর সঙ্গে যুক্তিতে পরাভূত হবার পর তাঁর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের এমনি নারকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন কঠিন কঠোর শাস্তি দেখার পর কেউ তাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও করার দুঃসাহস পাবেনা, তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا

'তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংকল্প করলো'।

বর্ণিত আছে, কাফেররা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর হাত পা অত্যন্ত মজবুত ভাবে বেধে তাঁকে ঐ বিরাট অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে রক্ষা করলেন, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডকে তিনি সুশীতল বাগানে পরিণত করলেন, তাই পরবর্তী বাক্যাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ۝

'তাই আমি তাদেরকে অধঃপতিত করলাম', অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিলাম।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন একজন ব্যক্তি মাত্র, নমরুদের সমস্ত রাজকীয় এবং জাতীয় শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে অকার্যকর হয়ে রইল। তাদের এ ব্যর্থতা তাদেরকে অপমানিত করলো, এ ঘটনাটি ইরাকের 'বাবেল' শহরে ঘটেছিল।

কাফেরদের ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা

এ ঘটনায় একথা প্রমাণিত হলো, ইসলামের শত্রুরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে ধ্বংস করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তা আল্লাহ পাকের রহমতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো, তাদের সকল প্রচেষ্টা অসার প্রতিপন্ন হলো। শুধু তাই নয়; বরং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল। দ্বিতীয়তঃ এ সম্পর্কীয় আয়াত سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ কথাটি দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হলো যে, আগুনের পোড়াবার ক্ষমতা রহিত হয়নি, বরং তা বহাল রয়েছে কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারে তা বিশেষভাবে রহিত করা হয়েছে। এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাগণকে এভাবেই রক্ষা করে থাকেন। এটি নিতান্ত তাঁর দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। এটি ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর একটি মোজেযা। উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় কোন কোন ওলীর ক্ষেত্রেও তাঁদের কারামত হিসেবে এমনি ঘটনার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে।

মূলতঃ অগ্নিকে দাহিকা-শক্তি আল্লাহ পাকই দান করেছেন, আর তা রহিত করার ক্ষমতাও আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। সাধারণতঃ মানুষ অনেক বস্তুকে প্রাণহীন মনে করে যেমন, আগুন, পানি, মাটি, বাতাস প্রভৃতি। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, মানুষের নিকট এসব প্রাণহীন মনে হলেও আল্লাহ পাকের নিকট তারা প্রাণহীন নয়; বরং সর্বদা আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ পালনে তারা নিয়োজিত রয়েছে। বিখ্যাত সাধক, দার্শনিক, মরমী কবি মওলানা রুমীর (রঃ) ভাষায়ঃ

خاك و باد اب و اتش بنده اند ❁ با من و تو مرده باحق زنده اند

'মাটি, বাতাস, পানি, আগুন– এসবই আল্লাহ পাকের অনুগত বন্দা, তোমার আমার কাছে তারা মৃত মনে হলেও আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তারা জীবিত'।

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ❁

আর ইব্রাহীম বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন'।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে অগ্নিকুন্ড থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তাঁর জাতি হতবাক, ব্যর্থতায়, অপমানে জর্জরিত হলেও তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত হলোনা, তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এ কুফর নগরী থেকে হিজরত করে যাবেন, তাই তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম', প্রশ্ন হলো কোথায় যাবেন? তারই জবাবে যেন তিনি

বললেন, 'আমার প্রতিপালকই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন', তিনি আমাকে এমন স্থানে পৌঁছাবেন যেখানে আমি স্বাধীনভাবে আমার প্রতিপালকের বন্দেগী করতে পারি। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাক আমাকে এমন স্থানের পথ-নির্দেশ করবেন, যেখানে গমনের জন্যে তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী সারা সহ 'বাবেল' এলাকা ছেড়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং মিশর পৌঁছলেন। তখন মিশরের বাদশাহ্ ছিল সাদেফ এবনে সাদেফ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তখনকার মিশরের রাজার নাম ছিল সেনান এবনে ওলওয়ান। মিশরের বাদশাহর উপাধি ছিল ফেরাউন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, ঐ ফেরাউনের নাম ছিল আমর এবনে এবনুল কায়েম। এই ফেরাউন তার লোকদের দ্বারা হযরত সারা (আঃ)-কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে তার মহলে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক সমস্ত দেয়াল ও পর্দাগুলোকে ডিমের খোসার মত করে দিলেন যেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সারাকে সর্বক্ষণ দেখতে পারেন এবং তাঁর মন সন্তুষ্ট থাকে। ফেরাউন যখন হযরত সারা (আঃ)-এর সঙ্গে বেআদবী করার কুমতলব করলো তখন তার প্রাসাদে ভূমিকম্প শুরু হলো, তখন সে দ্বিতীয় মহলে চলে গেল, সে মহলেও কম্পন শুরু হলো। এরপর সে তৃতীয় মহলে গেল কিন্তু সেখানেও যখন একই অবস্থা হলো, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফেরাউন হযরত সারা (আঃ)-কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট প্রত্যর্পণ করলো।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখনই ফেরাউন বেআদবীর কুমতলব চরিতার্থ করতে চাইল তখন তার হাত অবশ হয়ে গেল, এ অবস্থায় সে হযরত সারার (আঃ) নিকট ক্ষমা চেয়ে দোয়াপ্রার্থী হলো। তিনি তার জন্যে দোয়া করলেন। ফলে তার হাত ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু সে দ্বিতীয় বার বেআদবী করতে চাইল, পুনরায় তার হাত অবশ হলো। তখন সে আবারো দোয়া প্রার্থী হলে তিনি দোয়া করলেন, ফলে তার হাত ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু তৃতীয়বারের মত সে বেআদবী করতে ইচ্ছুক হলে আবার তার হাত অবশ হয়ে যায়। এবার সে শপথ করে বললো, যদি এবার আমার হাত ঠিক হয়ে যায় তবে আর কখনও এমন অন্যায় কাজ করবো না।

ইমাম আহমদ (রঃ) মসনদে এবং বোখারী ও মুসলিম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর হাদীস সংকলন করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী সারা (আঃ) সহ এক জালেম বাদশাহর দেশ অতিক্রম করছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলো, 'ইনি কে?' তিনি বললেন, 'ইনি আমার বোন'। এরপর তিনি হযরত সারার (আঃ) নিকট এসে বললেন, 'হে সারা! শোন, সমগ্র পৃথিবীতে আমি ও তুমি ব্যতীত

কোন মোমেন নেই, এ ব্যক্তি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলেছি, 'সে আমার বোন', তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করোনা', এরপর হযরত সারা (আঃ)-কে ঐ রাজার নিকট হাযির করা হলো এবং রাজা বেআদবী করার ইচ্ছা করলে সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তি হলো। সে ক্ষমা চেয়ে দোয়া প্রার্থী হলে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করলেন। এভাবে তিনবার হলো, এরপর তার পরিচারককে বললো, একে নিয়ে যাও এবং হযরত সারা (আঃ)-এর খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান করলো। হযরত সারা (আঃ) যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট ফিরে এলেন তখন তিনি নামাযে রত ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি অবস্থা?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ পাক তার চক্রান্তকে তারই উপর নিক্ষেপ করেছেন এবং সে আমার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দিয়েছে'।

মাওয়াহেবে লুদ্দুনীয়ায় এ ঘটনার বর্ণনা এভাবে এসেছে, যখন ফেরাউনের হাত অবশ হয়ে গেল তখন সে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট দোয়ার জন্যে ফরিয়াদ করলো। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ায় সে সুস্থ হল। তখন সে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর খেদমতে হাজেরাকে উপহার দিল, যিনি পরবর্তীতে হযরত ইসমাঈলের (আঃ) মাতা হয়েছিলেন। হযরত হাজেরা (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত আমানতদার। মিশরের রাজা তাঁকে প্রদান করার সময় হযরত সারাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেছিলোঃ

هَا اَجْرُكَ

অর্থাৎ 'এই নাও তোমার প্রতিদান'। এজন্যে হযরত হাজেরার নাম 'হাজেরা' হয়ে গেল, মাঝের 'হামজা' বাদ দিয়ে দেয়া হল এবং 'জিমে'র সাকীন বাদ দিয়ে নিচে 'যের' দেয়া হলো।

এরপর হযরত সারা (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর খেদমতে হাজেরাকে দান করলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া করেছিলেন,

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۝

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নেককার সন্তান দান করুন'।

নেককার সন্তানের জন্যে দোয়া

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন মিশর হয়ে সিরিয়া পৌঁছলেন, তখন পুত্র সন্তানের জন্যে এ দোয়া করেছিলেন।

মূলতঃ তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি ঈমান রক্ষার নিমিত্তে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেশ থেকে হিজরত করতে হয়, এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন আপনজন সকলকে পরিত্যাগ করতে হয়। এমনি অবস্থায় তিনি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক শুধু সিরিয়া অবস্থান করতে থাকেন, ঐ সময়ে তিনি এ দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তৌহীদের মহান আদর্শের ধারক ও বাহক হতে পারে এমন এক সুসন্তান আমাকে দান করুন'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুসন্তান লাভের জন্যে দোয়া করা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নত। এমন সন্তান যার দ্বারা দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা লাভ করা যায়, যে ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক হয়, যে পিতার যোগ্য প্রতিনিধি হয় এমন সন্তানের জন্যে দোয়া করা কাম্য।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে নেককার সন্তান লাভের জন্যে দোয়া করেছেন।[১]

ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে মোনাজাত করেছেন, 'হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন এক নেককার সন্তান দান কর যে তোমার অনুগত থাকবে, যে কখনো তোমার নাফরমানী করবে না, যে বিশ্বে শান্তি কায়েম করবে, কখনো অশান্তি সৃষ্টি করবে না'।

আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুল করে তাঁকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করলেনঃ

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ۝

'এরপর আমি তাকে এক সহনশীল সুপুত্রের সুসংবাদ দান করি'।

আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ 'কামুসে' حليم শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে 'সহনশীল', 'স্থিরচিত্ত', 'বুদ্ধিমান'। আর এ সন্তানই হলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। যাঁর জন্ম লাভের পূর্বেই আল্লাহ্ পাক তাঁর এ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্পর্কেও আল্লাহ্ পাক এ গুণটির উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

১। তফসীরে মাজেদী পৃষ্ঠা-৯০০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩০৪
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৪৮

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয়, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক এমন পুত্র দান করেছেন, গুণাবলীর দিক থেকেও যিনি স্বীয় পিতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। আর এ মতই পোষণ করেছেন সাঈদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), রবী এবনে আনাস (রঃ), মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযী (রঃ) এবং কালবী (রঃ)।

তফসীরকার আতা (রঃ) এবং ইউসুফ এবনে মালেক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যাঁকে কোরবানী করার কথা বলা হয়েছিল এবং যাঁর স্থলে একটি ভেড়া কোরবানী দেয়া হয়েছিল, তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-ই। বর্ণিত আছে ইহুদীরা দাবী করতো যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যে পুত্রকে জবেহ করার কথা বলা হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ)। অথচ তাদের এ কথাটি ছিল নিতান্ত হিংসা-প্রসূত। কেননা, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর স্থলে যে ভেড়াটিকে জবেহ করা হয়েছিল, তার দু'টি শিং কা'বা শরীফের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা ছিল, আর এগুলো ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং হাজ্জাজের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন কা'বা শরীফে আগুন ধরে যায়, তখন এ শিং দু'টি অগ্নিদগ্ধ হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ইমাম শা'বী (রঃ) বলেছেন, দু'টি শিংকে আমি কা'বা শরীফের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর স্থলে জবেহ করা দুম্বার শিংগুলো কা'বা শরীফের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।

আসমায়ী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি আবু আমর এবনে আলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আল্লাহ পাকের নামে ইসমাঈল (আঃ)-কে জবেহ করার কথা হয়েছিল না ইসহাক (আঃ)? তখন আবু আমর বলেছিলেন, 'হে আসমায়ী! তোমার বুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? ইসহাক (আঃ) মক্কাতে কখন ছিলেন? ইসমাঈল (আঃ)-ই তো মক্কা

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৫১

শরীফে ছিলেন। তিনিই-তো পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে মিলে কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করেছিলেন'।

যাহোক, একথা সন্দেহাতীত ভাবে বলা চলে যে, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এরই জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, আর তিনিই ছিলেন 'জবীহুল্লাহ'।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ মত পোষণ করে বলেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। আর হযরত ইসহাক (আঃ) যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। অতএব, সঠিক তথ্য হলো, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে জবেহ করার কথাই হয়েছিল, ইসহাক (আঃ)-কে নয়। আর 'কিতাব ও ছুন্নত' দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।[২]

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ

'পরে যখন সে তার পিতার সঙ্গে কাজ করার বয়সে উপনীত হলো'–

قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰىؕ

'তখন ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি, জানাও'।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পুত্র সন্তান দানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যখন পুত্র ইসমাঈল তাঁর পিতার সঙ্গে কাজ করার বয়সে উপনীত হন, অর্থাৎ ইসমাঈল (আঃ)-এর এত বয়স হয় যে, তিনি পিতার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতের السعى শব্দটির অর্থ 'চেষ্টা করা'।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কোন কাজ করা।

আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন এর অর্থ হলো, হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁর পিতার সঙ্গে দৌড়ে পাহাড় পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৪১-৪২
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৩৮

মুজাহেদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এর অর্থ হলো, যখন ইসমাঈল (আঃ) যৌবনে পদার্পণ করেন।

কারো কারো মতে, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তের বছর। আর কেউ কেউ বলেছেন, যখন তাঁর বয়স সাত, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁকে বলেছিলেন, 'হে আমার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, হয়তো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে দেখেছেন যে, তিনি ইসমাঈল (আঃ)-কে জবেহ করছেন, অথবা তিনি এমন স্বপ্ন দেখেছেন, যার তা'বীর হয় পুত্রকে জবেহ করা।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সিরিয়াতে বাস করতেন, আর হাজেরা এবং ইসমাঈল (আঃ) থাকতেন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রায়ই তাঁদের দেখতে আসতেন, তিনি সিরিয়া থেকে সকালে বোরাকে আরোহণ করে দুপুরে মক্কায়ে মোয়াজ্জমা পৌঁছে যেতেন এবং তথায় বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। এরপর বিকেলে সিরিয়া চলে যেতেন এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করতেন। যখন ইসমাঈল (আঃ) একটু বয়স্ক হন এবং ইসমাঈল (আঃ)-এর ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীর ব্যাপারে সহযোগী হবেন, ঠিক এমন সময় স্বপ্নযোগে আদেশ দেয়া হলো যে, ইসমাঈলকে জবেহ কর।

বর্ণিত আছে যে, জ্বিলহজ্ব মাসের আট তারিখ রাতে সর্বপ্রথম তিনি এ স্বপ্ন দেখেন। সারা দিন তিনি চিন্তা মগ্ন ছিলেন, এ স্বপ্ন কি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে? এজন্যে আট জিলহজ্বকে 'ইয়াওমুত তারবীয়া' অথবা 'চিন্তা করার দিন'. বলা হয়। এদিন দিবাগত রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন, নয় তারিখ সকালে তিনি উপলব্ধি করলেন, এ স্বপ্ন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদেশ মাত্র। এরপর তিনি ইসমাঈল (আঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর পর তিনরাত এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। তখন তাঁর অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে, এটি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে পুত্রকে জবেহ করার আদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে বলেছিলেন, 'চল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোরবানী করবো', হযরত ইসমাঈল (আঃ) রশি এবং ছুরি নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পাহাড়ের পাদদেশে

পৌঁছলেন। পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আব্বাজান! আপনার কোরবানীর জন্তু কোথায়?' তখন পিতা বললেন, 'হে আমার স্নেহের পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে আল্লাহর রাহে কোরবান করছি, এখন এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? জানাও'।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রের ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন।

قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز

'ইসমাঈল বললো, 'হে আমার পিতা! আপনার প্রতি যে আদেশ হয়েছে, তা আপনি পালন করুন'।

অর্থাৎ পুত্র ইসমাঈল (আঃ) তাঁর জবেহ হওয়ার প্রস্তাব নিঃসংকোচে মেনে নিলেন এবং বললেন, 'হে আমার পিতা! স্বপ্ন যোগে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যে আদেশ আপনি পেয়েছেন, তা আপনি পালন করুন'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী রসূলগণের স্বপ্ন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহী হিসেবে পরিগণিত, যার উপর আমল করা অবশ্য কর্তব্য।

আবদ এবনে হোমায়েদ কাতাদার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, নবী রসূলগণের স্বপ্ন 'ওহী' হয়।

বোখারী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নেক স্বপ্ন নবুওয়্যতের ছেচল্লিশতম অংশ।

سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ۝

'আব্বাজান! আপনি আমার সম্পর্কে চিন্তা করবেন না, ইনশাআল্লাহ্! আপনি আমাকে সবর অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'।

লক্ষ্যনীয়, প্রথমতঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ পাকের হুকুম পালনে তথা আমাকে জবেহ করার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা সংকোচ এবং চিন্তা করবেন না, আল্লাহ পাকের হুকুমে জবেহ হতে আমি প্রস্তুত', তবে এ ব্যাপারে নিজের শক্তির উপর ভিত্তি করে কোন কথা না বলে আল্লাহ্ পাকের মর্জির উপর বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে বলেছেন,

'ইনশাআল্লাহ', অর্থাৎ 'আল্লাহ পাকের মর্জি হলে আমি সবর অবলম্বন করতে পারবো'। এতে রয়েছে পরিপূর্ণ মা'রেফাত এবং নিখুঁত বিনয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾

'এরপর যখন তারা উভয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তখন ইব্রাহীম (আঃ) তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন'।

অর্থাৎ পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন, ইব্রাহীম (আঃ) স্নেহের পুত্রকে এবং ইসমাঈল (আঃ) তাঁর প্রাণকে আল্লাহ পাকের হাতে সোপর্দ করলেন, পিতা পুত্রকে জবেহ করার জন্যে মাটিতে শায়িত করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ ঐতিহাসিক ঘটনা মিনাতে ঘটেছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) আতা এবনে সয়েবের সূত্রে লিখেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ ঘটনা এ স্থানেই হয়েছে, যা আজো কোরবানীর স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট রয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) আরো লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, কিশোর ইসমাঈল তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'আব্বাজান! আমার হাত-পা মজবুত করে বেধে নিন, যাতে আমি নড়াচড়া না করি, আর আপনার পোষাক সামলে নিন, যেন রক্তের ছিটা তাতে না লাগে, যা দেখে আমার মা অস্থির হতে পারেন। আর ছুরিকে ধার করে নিন, যাতে করে আমার কষ্ট কম হয়, কেননা মৃত্যু অত্যন্ত কঠিন বিষয়। আর আমার মাকে সালাম দেবেন, আর আমার জামাটি আমার মায়ের নিকট নিয়ে যাবেন। তাতে তিনি সান্ত্বনা পাবেন'। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন বললেন, 'আমার প্রিয় পুত্র, আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে তুমি আমার উত্তম সহায়ক', এরপর পুত্র যা বলেছিলেন, পিতা তাই করলেন, প্রথমতঃ পুত্রকে শায়িত করলেন, এরপর তাঁকে বেধে নিলেন, এরপর কাঁদতে লাগলেন এবং ইসমাঈলকে (আঃ) জবেহ করার জন্যে ছুরি বসিয়ে দিলেন কিন্তু ছুরি কার্যকর হলোনা, তিনি অত্যন্ত জোরে ছুরি চালিয়ে দিলেন, তবুও ছুরি অকেজো রইল।

বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর পুত্রকে জবেহ করার ইচ্ছা করলেন তখন ইবলিস শয়তান বললো, যদি আমি এ সময় ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরিবারবর্গকে পথভ্রষ্ট করতে না পারি, তবে কখনও তাঁর বংশধরদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে পারবোনা। এরপর সে হযরত হাজেরা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলো এবং

বললো, 'তুমি কি জান, ইব্রাহীম (আঃ) তোমার পুত্রকে কোথায় নিয়ে গেছেন'? তিনি বললেন, 'তারা উভয়ে জ্বালানী সংগ্রহ করতে গেছেন'। ইবলিস বললো, 'না', ঘটনা তা নয়, বরং ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ)-কে জবেহ্ করতে নিয়ে গেছেন'। কিন্তু হযরত হাজেরা (আঃ) বললেন, 'এমনটি হতে পারেনা, কেননা তিনি পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসেন'। শয়তান বললো, 'তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ পাক তাঁকে ইসমাঈল (আঃ)-কে জবেহ করার আদেশ দিয়েছেন'। তখন হযরত হাজেরা (আঃ) বললেন, 'যদি তাঁর প্রতিপালক তাঁকে এ আদেশ দিয়ে থাকেন, তবে ঐ আদেশ পালন করাই হবে উত্তম'। শয়তান মায়ের নিকট থেকে নিরাশ হয়ে পুত্র ইসমাঈলের (আঃ) নিকট হাযির হলো। তিনি তখন পিতার পেছনে চলছিলেন। কিশোর ইসমাঈলকে ইবলিস জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি জান তোমার পিতা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন'? তিনি বললেন, 'আমরা জ্বালানী সংগ্রহ করতে যাচ্ছি'। শয়তান বললো, 'আল্লাহর শপথ! এ উদ্দেশ্য নয়; বরং তোমার পিতা তোমাকে জবেহ্ করতে চায়'। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, 'কেন'? শয়তান বললো, 'তাঁর ধারণা এই যে তাঁর প্রতিপালক তাঁকে এর আদেশ দিয়েছেন'।

ইসমাঈল (আঃ) বললেন, যদি তাই হয়, তবে আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালন করাই হবে উত্তম। আর আমিও তাতে প্রস্তুত।

পুত্র ইসমাইল (আঃ) যখন শয়তানের কথা মানলেন না তখন শয়তান হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললোঃ 'শায়খ! কোন্ দিকে যাচ্ছেন'? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেনঃ 'আমি একটি কাজে ঐ ঘাঁটির দিকে যাচ্ছি'।

শয়তান বললোঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি জানি, শয়তান আপনাকে স্বপ্নে বলেছে যে তোমার পুত্রকে জবেহ্ কর'। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উপলব্ধি করলেন যে, ইবলিস শয়তানই তাঁকে একথা বলছে। তাই তিনি বললেন, 'হে অভিশপ্ত! ভাগ এখান থেকে, আমি আমার প্রতিপালকের কথা অবশ্যই মানবো'।

এভাবে শয়তান ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল, আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা করলেন। আবু তোফায়েল হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তাঁর পুত্রকে জবেহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন ইবলিশ শয়তান 'মাশআরে' তাঁকে বাধা দেয়ার জন্যে সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি সম্মুখের দিকে এগিয়ে যান। এরপর যখন তিনি 'জমরায়ে ওকবা'য় এসে পৌঁছেন, শয়তান পুনরায় সেখানে তাঁর সামনে দাঁড়ায়, তিনি তখন তার প্রতি সাতটি

পাথর নিক্ষেপ করেন, সে সেখান থেকে হটে যায়। এরপর তিনি 'জমরায়ে ওস্তা'য় পৌছলে, সেখানেও শয়তান হাযির হয়। পুনরায় তিনি শয়তানকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি যখন 'জমরায়ে কোবরা'র নিকট পৌছেন সেখানেও শয়তানকে দেখেন, তিনি তাকে লক্ষ্য করে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলে ইবলিস পলায়ন করে। তিনি আল্লাহ পাকের হুকুম পালনের জন্যে অগ্রসর হন।

وَنَادَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۝

'আর তখন আমি ডাক দিলাম, 'হে ইব্রাহীম'!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا

তুমি স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছ, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে আদেশ তাঁর প্রতি হয়েছিল, তা যথাযথভাবে তিনি পালন করেছেন, তাতে এতটুকু ত্রুটি হয়নি, কিন্তু আল্লাহ পাক ইসমাঈল (আঃ)-কে রক্ষা করেছেন, এটি আল্লাহ পাকের কাজ এবং তাঁর দান। এভাবে তাঁরা উভয়ে এত খুশী হন, যা বর্ণনাতীত। প্রথমতঃ আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের তৌফিকের জন্যে এবং এতে যে অশেষ প্রতিদান রয়েছে তার জন্যে, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের হুকুম পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি যে ইসমাঈল (আঃ)-কে জীবিত রেখেছেন, তার জন্যে। তাঁরা উভয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করেন।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, যদিও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে জবেহ করার আদেশ দেয়া হয়, তবে এতে পুত্রকে জবেহ করা উদ্দেশ্য ছিলনা; বরং তাঁকে পরীক্ষা করাই ছিল উদ্দেশ্য। আর প্রেমের সে পরীক্ষায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উত্তীর্ণ হয়েছেন।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ۝

'নিশ্চয় আমি এভাবেই নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি'।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ করছেন, অর্থাৎ নিজেকে তিনি পুত্র ইসমাঈলকে জবেহ করতে দেখেছেন, জবেহ করে ফেলেছেন তা কিন্তু দেখেননি। আর বাস্তবেও তাই হয়েছে, যা তিনি দেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে তিনি এভাবেই সত্যে পরিণত করেছেন। আল্লাহ পাকের আদেশ পালনে তিনি যত্নবান থেকেছেন, আল্লাহ পাক তাঁকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, সারা বিশ্বে তাঁকে সুখ্যাতি দান করেছেন, তাঁর এ

ত্যাগ-তিতিক্ষাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে অনুসরণীয় বলে ঘোষণা করেছেন। যাঁরা এভাবে আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করে, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَٰٓؤُا الْمُبِينُ

'নিশ্চয় এটি ছিল প্রকাশ্য পরীক্ষা'।

অর্থাৎ প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রকে স্বহস্তে জবেহ করা ছিল অত্যন্ত কঠিনতম পরীক্ষা, যাতে অত্যন্ত বড় মোখলেস ব্যতীত কেউ সফল হতে পারেনা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন।

হাকীমূল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) লিখেছেন, পুত্রকে জবেহ করার এ আদেশ ওহীর মাধ্যমে নয়; বরং স্বপ্নের মাধ্যমে প্রদানের হেকমত হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অধিকতর আনুগত্যের কথা প্রকাশ করা কেননা, স্বপ্নকে সাধারণতঃ মানুষ স্বপ্নই মনে করে। বাস্তবে এর প্রতিক্রিয়া সর্বদা দেখা যায় না। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্বপ্নকেও আল্লাহ পাকের সরাসরি নির্দেশ জ্ঞান করে তা পালনে অনতিবিলম্বে তৎপর হয়েছেন। এটি তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

'এবং আমি তাকে ইসমাঈলের পরিবর্তে একটি বিরাট জন্তু জবেহ করতে দেই'।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রিয় পুত্রকে জবেহ রত অবস্থায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ডাক শ্রবণ করে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি জীব্রাইলকে (আঃ) দেখতে পেলেন, তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত সাদা ধবধবে বর্ণের বড় বড় শিং ও চক্ষু বিশিষ্ট হৃষ্ট-পুষ্ট একটি ভেড়া ছিল। জীব্রাইল (আঃ) বললেন, এটি হলো আপনার পুত্রের ফেদিয়া, এর কোরবানী করে দিন। তখন জীব্রাঈল (আঃ) তকবীর পাঠ করলেন, ঐ ভেড়াটিকেও আল্লাহ পাক বাকশক্তি দান করলেন, সে-ও তকবীর পাঠ করলো, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং কিশোর ইসমাঈলও (আঃ) তকবীর পাঠ করলেন, এরপর কোরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ঐ ভেড়াটি কোরবানী করলেন। কোরবানী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এরই ছিল। তবে কোরবানীর জন্তুটি আল্লাহ পাক দান করেন, আর আল্লাহ পাকই ইসমাঈল (আঃ)-এর স্থলে ঐ জন্তুটি কোরবানীর আদেশ দিয়েছিলেন–

بِذِبۡحٍ عَظِيۡمٍ

'এবং আমি তাকে ইসমাঈলের পরিবর্তে একটি বিরাট জন্তু জবেহ্ করতে দেই'।

عظيم বা 'বিরাট' বলে আখ্যায়িত করার একাধিক কারণ রয়েছে।

১. দুম্বাটি ছিল অত্যন্ত বড় এবং হৃষ্ট-পুষ্ট।

২. হোসাইন এবনে ফোজাইল বলেছেন, বিরাট বলার কারণ হলো, কোরবানীর জন্তুটি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়।

৩. সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, কোরবানীর ঐ জন্তুটির 'বিরাট' হওয়ার হক্ব ছিল।

৪. মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যেহেতু কোরবানী আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কবুল হয়েছে তাই তাকে عظيم বলা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন, ঐ ভেড়াটি চল্লিশটি বসন্ত জান্নাতে অতিবাহিত করেছে। এবনে শায়বা, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এ বর্ণনা দিয়েছেন।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে ভেড়াটিকে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর স্থলে কোরবানী দেয়া হয়, ঐ ভেড়াটিকে হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র হাবীল কোরবানী স্বরূপ পেশ করেছিল, যা আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয়েছিল।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫০

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ
بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ
مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي
الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

তরজমা

(১০৮) আর আমি এ বিষয়টি পরবর্তী লোকদের স্মরণে রেখে দিয়েছি যে-

(১০৯) ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

(১১০) এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(১১১) সে ছিল আমার মোমেন বন্দাগণের অন্যতম।

(১১২) এবং আমি তাকে পুত্র ইসহাকেরও সুসংবাদ দান করি যে ছিল নবী, নেককারগণের অন্যতম।

(১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছিলাম, তাদের উভয়েরই বংশধরদের মধ্যে ছিল পূণ্যবান, নেককার এবং নিজেদের উপর অত্যাচারীও রয়েছে।

(১১৪) এবং আমি মূসা ও হারুণের প্রতিও অনুগ্রহ করেছিলাম।

(১১৫) এবং তাদেরকে ও তাদের জাতিকে ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করেছি।

(১১৬) আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছিল।

(১১৭) আর আমি তাদেরকে স্পষ্ট কিতাব দান করি।

(১১৮) এবং আমি তাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করি।

(১১৯) এবং আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীকালের লোকদের স্মরণে রেখেছি।

(১২০) মূসা এবং হারুনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

(১২১) এভাবেই আমি নেককারগণকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(১২২) নিশ্চয় তারা উভয়ে ছিল আমার মোমেন বন্দাগণের অন্যতম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ঐতিহাসিক কোরবানীর ঘটনার উল্লেখ ছিল। স্বপ্নযোগে আল্লাহ পাকের নির্দেশ পেয়ে কীভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবেহ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে এ আয়াত সমূহে।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ۝

'আমি তা পরবর্তী লোকদের স্মরণে রেখেছি', অর্থাৎ অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ ঘটনাকে অনুসরণীয় করে রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ের মানুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এমন অতুলনীয় আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করবে এবং তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে।

বিশেষতঃ উম্মতে মোহাম্মদীয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বিশেষভাবে স্মরণ করবে, এজন্যে এ উম্মতের নামাযের তাশাহহুদে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করার বিধান রাখা হয়েছে। নামাযী মাত্রকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করতে হয়।

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ۝

'শান্তি বর্ষিত হোক ইব্রাহীমের প্রতি'।

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۝

'এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি'।

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সালাম লাভ করা, পৃথিবীর মানুষের জন্যে অনুসরণীয় হওয়া এবং সমগ্র মানব জাতির মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকা এবং আল্লাহ

পাকের বন্ধুত্ব লাভ করার চেয়ে বড় প্রতিদান আর কী হতে পারে, যা আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দান করেছেন। যারা আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দা, যারা আল্লাহ পাকের মহব্বতে মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা তাদেরকে, এভাবেই আল্লাহ পাক প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۝

'নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল আমার মোমেন বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত'।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি যে ঈমান এবং একীন ছিল, তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। আল্লাহ পাকের প্রতি এমন সুদৃঢ় ঈমানের বদৌলতেই তিনি তাঁর পুত্রকে আল্লাহ পাকের নামে জবেহ করতে সচেষ্ট হতে পেরেছিলেন।

وَبَشَّرْنٰهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِينَ۝

'আর আমি ইব্রাহীমকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, নেককারগণের অন্যতম'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আরেকটি পুত্র সন্তান দান করার সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যাঁর নাম হবে ইসহাক। যাঁর নবী হওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর জন্মের পূর্বেই হয়ে রয়েছে এবং নবুওয়্যতের উচ্চ পদ লাভের কথা ঘোষণা করার পরও তাঁকে 'নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত' বলার তাৎপর্য হলো, তাঁর উচ্চ মর্তবার কথা ঘোষণা করা।

এতে একথাও প্রমাণিত হয়, মানুষের নেককার হওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যার অধিকারী হয়েছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসহাক (আঃ)।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে নবী হওয়ার পাশাপাশি 'সালেহ' বা উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নেককার হওয়া জরুরী ছিলনা। যেমন, গণকরা অদৃশ্য জগতের কোন কথা বলতে পারলেই গণক হওয়ার জন্যে যথেষ্ট মনে করা হতো। এজন্যে কোরআনে করীমে হযরত ইসহাক (আঃ)-এর নবুওয়্যতের কথা ঘোষণা করার পরও তাঁর নেককার হওয়ার উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, ইসলামে এ গুণটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।[১]

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং তাঁকে জবেহ করার ঘটনার উল্লেখ ছিল। এ আয়াত থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসহাক (আঃ)-এর

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯০১

সুসংবাদ স্থান পেয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) হযরত ইসহাক (আঃ) থেকে তের বছরের বড় ছিলেন। হযরত ইসহাক (আঃ)-এর মাতা ছিলেন হযরত সারা (আঃ)। যাহোক, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দু'টি সুসংবাদ প্রদান করা হয়। একটি ছিল হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সম্পর্কে যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনেক দোয়া এবং ক্রন্দণের পর দান করা হয়। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় সুসংবাদটি কোন দোয়া বা আকাঙ্ক্ষা ব্যতীতই আল্লাহ পাক দান করেন। এটি ছিল হযরত ইসহাক (আঃ)-এর সম্পর্কে। আর তাঁর সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ط

'আর আমি ইব্রাহীমকে এবং ইসহাককে অনেক বরকত দান করেছি'।

অর্থাৎ দ্বীন ও দুনিয়ায় অনেক বরকত আল্লাহ পাক তাঁদেরকে দান করেছেন। অথবা এর অর্থ হলো, তাঁদের বংশধরদের মধ্যে আল্লাহ পাক অনেক বরকত দিয়েছেন তথা তাদের মধ্যে অনেক নবী জন্ম লাভ করেছেন। কেননা, বনী ইসরাঈলের সমস্ত নবী হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র এবং তাঁর (ইসহাক (আঃ) প্রথম পুত্র ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং এ বংশে সর্বশেষ নবী ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)।

সাধারণতঃ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন, তবে হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দু' পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ)-এর সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁদের উভয়কে অনেক বরকত দান করেছেন। হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে সহস্রাধিক নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। আর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব, সমস্ত নবী রসূলগণের দলপতি, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। ইমাম কুরতবীও তাঁর তফসীরে উভয় ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۝

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১১৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৯০

'তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সংখ্যক নেককার ছিল এবং কিছু সংখ্যক এমন লোকও ছিল, যারা প্রকাশ্যে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে'।

অর্থাৎ তাদের মধ্যে উভয় প্রকার লোকই ছিল, যারা ঈমান ও একীনের গুণে গুণান্বিত হয়েছিলেন, আর যারা শেরক ও কুফরী করে নিজেদের প্রতি প্রকাশ্য জুলুম করেছিল, এমন লোকও জন্মগ্রহণ করেছিল তাঁদের বংশে। তবে যে কথাটি এর দ্বারা প্রমাণিত হয় তা হলো হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা প্রত্যেকেরই নিজের উপকারে বা অপকারে আসে। বংশধরদের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসহাক (আঃ)-এর যারা অনুসারী হয়েছে, তারা লাভবান হয়েছে। আর যারা তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করেনি; বরং আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে, তারা তার শোচনীয় পরিণতি অবশ্যই ভোগ করবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা আজর, হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রী, হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আবু লাহাব, আবু জেহেল গং আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারী না হওয়ার কারণে শাস্তি তাদের এতটুকু লাঘব হবেনা। যার কাছে ঈমান ও নেক আমল থাকবে, তার মাগফেরাত হবে। পক্ষান্তরে, যার কাছে ঈমান ও নেক আমল থাকবেনা, কোন নবীর ঘণিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হলেও সে এতে করে উপকৃত হবেনা। এটিই ইসলামের অমোঘ নীতি, যা এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۝ وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۝

'এবং নিশ্চয় আমি মূসা ও হারুনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাদেরকে ও তাদের জাতিকে ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করেছি'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতোপূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের যে অগণিত নেয়ামত প্রদত্ত হয়েছিল তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর হযরত মূসা কলীমুল্লাহ (আঃ)-এর অনুসরণের কারণে বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আল্লাহ পাক যে অসাধারণ অনুগ্রহ করেছেন, তারও উল্লেখ রয়েছে। বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউন শতাব্দীর পর শতাব্দী গোলাম করে রেখেছিল, তারা ছিল নিযাতিত-উৎপীড়িত। হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণের বরকতে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের অকথ্য নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছেন, ফেরাউন আর

তার দলবলকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, তাদের অর্থ-সম্পদ এবং স্থাবর-অস্থাবর সর্ব প্রকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছেন মজলুম বনী ইসরাঈল জাতিকে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ 'আর নিশ্চয় আমি মূসা ও হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি', তাদেরকে নবুওয়্যত ও রেসালত দান করার পাশাপাশি আল্লাহ্ পাক অনেক প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুণাবলী দান করেছেন এবং ফেরাউনের জুলুম থেকে তাঁদেরকে ও তাঁদের জাতিকে রক্ষা করেছেন।

وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ۝

'আর আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, তাই তারা বিজয়ী হয়েছে'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মূসা ও হারুন (আঃ)-কে তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে যে সাহায্য করেছিলেন, তারই বদৌলতে তারা তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, ফেরাউন ও তার দলবল নিমজ্জিত হয়েছে।

وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ۝

'আর আমি তাদেরকে স্পষ্ট কিতাব দান করি'।

অর্থাৎ তৌরাত, যার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۝

'আর আমি তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করি', যাতে পথিক সহজে মঞ্জিলে মকুসদে পৌঁছতে পারে।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ۝

'এবং আমি তাদের উভয়কে পরবর্তী কালের লোকদের স্মরণে রেখেছি'।

অর্থাৎ অনাগত দিনের মানুষের মধ্যে তাদের উভয়কে স্মরণীয় করে রেখেছি'। পৃথিবীর মানুষ যুগ যুগ ধরে তাদেরকে স্মরণ করতে থাকবে-এ ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۝ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ۝

'মূসা ও হারুনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয় এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তারা উভয়ে ছিল আমার মোমেন বন্দাগণের অন্তর্ভুক্ত'।

জালেম ফেরাউনের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিজয় লাভ করা, ফেরাউনের ধ্বংস হওয়া, বিশ্বব্যাপী হযরত মূসা (আঃ)-এর সুনাম-এসবই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁর প্রতি বিশেষ দান। যে বা যারাই আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে এবং তাঁর তৌহীদের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

وَإِنَّ إِلْيَاسَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ
بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ
إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

তরজমা

(১২৩) আর নিশ্চয় ইলিয়াস আমার রসূলগণের অন্যতম।

(১২৪) স্মরণ কর সে সময়কে যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, 'তোমরা কি ভয় কর না'?

(১২৫) তোমরা কি 'বাআল' নামক মূর্তিকে ডাক? আর সেই সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ কর?

(১২৬) যিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদের ও তোমাদের সকল পূর্ব পুরুষদের একমাত্র প্রতিপালক'।

(১২৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, পরিণামে তারা অবশ্যই পাকড়াও হয়ে আসবে।

(১২৮) তবে আল্লাহ পাকের মনোনীত বন্দাগণ এর ব্যতিক্রম।

(১২৯) আমি পরবর্তী লোকদের মধ্যে তার জন্যে স্মরণ রেখে দেই যে-

(১৩০) ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

(১৩১) এভাবেই আমি নেককারগণের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(১৩২) নিশ্চয় সে আমার নেককার বন্দাগণের অন্যতম।

(১৩৩) এবং নিশ্চয় লূতও আমার রসূলগণের অন্যতম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-এর কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। হযরত ইলিয়াস (আঃ) হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন, তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবীগণের অন্যতম। হযরত ইউশা (আঃ)-এর পর তিনি নবী মনোনীত হন। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের পশ্চিমে অবস্থিত 'বা'লাবাক' শহরের অধিবাসীদের নিকট তিনি প্রেরিত হন। এ শহরের অধিবাসীরা 'বাআল' নামক একটি মূর্তির পূজা করতো, আর এ মূর্তির নামেই তাদের শহরের নামকরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, হযরত ইলিয়াস (আঃ) এসেছেন হযরত মূসা (আঃ)-এর পর, তবে হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও হযরত ইয়াহয়া (আঃ)-এর পূর্বে তাঁর আগমন হয়।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) প্রসঙ্গে

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, ইলিয়াস (আঃ) ও ইদ্রিস (আঃ) একই ব্যক্তি ছিলেন। তফসীরকার একরামাও (রঃ) একই মত পোষণ করতেন। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ইলিয়াস (আঃ) ও ইদ্রিস (আঃ) উভয়েই বনী ইসরাঈলের দু'জন নবী। কেননা, হযরত ইলিয়াস (আঃ) হলেন হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর, অন্যদিকে হযরত ইদ্রিস (আঃ) হলেন হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্ব পুরুষ।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত ইলিয়াস (আঃ) ছিলেন হযরত আলইয়াসা (আঃ)-এর ভ্রাতঃস্পুত্র।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৮৬-৮৭

মোহাম্মদ এবনে এসহাক হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর বংশধারা এভাবে বর্ণনা করেছেন, ইলিয়াস এবনে বশীর, এবনে কাইহাস, এবনে আইরাজ, এবনে হারুন, এবনে এমরান।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক আরো বর্ণনা করেন, হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর পূর্বে যিনি নবী ছিলেন, তাঁর ইন্তেকাল হওয়ার পর বনী ইসরাঈল জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কুফর, শেরক এবং বেদআত প্রচলিত হয়, মূর্তি তৈরী ও পূজা শুরু হয়, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর পর বনী ইসরাঈলে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য হতো, তৌরাতের ভুলে যাওয়া বিধি-নিষেধগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া, পথভ্রষ্ট বনী ইসরাঈল জাতিকে পথে আনা। বনী ইসরাঈল সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল, হযরত ইউশা এবনে নুন, যিনি সিরিয়া বিজয় করেছিলেন, তিনি বনী ইসরাঈলকে সিরিয়াতে আবাদ করেন। তাদের মধ্যে একটি গোত্র 'বা'লাবাক' নামক স্থানের অধিবাসী ছিল আর তাদেরই হেদায়েতের জন্যে আগমন করেছিলেন হযরত ইলিয়াস (আঃ)। তদানীন্তন কালে তাদের যে রাজা ছিল, তার নাম ছিল উজব, সে ছিল মূর্তিপূজক, আর এজন্যেই বনী ইসরাঈল জাতিকে সে মূর্তি পূজায় লিপ্ত করেছিল। তার একটি মূর্তির নাম ছিল 'বা'আল'। চারটি মুখ বিশিষ্ট এ মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে ছিল দশ হাত।

রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলেই তখন মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) একা আল্লাহ পাকের এবাদত করতেন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাতেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা শ্রবণে প্রস্তুত ছিলনা, যেহেতু রাজা মূর্তিপূজক ছিল, তাই লোকেরাও রাজার অনুসরণে মূর্তিপূজা করতো। হযরত ইলিয়াস (আঃ) রাজা উজবকেও তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাতেন এবং তাকে আত্ম সংশোধনের জন্যে উপদেশ দিতেন। আজবীল নাম্নী রাজার একজন স্ত্রী ছিল। রাজা যখন কোথাও ভ্রমণরত থাকত, তখন আজবীলকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যেত। সে রাজার স্থলে রাজ্য পরিচালনা করতো, আজবীল নবী রসূলগণের শত্রু ছিল। বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াহয়া (আঃ)-কেও এ আজবীলই হত্যা করিয়েছিল। তার একজন বুদ্ধিমান পেশকার ছিল, যিনি প্রকৃত অবস্থাতেই মোমেন ছিলেন, কিন্তু নিজের ঈমানকে গোপন রাখতেন। আজবীল আরো অনেক নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, যা এ মর্দে মোমেনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বানচাল হয়ে যায়। সাতজন বনী ইসরাঈলী নবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল এবং প্রত্যেককেই সে প্রতারণা করে হত্যা

করে। বর্ণিত আছে যে, তার সত্তর জন সন্তান-সন্ততি হয়। মুজদাকী নামে রাজার একজন প্রতিবেশী ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি। তাঁর ছোট-খাট একটি বাগান ছিল। ঐ বাগানের দেখা-শুনায় ব্যস্ত থাকতেন তিনি। এ বাগান থেকেই তাঁর উপজীবিকা সংগৃহীত হতো। রাজমহলের কাছেই ছিল বাগানটি। কখনো কখনো রাজা সে বাগানে বেড়াতে যেত, পানাহার করতো। রাজা সর্বদা তার এ প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতো। কিন্তু তার স্ত্রী আজবীল সর্বদা হিংসানলে জ্বলতো এবং চক্রান্ত করে প্রতিবেশীকে হত্যার মাধ্যমে তার অতি সুন্দর বাগানটি হাতিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা করতো। কেননা, সে দেশে এ বাগানটির দারুণ খ্যাতি ছিল। কিন্তু উজব তার স্ত্রীকে এমন গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখত। এ কারণেই আজবীল তার স্বার্থোদ্ধারে ব্যর্থ হতো।

একবারের ঘটনাঃ রাজা উজব দীর্ঘ ভ্রমণে চলে যায়, আজবীল তখন এ সুযোগের সুদ্ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়, সে কিছু লোককে মুজদাকীর বিরুদ্ধে এ স্বাক্ষ্য দিতে বাধ্য করে যে, মুজদাকী রাজাকে গালি দিয়েছে, আর তখনকার বিধান অনুযায়ী রাজাকে গালি দেয়ার শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। আজবীল মুজদাকীর বিরুদ্ধে সাক্ষী ঠিক করে তাঁকে দরবারে তলব করে এবং বলে, তুমি রাজাকে গালি দিয়েছো, তিনি অভিযোগ অস্বীকার করলে, আজবীল সাক্ষী হাযির করলো, সাক্ষীরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আজবীল মুজদাকীকে হত্যার আদেশ দেয় এবং তার সুন্দর বাগানটি দখল করে নেয়।

অন্যায়ভাবে একজন নেককার ব্যক্তিকে হত্যা করায় তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের গজব আপতিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। রাজা যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করে তখন রাণী তাকে এ সংবাদ দেয়। রাজা বললো, তুমি অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছ, আমার ধারণা, আর আমরা সাফল্য লাভ করতে পারবো না, কেননা এ ব্যক্তি সুদীর্ঘ কাল ধরে আমাদের প্রতিবেশী ছিল। প্রতিবেশী হিসেবে তার হক্ব আদায় করা আমাদের কর্তব্য ছিল, কিন্তু তুমি অত্যন্ত অন্যায় ভাবে তাকে শেষ করে দিয়েছ। রাজার স্ত্রী বললো, আপনার কারণেই তো আমার রাগ এসেছে, আপনি যে নিয়ম প্রবর্তন করেছেন, আমি তো সে মোতাবেকই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। রাজা বললো, তুমি কি ধৈর্য ধারণ করতে পারলে না? তার স্ত্রী বললো, এখন তো যা হবার হয়েই গেছে।

আল্লাহ পাক হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে রাজা উজব এবং তার জাতির নিকট এ সংবাদ দেয়ার জন্যে প্রেরণ করলেন যে, আল্লাহর একজন ওলীকে হত্যা করার কারণে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি শপথ করে বলেছেন, যদি রাজা এবং তার স্ত্রী তাদের কৃত অন্যায় থেকে তওবা না করে এবং মুজদাকীর

উত্তরাধিকারীগণের নিকট তার বাগান ফেরত না দেয়, তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং ঐ বাগানের মধ্যেই তাদের উভয়ের লাশ নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদের গোশ্‌ত হাড় থেকে পৃথক করা হবে। হযরত ইলিয়াস (আঃ) রাজাকে আল্লাহ পাকের এ বাণী পৌঁছে দিলেন, কিন্তু উজব এ বাণী শ্রবণ করে অত্যন্ত রাগান্বিত হলো, সে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে বললো, তুমি আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছো, তা সঠিক নয়। এ পৃথিবীতে আরো অনেক মূর্তি পূজক বাদশাহ রয়েছে, তারা আমাদেরই মত মূর্তিপূজা করে থাকে। এতদসত্ত্বেও তারা আনন্দ উল্লাসে মত্ত রয়েছে, রাজত্ব করছে, আর যে কাজকে তুমি বাতিল এবং ভিত্তিহীন বলছো, তা করার পরও তাদের কোন ক্ষতি হয়না। এরপর রাজা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে কষ্ট দেয়ার এবং তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করলো, হযরত ইলিয়াস (আঃ) যখন উপলব্ধি করলেন যে, রাজা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে পড়েছে, তখন তিনি তাকে ছেড়ে গেলেন এবং পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় আশ্রয় নিলেন। রাজা পুনরায় 'বাআল' নামক মূর্তির পূজা শুরু করলো। বর্ণিত আছে যে, রাজার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার্থে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে একাধারে সাত বছর আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে। উজবের লোকজন তাঁকে খুঁজে ফিরত, কিন্তু তাঁর দেখা পেতনা। আল্লাহ পাক তাঁকে গোপন করে রেখেছিলেন। এভাবে সাতটি বছর অতিবাহিত হয়। আল্লাহ পাক তাঁকে বের হয়ে আসার অনুমতি দান করলেন, সে সময় রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লো, তার জীবন সম্পর্কে উজব প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিল, সে তার উপাস্য দেবতা 'বাআলের' নিকট অনেক কান্নাকাটি করে, কিন্তু তার সকল ক্রন্দন নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। অথচ উজব এবং তার সকল প্রজা ঐ মূর্তিটির পূজায় লিপ্ত ছিল। ঐ মূর্তিটির সেবায় চারশত খাদেম নিযুক্ত ছিল। মূর্তিটির পেটে ইবলিস শয়তান প্রবেশ করতো এবং কথা বলতো, যা শ্রবণ করে সেবকরা রাজাকে অবহিত করতো।

এদিকে রাজপুত্রের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। তখন রাজা পুত্রের আরোগ্য লাভের জন্যে সেবকদের কাছে ধর্ণা দিতে থাকে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়না, পূর্বে ইবলিস শয়তান মূর্তিটির পেটে প্রবেশ করতো এবং সেবকদের সঙ্গে কথা বলতো, কিন্তু এখন আল্লাহ পাক মূর্তির অভ্যন্তরে শয়তানের প্রবেশ রোধ করে দিলেন, ফলে সে আর কথা বলতে পারেনি। সেবকরা রাজাকে বলে, দেবতা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট, যদি তা না হতো তবে সে জবাব দিত। উজব জিজ্ঞাসা করলো, দেবতা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? আমি তো তার পূজা করছি। সেবকরা বললো, আপনি ইলিয়াস (আঃ)-কে এখনো হত্যা করেননি, এটিই তার অসন্তুষ্টির কারণ।

সেবকরা এ-ও বললো, আরো তো অনেক দেবতা রয়েছে, তাদের নিকট রাজপুত্রের আরোগ্য লাভ করার জন্যে আরাধনা করা দরকার। তাই কিছু সেবককে রাজা সিরিয়ার অন্যত্র প্রেরণ করে, সেবকরা যখন সেই পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে, যেখানে হযরত ইলিয়াস (আঃ) আত্মগোপন করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ পাক হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, তুমি নীচে অবতরণ কর, এদের সঙ্গে নিঃসংকোচে কথা বল। আমি তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেব। তাদের অন্তরে তোমার ভয় সৃষ্টি করবো।

নির্দেশ মোতাবেক হযরত ইলিয়াস (আঃ) অবতরণ করলেন এবং তাদেরকে দাঁড়ানোর আদেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ পাক আমাকে তোমাদের নিকট এবং যাদের নিকট থেকে তোমরা এসেছ, তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ্ পাক একটি বাণী প্রেরণ করেছেন, তোমরা এ বাণী শ্রবণ কর এবং তোমাদের রাজাকে তা শুনিয়ে দাও'। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ 'হে উজব! তুমি কি জাননা, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমিই বনী ইসরাঈলের স্রষ্টা, আমিই সকলকে রিযক দিয়ে থাকি, জীবন ও মৃত্যু আমারই হাতে, তুমি কোন্ কারণে আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক কর এবং আমাকে ব্যতীত অন্যের কাছে তোমার পুত্রের আরোগ্য লাভের জন্যে ফরিয়াদ কর। আমার ইচ্ছা না হলে কেউ কিছু করতে পারবেনা, আমি আমার পবিত্র নামের শপথ করে বলছি, পুত্রের ব্যাপারে তোমার প্রতি গজব আপতিত হবে, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, যাতে করে তুমি উপলব্ধি করতে পার যে, আমি ব্যতীত কেউ কিছু করতে পারেনা'।

হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের বাণী শ্রবণ করে রাজা উজবের প্রেরিত সেবকরা অত্যন্ত ভীত- সন্ত্রস্ত হলো এবং রাজার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো এবং একথাও বললো, আমরা যখন ইলিয়াস (আঃ)-এর সম্মুখে দন্ডায়মান হই, তখন আমাদের মন এত ভীত হয় যে, আমাদের রসনা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে। রাজা উজব এ খবর পেয়ে উপলব্ধি করলো যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) জীবিত থাকলে তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এজন্যে সে তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করলো এবং তার সম্প্রদায়ের ৫০ জন শক্তিশালী লোককে মনোনীত করে এ আদেশ দেয় যে, কোনভাবে প্রতারণা করে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে হত্যা কর। তোমরা গিয়ে তাকে বল, আমরা সকলে আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। একথা শ্রবণ করে সে তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং প্রতারিত হবে। তখন তোমরা তাঁকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। রাজার নির্দেশে তারা রওয়ানা হয়ে গেল। তারা যে পাহাড়ে তিনি ছিলেন, সে পাহাড়ে পৌঁছে ছড়িয়ে পড়লো এবং তাঁকে ডাক দিয়ে বললো, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন, আমরা আপনার

প্রতি ঈমান এনেছি, আমরা এবং আমাদের রাজা সহ সমগ্র জাতি আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা আপনার কথা মেনে চলবো, আপনি যে আদেশ দেবেন, তাই পালন করবো। আমরা আপনার অনুগত হয়েছি, অতএব, আমাদের থেকে আপনার পৃথক থাকার কোন যুক্তি নেই'।

কিন্তু তাদের এসব কথাই ছিল প্রতারণাপূর্ণ, সেজন্যে তাঁর অন্তরে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একথা এসেছে, তখন তিনি এভাবে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! যদি এরা তাদের কথায় সত্যবাদী হয়, তবে আমাকে তাদের নিকট বের হবার অনুমতি দান করুন, আর যদি তারা মিথ্যাবাদী হয়, তবে তাদের নিকট থেকে আমাকে বিরত রাখুন এবং তাদের প্রতি এমন অগ্নি বর্ষণ করুন, যাতে দগ্ধ হয়ে তারা শেষ হয়ে যায়। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আসমান থেকে অগ্নি বর্ষিত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

উজব যখন তার প্রেরিত লোকদের ধ্বংসের খবর পেল, তখনও মন্দ পথ থেকে সে বিরত হয়নি; বরং প্রতারণার উদ্দেশ্যে আরো একটি দল তৈরী করে, যা পূর্ববর্তী দলের চেয়েও বেশী শক্তিশালী ছিল। তারা পুনরায় ঐ পাহাড়ে গেল এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে ডাক দিয়ে বললো, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা আল্লাহর গজব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থী, ইতোপূর্বে যারা এসেছিল, তারা মুনাফেক ছিল। তারা আমাদের পরামর্শ ব্যতীতই আপনাকে প্রতারণার জন্যে হাযির হয়েছিল। যদি তাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে জানতাম, তবে তাদের সবাইকে হত্যা করতাম এবং আপনাকে কষ্ট করতে হতো না'।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদের কথা শ্রবণ করে পুনরায় আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, তখন আল্লাহ পাক আসমান থেকে অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, পরিণামে তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দলের ধ্বংসের খবর পেয়ে রাজার ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেল, নিজেই হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর অনুসন্ধানে বের হবার ইচ্ছা করলো, কিন্তু তার পুত্রের রোগ বৃদ্ধি পাবার কারণে তার পক্ষে তা সম্ভব হলোনা।

উজবের দরবারীদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মোমেন ছিল। রাজা তার বিশ্বস্ততা এবং যোগ্যতার জন্যে তাকেই প্রেরণ করা পছন্দ করলো এবং তার নিকট এ মনোভাব ব্যক্ত করলো যে, আমি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর প্রতি কোন প্রকার জুলুম করতে চাইনা, এদিকে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে রাজা তার নিজস্ব দলও প্রেরণ করে এবং তাদের গোপনে আদেশ দেয়, যদি ইলিয়াস (আঃ) তোমাদের সঙ্গে আসতে অপ্রস্তুত হয়, তবে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে। অন্যদিকে, ঐ মোমেন দরবারীকে বলে, আমি পূর্বে কৃত অন্যায় থেকে তওবা করেছি। আমার পুত্র অসুস্থ, আমার লোকজন আসমানী অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছে, এসবই ইলিয়াস (আঃ)-এর বদদোয়ার কারণে

হয়েছে। এমন অবস্থায় তাকে আমার চাই, তিনি আমার নিকট থাকলে, তাঁর বিধি-নিষেধ মোতাবেকই আমি চলবো। যাহোক, রাজা উজবের প্রেরিত ব্যক্তি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নিকট হাযির হলো, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ মর্মে ওহী নাযিল হলো যে, এ নেককার ব্যক্তির সঙ্গে মোলাকাত কর, তাই হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাকে সাক্ষাত দান করলেন, সে বললো, এ জালেম রাজা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছে, এরপর সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বললো, যদি আপনি আমার সঙ্গে না থাকেন, আর আমি একা যাই তবে ভয় হয় রাজা আমাকে হত্যা করবে, এখন আপনি যা হুকুম দেবেন আমি তার উপরই আমল করবো। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, আমি রাজা থেকে পৃথক হয়ে যাই এবং আপনার নিকট থেকে যাই এবং আপনার সাথী হয়ে তার মোকাবেলা করি, তাতেও আমি প্রস্তুত। কিংবা যদি আপনি আমার মাধ্যমে তার নিকট কোন বাণী প্রেরণ করতে চান, তবে তা-ও আমি পৌঁছে দেবো, আর আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন, যেন তিনি এ সমস্যার সমাধান করে দেন।

আল্লাহ পাক হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, 'হে ইলিয়াস! তুমি এ মোমেনের সঙ্গে চলে যাও, আমি তোমাদের উভয়ের হেফাযত করবো'। এ আদেশ পেয়ে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদের সঙ্গে রওয়ানা হলেন, রাজা উজবের নিকট পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে রাজপুত্রের রোগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল, এমনকি তার মৃত্যু হয়, পুত্র শোকে কাতর রাজা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবারই সুযোগ পেলোনা, হযরত ইলিয়াস (আঃ) নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ ঘটনার কয়েক দিন পর যখন মর্দে মোমেনকে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন সে বলে, আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না, কেননা রাজপুত্রের মৃত্যুর কারণে শোকে এত মুহ্যমান ছিলাম যে, কারো খবর নেয়ার অবস্থায় ছিলাম না।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) পাহাড়ে সুদীর্ঘকাল একাকী জীবন যাপন করে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন, তাঁর ইচ্ছা হয় জন-মানুষের মাঝে যেতে, পরে তিনি পাহাড় থেকে অবতরণ করেন এবং একজন ইসরাঈলী স্ত্রীলোকের বাড়িতে অবস্থান করেন, আর স্ত্রীলোকটি ছিলেন হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মাতা। সেখানে তিনি ছয় মাস আত্মগোপনে ছিলেন, তখন ইউনুস (আঃ) দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মাতা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর খেদমত নিজেই করতেন এবং তাঁকে অর্থ-সম্পদ দ্বারাও সাহায্য করতেন। কিন্তু হযরত ইলিয়াস (আঃ) যেহেতু পাহাড়ের উন্মুক্ত পরিবেশে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই গৃহের সংকীর্ণ অবস্থানে

ছয় মাসেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং পাহাড়ে চলে যাওয়াই পছন্দ করেন। এদিকে কিছুদিন পর শিশু ইউনুস (আঃ)-এর ইন্তেকাল হয়, তখন তাঁর মাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর খোঁজ করতে থাকেন। অবশেষে তাঁকে পেয়ে ইলিয়াস (আঃ)-কে বলেন, আপনি চলে আসার পর আমার একমাত্র সন্তান ইউনুস (আঃ)-এর ইন্তেকাল হয়েছে, আমার উপর এক মহা বিপদ আপতিত হয়েছে, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন এবং আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দোয়া করুন যেন, আমার পুত্র জীবিত হয়ে যায়, আমি তাকে দাফন করিনি, শুধু কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছি। হযরত ইলিয়াস (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে এ ব্যাপারে কোন আদেশ প্রদান করেননি (অর্থাৎ মৃতকে জীবিত করার জন্যে দোয়া করার অনুমতি দেয়া হয়নি), আর আমি তো একজন বন্দা মাত্র, আমি তাই করি, যার হুকুম আমাকে দেয়া হয়। একথা শ্রবণ করে ইউনুস (আঃ)-এর মাতা আরো বেশী ক্রন্দণ করতে লাগলেন, তাঁর অস্থিরতা দেখে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর মনকে আল্লাহ্ পাক স্ত্রীলোকটির আরজীর প্রতি আকৃষ্ট করলেন, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পুত্র কবে ইন্তেকাল করেছে? স্ত্রীলোকটি বললেন, সাতদিন হয়েছে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) তখন তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। সাতদিন একাধারে চলার পর স্ত্রীলোকটির গৃহে পৌঁছলেন, সেখানে চৌদ্দ দিন পূর্বে তাঁর পুত্র ইন্তেকাল করেছেন, হযরত ইলিয়াস (আঃ) অযু করে নামায আদায় করে মৃত শিশুটির জন্যে দোয়া করলেন, আল্লাহ্ পাক ইউনুস (আঃ)-কে জীবিত করে দিলেন। যখন হযরত ইউনুস (আঃ) জীবিত হয়ে উঠে বসলেন, তখন হযরত ইলিয়াস (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে স্ব-স্থানে পৌঁছে গেলেন।

এদিকে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের নাফরমানী অত্যধিক বেড়ে গেলে, তিনি তাদের উপর অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হলেন। আল্লাহ্ পাক সাত বছর পর তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, ওহী নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত ভীত ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ইলিয়াস! তোমার অন্তরে যে ব্যথা বেদনা রয়েছে এবং তুমি যে দুশ্চিন্তায় মগ্ন রয়েছ, জিজ্ঞাসা করি তুমি কি আমার ওহীর আমানতদার নও? আর পৃথিবীতে তুমি কি আমার দলিল নও? সারা পৃথিবীতে তুমি কি আমার মনোনীত ব্যক্তি নও? তোমার যা ইচ্ছা তা শুধু আমার নিকট চাও, আমি তোমাকে দান করবো, আমার রহমত অনন্ত অসীম'। হযরত ইলিয়াস (আঃ) আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ্! আমাকে মৃত্যু দিয়ে দাও, আমার পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে একত্রিত হবার সুযোগ দান কর, আমি বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার মন তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত বেশী অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে', তখন আল্লাহ্ পাক

হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন এবং এরশাদ করলেনঃ 'এটি সে দিন নয়, যখন আমি পৃথিবীকে তোমার নিকট থেকে খালি করে দেবো, পৃথিবীতে তোমার অবস্থান অনেক লোকের জন্যেই কল্যাণকর ও বরকতময় হবে, যদিও তোমাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য অতএব, এছাড়া অন্য কিছু চাও'। হযরত ইলিয়াস (আঃ) আরজ করলেন, 'যদি আমার মৃত্যু না হয় তবে আমাকে বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি দান কর'। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ 'তুমি কি চাও'? হযরত ইলিয়াস (আঃ) আরজ করলেন, 'সাত বছর যাবত বৃষ্টির ভান্ডারটি আমার কাছে দিয়ে দাও, আমার দোয়া ব্যতীত যেন আকাশে মেঘমালা দেখা না যায় এবং আমার দোয়া ব্যতীত যেন এক ফোঁটা পানিও পৃথিবীতে না পড়ে। এতদ্ব্যতীত এ দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলো অনুগত হবেনা'। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ 'হে ইলিয়াস! আমি আমার সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, যদিও তারা জুলুম করে কিন্তু আমি তাদের প্রতি দয়া করি,' তখন হযরত ইলিয়াস (আঃ) আরজ করলেন, 'তাহলে অন্তত ছয় বছরের জন্যে তাদের প্রতি বারিপাত বন্ধ করে দাও'। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ 'হে ইলিয়াস! আমি আমার সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত বেশী দয়াবান'। তখন হযরত ইলিয়াস (আঃ) আরজ করলেন, 'তাহলে অন্তত পাঁচ বছরের জন্যে বারিপাত বন্ধ করে দাও'। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ 'এ সময়টিও আমার রহমতের দাবীর বরখেলাফ, তবে হ্যাঁ তিন বছরের জন্যে বারিপাত বন্ধ করে তাদের শাস্তি বিধান করা যেতে পারে', তখন হযরত ইলিয়াস (আঃ) আরজ করলেন, 'তবে এ সময় আমি কিভাবে জীবিত থাকবো'? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ 'আমি পাখিদের এক দল তোমার সেবায় নিয়োজিত করবো, তারা তোমার খাদ্য-দ্রব্য বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে তোমাকে সরবরাহ করবে'। এরপর আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, পরিণামে অনেক জীব-জন্তু, কটি-পতঙ্গ মরে যায়, বৃক্ষগুলো শুকিয়ে যায়, মানুষ মহা বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন হযরত ইলিয়াস (আঃ) আত্মগোপন করেছিলেন, তবে তিনি যেখানেই থাকতেন তাঁর রিয্‌ক পৌঁছে দেয়া হতো, যে গৃহ থেকে খাদ্য-দ্রব্যের সুগন্ধ পাওয়া যেতো লোকেরা বুঝতো, হয়তো সেখানে হযরত ইলিয়াস (আঃ) এসেছিলেন, তারা তাঁর খোঁজ করতো, কিন্তু তাঁকে দেখতে পেতো না। একবার তিনি এক বৃদ্ধার বাড়ি অতিক্রম করছিলেন, তিনি ঐ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নিকট কোন খাদ্য-দ্রব্য আছে কি'? সে বললো, 'হ্যাঁ সামান্য আটা এবং যয়তুনের তেল আছে'। হযরত ইলিয়াস (আঃ) ঐ দু'টি বস্তুর উপর হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন, তখন তার পাত্র দুটি আটা এবং তেল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, 'এসব খাদ্যবস্তু কোথা থেকে পেলে'? তখন সে ঘটনা বর্ণনা করলো।

একবার তিনি একজন স্ত্রীলোকের বাড়িতে অবস্থান করলেন, তার পুত্র আলয়াসা ছিলেন অসুস্থ, তাঁর দোয়ায় তিনি সুস্থ হলেন, তিনি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকতে লাগলেন। আল্লাহ্ পাক হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন, 'হে ইলিয়াস! তোমার বদদোয়ার কারণে অনেক জীব-জন্তু এবং মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে', হযরত ইলিয়াস (আঃ) আরজ করলেন, 'হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি যেন তাদের পক্ষে দোয়া করতে পারি এবং তারা যে বিপদে আছে সে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে', আল্লাহ্ পাক তাঁকে এর অনুমতি দান করলেন। তখন হযরত ইলিয়াস (আঃ) বনী ইসরাঈলের নিকট গমন করে বললেন, 'তোমরা মূর্তি পূজার পাপে লিপ্ত, তোমাদের শেরক ও অন্যান্য পাপাচারের শাস্তিই তোমরা ভোগ করছো, তোমরা শেরক সহ সব পাপাচার পরিহার কর তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদের বিপদ দূর করে দেবেন'। তখন তাঁর সম্প্রদায় বললো, 'আপনি সত্য কথা বলেছেন', তারা তাদের মূর্তিগুলো নিজ নিজ ঘর থেকে বের করে ফেলে দিলো, তখন হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদের পক্ষে দোয়া করলেন, ফলে ক্ষণিকের মধ্যেই আকাশে মেঘমালা দেখা গেল, বৃষ্টিপাত হতে লাগল, মৃত শুষ্ক ধরণী জীবন্ত হয়ে উঠলো, বনী ইসরাঈলের বিপদ দূর হলো। আল্লাহ্ পাক তাদের সমস্ত কষ্ট দূর করে দিলেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা কুফর ও শেরক বর্জন করলো না, বরং পৌত্তলিকতা, কুফরী ও নাফরমানীর মধ্যেই লিপ্ত রইল।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) যখন এ অবস্থা দেখলেন, তখন বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে এদের থেকে নাজাত দাও'। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহী আসলো, 'অমুক তারিখের অপেক্ষা কর, ঐ নির্দিষ্ট দিনে অমুক স্থানে চলে যাও, সেখানে যে যানবাহন পাও তাতে আরোহন কর'। নির্দেশ মোতাবেক হযরত ইলিয়াস (আঃ) আলয়াসা (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, একটি নূরানী অশ্ব এসে দন্ডায়মান হলো, হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাতে আরোহন করলেন, অশ্বটি তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হলো। আলয়াসা (আঃ) চিৎকার করে বললেন, 'হযরত! আমার ব্যাপারে কি আদেশ'? হযরত ইলিয়াস (আঃ) আকাশ থেকে একটি লিখিত বাণী প্রেরণ করলেন, যা একথার প্রমাণ যে আলয়াসা (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলের জন্যে তিনি খলীফা নিযুক্ত করেছেন। হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর সঙ্গে এটিই ছিল আলয়াসার (আঃ) শেষ মোলাকাত। আল্লাহ্ পাক হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলের থেকে বের করে মহাশূণ্যে উত্তোলন করলেন, তাঁকে পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত করলেন এবং ফেরেশতাদের ন্যায় ডানা দান করলেন। তিনি

দুনিয়াতে মানুষ হিসেবেই জীবন যাপন করেছেন কিন্তু তাঁকে ফেরেশতাদের ন্যায় মহাশূণ্যের অধিবাসী করলেন।

এদিকে রাজা উজব এবং তার জাতির উপর আল্লাহ্ পাক এক তাগুতী শক্তিকে হামলা করার তৌফিক দিলেন। হামলাকারী বাহিনী রাজা উজব এবং তার স্ত্রীকে মরহুম মুজদাকীর বাগানে হত্যা করলো এবং তাদের লাশ ঐ বাগানেই খন্ড বিখন্ড করে ফেলে দেয়। আল্লাহ্ পাক আলয়াসা (আঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে এ সংবাদ দিলেন এবং তাঁকে রসূল মনোনীত করে বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করলেন। বনী ইসরাঈল আলয়াসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলো, তারা তাঁকে সম্মান করলো, আমৃত্যু বনী ইসরাঈলের মধ্যে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় ছিল।

সিররী এবনে ইয়াহ্‌য়া আবদুল আযীয এবনে আবিদ্দারদার সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ইলিয়াস (আঃ) এবং হযরত খিজির (আঃ) উভয়ে বয়তুল মোকাদ্দাসে রমজানের রোজা রাখেন। হজ্বের সময় প্রতি বছর একত্রিত হন। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) পৃথিবীর স্থলভাগে এবং হযরত খিজির (আঃ) সামুদ্রিক ভাগে কর্তব্যরত রয়েছেন। পাহাড়-পর্বত, অরণ্যে বা মরুভূমিতে যারা পথ হারিয়ে ফেলে, তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন হযরত ইলিয়াস (আঃ), আর খিজির (আঃ) সমুদ্র পথের মুসাফিরদের সাহায্য করে থাকেন।[১]

এবনে আসাকের কা'ব (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, চারজন নবী বর্তমানে জীবিত রয়েছেন, দু'জন দুনিয়াতে, দু'জন আসমানে। দুনিয়াতে হলেন হযরত ইলিয়াস (আঃ) এবং হযরত খিজির (আঃ), আর আসমানে রয়েছেন হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ইদ্রিস (আঃ)।

এবনে আসাকের আরো লিখেছেন, হযরত খিজির (আঃ) এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ) প্রত্যেক বছর হজ্বের সময় একত্রিত হন।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলাম, এক স্থানে আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করলাম। সেখানে মরুভূমিতে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আমাকে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্তর্ভুক্ত কর। আমি লক্ষ্য করলাম যে, লোকটি দৈর্ঘে হবে প্রায় তিনশত হাত; বরং তার চেয়েও বেশী। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৫৩-৬৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৩৯-৪০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০

'তুমি কে'? আমি বললাম, আনাস-হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খাদেম। লোকটি বললো, 'তিনি কোথায়'? হযরত আনাস (রাঃ) বললেন, 'তিনি নিকটেই রয়েছেন, আপনার কথা শ্রবণ করছেন'। তখন লোকটি বললেন, 'তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাও এবং বল, আপনার ভাই ইলিয়াস (আঃ) আপনাকে সালাম দিচ্ছেন'। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে এ সংবাদ দিলে তিনি বের হয়ে এসে ঐ ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁরা উভয়ে বসে কথা বললেন'। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি বছরে একদিন আহার করি, আর এটি স্বভাবগত ব্যাপার, আজ আপনি এবং আমি এক সঙ্গে আহার করি', এরপর আসমান থেকে খাবার নাযিল হলো, তাতে ছিল রুটি, মাছ এবং অন্যান্য দ্রব্য। তাঁরা উভয়ে খাবার গ্রহণ করলেন এবং আমাকেও খেতে দিলেন এবং এক সঙ্গে উভয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন, আমি দেখলাম, তিনি মেঘমালা পার হয়ে আকাশের দিকে চলে যাচ্ছেন'।[১]

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

'স্মরণ কর সে সময়কে যখন ইলিয়াস (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলো, 'তোমরা কি ভয় কর না'? হযরত ইলিয়াস (আঃ) এভাবে 'বা'লাবাক' নামক স্থানের অধিবাসী বণী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের এবং আল্লাহ পাককে ভয় করার আহবান জানিয়েছিলেন।

যেহেতু তাঁর জাতি 'বাআল' নামক একটি মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল, মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করতো, তাই তাদেরকে ভর্ৎসণা করে হযরত ইলিয়াস (আঃ) বলেছিলেন–

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ ۝

'তোমরা কি 'বাআল' নামক মূর্তিকে ডাক? আর সেই সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তাকে ত্যাগ কর'?

অর্থাৎ একটি হাতে বানানো মূর্তি যার নামকরণ করা হয়েছে 'বাআল', তোমরা তার পূজা কর? অথচ যিনি তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, রিয্‌কদাতা, ভাগ্যানিয়ন্তা তাঁকে পরিত্যাগ কর?

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১০-১১

অর্থাৎ এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজ কি হতে পারে? যে, তোমরা প্রাণহীন জড় পদার্থের তৈরী মূর্তির সম্মুখে মাথা নত কর, তার পূজা-অর্চনা কর অথচ তোমাদের জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব যাঁর দান তাঁকে ভুলে যাও!

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ۞

যিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের একমাত্র প্রতিপালক, যিনি শুধু তোমাদেরই স্রষ্টা নন, বরং তোমাদের সকল পূর্ব পুরুষেরও তিনি একমাত্র পালনকর্তা, তোমরা সেই মহান আল্লাহ পাকের নাফরমানী কর? এর চেয়ে বড় কোন অপরাধ হতে পারে না।

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্যেরই জীবন্ত নিদর্শন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁকে বাদ দিয়ে যে মূর্তিকে তোমরা ডাক সে শুধু যে তোমাদের কোন উপকার করতে পারেনা তাই নয়, বরং সে তার নিজেরই কোন সাহায্য করতে সক্ষম নয়। অতএব, কোন্ যুক্তিতে তোমরা সেই অসহায় মূর্তির পূজা করতে যাও?

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ۞

'কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা জ্ঞান করে, পরিণামে তারা অবশ্যই পাকড়াও হয়ে আসবে'।

অর্থাৎ হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জাতি তাঁর উপদেশ গ্রহণ তো দূরের কথা, বরং তারা তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করলো। তবে তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তি অবশ্যই তাদেরকে ভোগ করতে হবে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হবে, তখন তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শাস্তি কত ভয়াবহ হয়!

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ۞

'তবে আল্লাহ পাকের মনোনীত বন্দাগণ এর ব্যতিক্রম'। অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দা হবে তাদের মর্যাদা এবং সম্মান হবে অতুলনীয়। তাদেরকে আল্লাহ পাকের রহমতে সসম্মানে জান্নাতে পৌছানো হবে।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ۞

'আমি পরবর্তী লোকদের মধ্যে তার জন্যে স্মরণ রেখে দেই' অর্থাৎ পরবর্তীতে সে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং সর্বত্র অভিনন্দিত হবে।

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْيَاسِيْنَ۝

'ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۝

'নিশ্চয় আমি এভাবেই নেককারগণের প্রতিদান দিয়ে থাকি', পরবর্তীতে হযরত ইলিয়াস (আঃ) সর্বত্র প্রশংসিত এবং অভিনন্দিত থাকবেন, এটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত শুভ পরিণতি। উল্লেখ্য, 'ইলিয়াস' এবং 'ইলিয়াসীন' শব্দটি সমার্থক।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ۝

'নিশ্চয় সে আমার নেককার বান্দাগণের অন্যতম'।

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۝

'নিশ্চয় লূতও আমার রসূলগণের অন্যতম'।

এ আয়াত থেকে এ পর্যায়ের পঞ্চম ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর ভ্রাতঃস্পুত্র, তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূলগণের অন্যতম।

إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ
دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى
ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾
فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾
لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ
سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ
مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾

তরজমা

(১৩৪) (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন আমি তাকে এবং তার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তাদের সকলকেই উদ্ধার করলাম।

(১৩৫) কিন্তু তার সে বৃদ্ধা (স্ত্রী) ব্যতীত, কেননা সে (আযাবে) নিপতিতদের মধ্যে রয়ে যায়।

(১৩৬) এরপর আমি অবশিষ্ট লোকদেরকে সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম।

(১৩৭) আর নিশ্চয় তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষ গুলো সকাল বেলায় অতিক্রম করে থাক।

(১৩৮) এবং রাত্রিকালেও, তবুও কি তোমরা সত্য অনুধাবন করবে না?

(১৩৯) আর নিশ্চয় ইউনুস রসূলগণের অন্যতম।

(১৪০) (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন তিনি পলায়ন করে (যাত্রী) বোঝাই নৌকার নিকট পৌঁছলেন।

(১৪১) এরপর লটারী করলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন।

(১৪২) এরপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলে এবং তিনি নিজেকে তিরস্কার করছিলেন।

(১৪৩) যদি তিনি (তখন) আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ না করতেন,

(১৪৪) তবে তিনি মাছের উদরেই কেয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করতেন।

(১৪৫) এরপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম একটি ময়দানে, আর তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

(১৪৬) এবং আমি তার উপর একটি লতাযুক্ত গাছ উৎপন্ন করি।

(১৪৭) এবং তাকে আমি এক লক্ষ অথবা তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের নিকট প্রেরণ করি।

(১৪৮) এবং তারা ঈমান এনেছিল, ফলে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আমি তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে দেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত লূত (আঃ)-এর কথা শুরু করা হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে তাঁর এবং তাঁর জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ۝

'(স্মরণ কর সে সময়কে) যখন আমি তাকে এবং তার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট ছিল, তাদের সকলকেই উদ্ধার করলাম'।

اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ۝

'কিন্তু সে বৃদ্ধা (স্ত্রী) ব্যতীত, কেননা সে (আযাবে) নিপতিতদের মধ্যেই রয়ে যায়'।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ۝

'এরপর আমি অবশিষ্ট লোকদেরকে সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম'।

হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় 'সদুম' নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। তারা মূর্তি পূজা করতো এবং জঘন্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত লূত (আঃ)-কে প্রেরণ করেন, কিন্তু তারা হেদায়েত গ্রহণ করেনি, তাই তাদের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ, তাদের প্রতি আসমানী গজব নাযিল হয়েছে।

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ۝ وَبِالَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝

'আর নিশ্চয় তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষ গুলো সকাল বেলায় অতিক্রম করে থাক, তবু কি তোমরা সত্য অনুধাবন করবেনা'?

আলোচ্য আয়াতে اِنَّكُمْ বলে মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে, হে মক্কাবাসী! তোমরা সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত 'সদুম' নামক স্থানটি সকাল-সন্ধ্যায় দেখতে পাও। হযরত লূত (আঃ)-এর জাতিকে এ স্থানেই শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাদের অন্যায় অনাচার, দৌরাত্ম এবং অশ্লীলতাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যদি তাদের মত তোমরাও অন্যায় অনাচার অব্যাহত রাখ, তবে শাস্তি অবধারিত।[১]

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۝

'আর নিশ্চয় ইউনুস রসূলগণের অন্যতম'।

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ۝

'(স্মরণ কর সে সময়কে) যখন তিনি পলায়ন করে (যাত্রী) বোঝাই নৌকায় পৌঁছলেন'।

এটি এ পর্যায়ের ষষ্ঠ ঘটনা। اَبَقَ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো গোলাম মনিবের নিকট থেকে পলায়ন করেছে। যেহেতু হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত তাঁর জাতিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাই اَبَقَ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম আহমদ (রঃ) 'আজ যোহদে' এবং আবদুর রাজ্জাক, আবদ এবনে হোমায়েদ এবং এবনুল মুনজের তাউসের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত ইউনুস (আঃ) তাঁর জাতিকে হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, এরপর তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাবের ভয় প্রদর্শন করেন এমনকি, আযাব কবে আসবে, তার সময়ও নির্দিষ্ট করে দেন। আযাব আপতিত হতে বিলম্ব হয়,তিনি আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষা না করে বের হয়ে পড়েন। নদী তীরে গিয়ে একটি তরীতে আরোহণ করেন। কিন্তু নদীবক্ষে তরীটি অস্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে যায়। তখন নৌকার মাঝিরা বলে, নৌকায় কোন পলাতক গোলাম রয়েছে, যে কারণে এ অবস্থা। এরপর কে সেই পলাতক গোলাম তা চিহ্নিত করতে নৌকা যাত্রীরা লটারীর ব্যবস্থা করে। তিনবার লটারী করা হয়। প্রত্যেকবারই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নাম আসে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) থেকেও একথা বর্ণিত হয়েছে।

১। হযরত লূত (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩১৩-১৬ ও খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-৩০৯-১৪

আল্লামা বগভী (রঃ) আরো লিখেছেনঃ একথাও বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইউনুস (আঃ) নদীর তীরে পৌঁছলেন, তখন সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং দু' পুত্র ছিল। তরীতে আরোহণের জন্যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সম্মুখে রওয়ানা করে দিলেন। কিন্তু তিনি তরীতে আরোহণের স্থলে নদীতে পড়ে গেলেন এবং একটি ঢেউ তাঁকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। আরেকটি ঢেউ এসে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে গেল। কনিষ্ঠ পুত্র নদীর তীরে ছিল। তাকে হিংস্র জন্তু নিয়ে গেল। তিনি একা অন্য একটি তরীতে আরোহণ করলেন। তরীর এক কোণে তিনি নীরবে বসেছিলেন।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝

'এরপর লটারী করলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন'।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝

'এরপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে এবং তিনি নিজেকে তিরস্কার করছিলেন'।

যেহেতু লটারীতে পলাতক গোলাম হিসেবে তাঁর নামই বারবার আসে, তাই তিনি নিজেই নিজেকে নদীতে ফেলে দিলেন। একথা ভেবে যে, যদি আমার জীবন শেষও হয়ে যায়, তবে নৌকার অন্য আরোহীরা বেঁচে যাবে। আল্লাহ পাকের হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে।

فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

'যদি তিনি (তখন) তসবীহ পাঠকারীদের মধ্যে না হতেন, তবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের উদরেই থাকতে হতো'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'তসবীহ পাঠকারী' অর্থ হলো নামায আদায়কারী।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো এবাদতকারী, আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তিনি মাছের পেটে ইশারায় নামায আদায় করেছেন। সাধারণতঃ এর ব্যাখ্যা করা হয় এভাবে যে, তিনি মাছের পেটে 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সোবহানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনাজ জোয়ালেমীন', এ দোয়াটি পাঠ করতেন।

তসবীহ পাঠের মাধ্যমে বিপদ দূরীভূত হয়

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের নামের পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে তথা তসবীহ পাঠের মাধ্যমে বিপদাপদ দূরীভূত হয়। হযরত ইউনুস

(আঃ)-এর বিপদ দূরীভূত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর এ তসবীহ পাঠই উপকারী হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যদি তিনি তসবীহ পাঠ না করতেন, তবে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁকে মাছের পেটেই অবস্থান করতে হতো। অর্থাৎ মাছের পেটেই তাঁর মৃত্যু হতো। তিনি তার অংশে পরিণত হতেন।

বর্ণিত আছে, ঐ মাছটির প্রতি আল্লাহ পাকের হুকুম হয়েছিল, ইউনুস তোমার রিয্‌ক নয়; বরং আমানত, তার হেফাজত তোমার কর্তব্য।[১]

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاۤءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۝

'এরপর আমি তাকে (মাছের পেট থেকে বের করে) ময়দানে ফেলে দিয়েছি, সে ছিল অসুস্থ'।

হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে কতদিন ছিলেন, এ ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে।

মোকাতেল, এবনে হাব্বান বলেছেন, তিনি মাছের পেটে তিন দিন ছিলেন।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং কাতাদা (রঃ) একথারই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আতা (রঃ) বলেছেন, সাতদিন তিনি মাছের পেটে অবস্থান করেন। এবনে আবি হাতেম সাঈদ এবনে যোবায়েরের (রঃ) একথারই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

যাহ্যাক (রঃ)-এর মতে, এ সময়সীমা হলো বিশ দিন। কালবী (রঃ) এবং মোকাতেল এবনে সোলায়মান (রঃ) বলেছেন, ৪০ দিন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), এবনে জোরায়েয (রঃ), আবি মালেক (রঃ) এবং একরামা (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের উদরে ৪০ দিন ছিলেন।[২]

এবনে আবি হাতেম, হাকেম এবং বগভী (রঃ) ইমাম শা'বী (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-কে সকালে (চাশ্‌তের নামাজের সময়) মাছ গিলে ফেলে এবং সন্ধ্যার সময় তাঁকে সমুদ্রের তীরে বের করে দিয়েছিলো। সমুদ্র আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর সৃষ্টির এক বিশাল ভান্ডার, সমুদ্রে এত বিরাট মাছ থাকে যার ভেতরে নামাজ আদায় করাও কঠিন নয়, তফসীরে রুহুল মাআনীর গ্রন্থকার আল্লামা আলুসী (রহঃ) যিনি ইরাকের অধিবাসী ছিলেন, তিনি লিখেছেনঃ ইরাকের দজলা নদীতে আমি এমন বিরাট আকারের মাছ স্বচক্ষে দেখেছি আর এ ঘটনাটিও দজলা নদীতেই ঘটেছিলো।[৩]

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১২৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৪৫
৩। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৪৫

এতদ্ব্যতীত, এসব কিছুই হয়েছে এক আল্লাহ পাকের হুকুমে, আর আল্লাহ পাকের সকল ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর হয়। বর্ণিত আছে, হযরত ইউনুস (আঃ) স্বভাবতই অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করতেন, আর মাছের উদরে পৌঁছার পর আরও অধিক পরিমাণে তিনি তসবীহ পাঠ করেন।

আল্লামা আলুসী (রহঃ) লিখেছেন, মাছের উদরে প্রবেশের পর প্রথমতঃ তিনি ধারণা করেছেন যে. তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, পরে তিনি দেখলেন তাঁর পা নাড়াতে পারেন, তাই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদায় রত হলেন এবং বললেন–

يَا رَبِّ اتَّخَذْتُ لَكَ مَسْجِدًا فِىْ مَوْضَعٍ لَمْ يَسْجُدْ فِيْهِ اَحَدٌ

'হে পরওয়ারদেগার! আমি এমন স্থানকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছি, যেখানে কেউ কোনদিন পৌঁছেনি'।

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর তসবীহ এবং জিকরের বরকতেই আল্লাহ পাক তাঁকে মাছের পেট থেকে নাজাত দিয়েছিলেন।

ইরাকের মুসেল প্রদেশের 'নাইনুয়া' নামক শহরে সে স্থানটি আজও রয়েছে নির্দিষ্ট, যেখানে মাছ আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁকে উদ্গীরণ করেছে। মাছের পেটে অবস্থানের কারণে পানাহার ও বায়ুর অভাবে হযরত ইউনুস (আঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দেহে রৌদ্র কিরণ পড়া, মাছি বসা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে সহনীয় ছিল না, তাই পরম করুণাময় আল্লাহ পাক তাঁর আরামের জন্যে যে ব্যবস্থা করলেন, তা লক্ষ্যণীয়ঃ

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ۝

'এবং আমি তাঁর উপর একটি লতা যুক্ত গাছ উৎপন্ন করি,' আর এটি ছিল একটি কদুর গাছ. তার বড় বড় পাতার ছায়ায় রৌদ্র কিরণ থেকে তিনি রক্ষা পান এবং মাছিও তাকে স্পর্শ করে না. ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

তফসীরকাগণ লিখেছেন, কদু গাছের বৈশিষ্ট্য হলো এই, মাছি তার কাছেও আসে না। কদুর গাছটি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ পাক তাবু হিসাবে ব্যবহার করেছেন।[১]

আল্লাহ পাক ঐ অসহায় অবস্থায় হযরত ইউনুস (আঃ)-এর পানাহারের এ ব্যবস্থা করেছিলেন যে, একটি পাহাড়ী বকরীর প্রতি আদেশ হয়েছিল যেন সকাল ও

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৫১

সন্ধ্যায় হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নিকট হাযির হয় এবং তিনি যেন তার দুধপান করতে পারেন। বকরীটি প্রতিদিন আল্লাহ পাকের হুকুমে নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর নিকট হাযির হতো। তিনি তার দুধ পান করতেন।[১]

এবনে আবি হাতেমে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত ইউনুস (আঃ) যখন মাছের পেটে অবস্থান কালে দোয়া ইউনুস পাঠ করছিলেন, তখন এ দোয়া আল্লাহ পাকের আরশ পর্যন্ত চলে যায়। ফেরেশতারা আরজ করে, হে পরওয়ারদেগার! এ আওয়াজটি অনেক দূর থেকে আসছে, তবে এ আওয়াজটি আমাদের পরিচিতি, আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ এ আওয়াজটি কার? ফেরেশতারা আরজ করলো, না, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, এ আওয়াজ হলো আমার বন্দা ইউনুসের, ফেরেশতারা বললো, ইনি সেই ইউনুস (আঃ) যাঁর নেক আমল সমূহ এবং দোয়া সর্বদা আসমানে উত্থিত হতো, হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি তুমি দয়া কর, তাঁর দোয়া কবুল কর, যখন সে আরামে ছিল তখন সে তোমাকে স্মরণ করতো, আজ সে বিপদগ্রস্ত অতএব, বিপদ থেকে তাঁকে নাজাত দাও। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, আমি তাঁকে নাজাত দেবো, এরপরই আল্লাহ পাক মাছকে আদেশ দিলেন, তাঁকে মরুভূমিতে ফেলে দিতে, এভাবে হযরত ইউনুস (আঃ)-কে আল্লাহ পাক নাজাত দিলেন।[২]

আর যখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন আল্লাহ পাক তাঁকে তাঁর জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করলেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউনুস (আঃ) যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন, দেহে শক্তি ফিরে এলো তখন তিনি নিদ্রিত হলেন, কিন্তু জাগ্রত হয়ে দেখলেন, তাঁর উপর ছায়া স্বরূপ কদু গাছটি শুষ্ক হয়ে পড়েছে এবং রৌদ্রের কিরণ তাঁর উপর পড়ছে, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন, তখন আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ)-এর মারফত এই বাণী প্রেরণ করলেন যে, এই গাছটির জন্যে তো তুমি ক্রন্দণ করছো, কিন্তু তোমার উম্মতের এক লক্ষ মানুষের জন্যে চিন্তা কর না, যারা মুসলমান হয়েছে এবং তওবা করেছে।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿۱۴۷﴾

'এবং তাকে আমি এক লক্ষ অথবা তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের নিকট প্রেরণ করি'।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৪৭
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৪৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭

আসমানী গজব দূরীভূত হলো

ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আঃ) 'নাইনুয়া'বাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। যখন তাঁর উম্মত তাঁর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করেন, আযাব আসতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি মনে করেছেন, তাঁর উম্মত তাঁকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করবে, সেজন্যে তিনি তাদের নিকট থেকে সরে এসে তরীতে আরোহণ করেছিলেন। এরপর তাঁর জাতি যখন দেখল যে, আল্লাহর আযাবের আলামত সমূহ প্রকাশ পাচ্ছে, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়, আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করে তওবা করে, ইসলাম কবুল করে, ফলে আল্লাহ পাক আসন্ন আযাব দূরীভূত করলেন, এজন্যেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, কোন জনপদ আযাব আপতিত হবার পর উপকৃত হতে পারেনি, ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায় ব্যতীত। কেননা, আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করেন, অন্যদিকে হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ পাকের রহমতে সুস্থ হয়ে তাঁদের নিকট ফিরে আসেন।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

'এবং তারা ঈমান এনেছিল, ফলে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আমি তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে দেই'।

অর্থাৎ আযাবের আলামত দেখার পর তারা যখন ঈমান আনলো, তখন আল্লাহ পাক নিশ্চিত আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করলেন।

আলোচ্য আয়াতে যে এক লক্ষ বা তদুর্দ্ধ লোকের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা ইরাকের মুসেল প্রদেশের 'নাইনুয়া' বাসীই ছিল।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এরা সে সব লোক ছিলনা, যাদের নিকট ইতোপূর্বে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন; বরং এরা ছিল নতুন সম্প্রদায়, সংখ্যায় যারা লক্ষাধিক ছিল।

সংখ্যা এক লক্ষের উর্দ্ধে কত ছিল, এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার।

অন্য সূত্রে এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এক লক্ষের উপর ত্রিশ হাজার।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এক লক্ষের চেয়ে সতের হাজার বেশী।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নির্দেশের অপেক্ষা না করে তাঁর জাতিকে ছেড়ে চলে গেলেন, যার কারণে তাঁকে মাছের উদরে পর্যন্ত যেতে হলো, এমন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে কোন নবীর শানে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করা কি বৈধ?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন, কোন নবীর ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করা আদৌ বৈধ নয়; কেননা তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতিও আল্লাহ্ পাকের দিকে তাঁদের অধিকতর মনোনিবেশ করার এবং তাঁদের মর্তবার উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি কোন নবীর কোন কর্মের উপর আপত্তিকর মন্তব্য করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

'আমরা নবী রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা'।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন বন্দার জন্যে একথা বলা বৈধ নয় যে, আমি ইউনুস এবনে মাতা থেকে উত্তম।

বোখারী শরীফে সংকলিত অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি একথা বলে যে, আমি ইউনুস এবনে মাতা থেকে উত্তম, সে ভুল বলে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা নবী রসূলগণের মধ্যে পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রাধান্য দিওনা।

এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, কোরআনে করীমেই রয়েছে–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

'সেই রসূলগণ, আমি তাদের পরস্পরকে পরস্পরের উপর ফজিলত দিয়েছি'।

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে যাঁকে যে ফজিলত দেয়া হয়েছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কারো

জন্যে নবী রসূলগণের একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার অধিকার নেই। যেমন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কেয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সর্দার থাকবো, আর এতে কোন গর্ব নেই। তিনি আরো এরশাদ করেছেন, আমিই কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম সুপারিশ করবো, আর আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে। এমনি আরো বহু হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।[১]

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ
إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾
وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ
مُبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

তরজমা

(১৪৯) (হে রসূল!) এখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার প্রতিপালকের জন্যেই কি রয়েছে কন্যা সন্তান? আর তাদের জন্যে পুত্র সন্তান?

(১৫০) অথবা আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা তা দেখছিল?

(১৫১) নিশ্চয় তারাই বরং নিজেদের মনগড়া কথা বলে যে,

(১৫২) আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন, আর নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯

(১৫৩) তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন?

(১৫৪) তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর?

(১৫৫) তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

(১৫৬) অথবা তো যাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে?

(১৫৭) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর।

(১৫৮) আর তারা আল্লাহ পাক ও জ্বীন জাতির মধ্যেও বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জ্বীনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্যে অবশ্যই হাযির করা হবে।

(১৫৯) তারা যা বলে, আল্লাহ পাক তা থেকে পবিত্র, মহান।

(১৬০) আল্লাহ পাকের মনোনীত বন্দাগণ অবশ্য এর ব্যতিক্রম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে তৌহীদের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছিল। এরপর তৌহীদের আহবায়ক কয়েকজন নবী রসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে পুনরায় তৌহীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুশরেকদের ভ্রান্ত ও বাতিল আকীদার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা, মুশরেকরা শুধু যে শেরক ও কুফরে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তাদের কয়েকটি গোত্র যথা জোহায়না, বনী সালমা, খাজাআ এবং বনী মালিহ মনে করতো যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান (নাউজুবি ল্লাহি মিন জালিক)। এটি ছিল মুশরেকদের চরম মূর্খতা, কেননা আল্লাহ পাক বংশীয় সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, পবিত্র। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করতে যে, কেন তারা এমন অযৌক্তিক, অসুন্দর এবং অবাস্তব কথা বলে? যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার আদেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنٰتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ۝

'(হে রসূল!) এখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার প্রতিপালকের জন্যেই কি রয়েছে কন্যা সন্তান? আর তাদের জন্যে পুত্র সন্তান'?

মুশরেকরা এভাবে কয়েকটি মিথ্যা উক্তি করেছে যেমন, আল্লাহ পাকের সম্পর্কে সন্তানের কথা, সে সন্তানও কন্যা এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান বলা, এসবই মিথ্যা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুশরেকদের নির্বোধ হবার কথা বলেছেন, অর্থাৎ তারা এমন কথা বলে, যা কোন বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আর এ নির্বোধদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা তিনি পছন্দ করেননি; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুনঃ তোমরা কোন্ যুক্তিতে, কোন্ বিবেচনায় আল্লাহ পাকের জন্যে সন্তান স্থির করলে? আর তা-ও আবার কন্যা সন্তান! যদি তিনি সন্তান ধারণের ইচ্ছা করতেন, তবে কি পুত্র সন্তানের স্থলে কন্যা সন্তানই গ্রহণ করতেন? সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের শানে এমন বেআদবী পূর্ণ মন্তব্য করার পূর্বে তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাককে ভয় করা, বংশধারা তাদেরই হয়, যাদের ক্ষয় আছে, লয় আছে, আল্লাহ পাক সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর এমন সম্পর্কের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। এমনি সমস্ত দুর্বলতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতের সম্পর্ক পূর্ববর্তী অন্য একখানি আয়াতের সাথে, তা হলোঃ

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا

'(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান জমিন সহ সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন'?

যখন তারা এ সত্য স্বীকার করে যে, বিশাল বিস্তৃত জমীন এবং ঝুলন্ত নীলাভ আকাশ, ভূবন উজ্জ্বলকারী সূর্য এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করা তাদের সৃষ্টি থেকে অনেক বেশী কঠিন, এমন অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তাদেরকে যে কোন মুহূর্তে সমুচিত শাস্তি দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় হাযির করাও আদৌ কঠিন কিছুই নয় এবং বাস্তবে প্রত্যেকটি মানুষকে অবশেষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতেই হবে।

আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পুনরায় আদেশ দিয়েছেন যে, এ কাফের মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আপনার প্রতিপালকের জন্যে তারা কন্যা সন্তান কেন স্থির করেছে, যা তুলনামূলক ভাবে দুর্বল। এতদ্ব্যতীত, তারা আল্লাহর ফেরেশতাদেরও অবমাননা করেছে। তারা বলেছে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান। তাই পরবর্তী আয়াতে এ মিথ্যা বানোয়াট উক্তিরও প্রতিবাদ করা হয়েছেঃ

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شَاهِدُوْنَ۝

'অথবা আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা তা দেখছিল'?

অর্থাৎ আমি যখন ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, তারা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিল? প্রশ্নটি বিদ্রুপাত্মক, আর এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবাহী যে এরা সম্পূর্ণ মূর্খ, তাদের মূর্খতার কারণেই তারা এমন উদ্ভট কথাবার্তা বলে।

أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ۝ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ۝

'নিশ্চয় তারাই বরং নিজেদের মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহ্ পাক সন্তান জন্ম দিয়েছেন আর নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী', এর চেয়ে বড় কোন মিথ্যা হতে পারেনা; বুদ্ধিমান মাত্রেরই নিকট একথাটি সম্পূর্ণ অসত্য, বানোয়াট।

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ۝ مَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُونَ۝ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۝

তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর? তবে কি তোমরা বিবেক বুদ্ধি দ্বারা চালিত হবেনা? তোমরা কি এ বিষয়ে আদৌ চিন্তা করনা যে, আল্লাহ্ পাক এমন সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর সম্পর্কে এমন দুর্বলতার কথা চিন্তাও করা যায় না।

أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ۝ فَأْتُوا بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ۝

'অথবা তোমাদের নিকট কি কোন সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে'?

অর্থাৎ তোমরা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ কর এবং যে বাতিল আকীদায় বিশ্বাস কর যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর সন্তান, এর স্বপক্ষে তোমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে কী? যদি তোমরা একথায় সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থাপন কর।

سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ

এমন কোন সুস্পষ্ট দলিল যা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ط

'আর তারা আল্লাহ্ পাক ও জ্বীন জাতির মধ্যেও বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে কোরায়শের তিনটি গোত্র সম্পর্কে। তারা হলো সুলায়েম, খাজাআ এবং জুহাইনা গোত্র। এসব গোত্রের লোকেরা এমন ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাসী ছিল।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الجنة। শব্দটি দ্বারা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ফেরেশতা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, 'জ্বীন' শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো 'গোপন থাকা', এজন্যে الجِنَّة। শব্দটি এ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এরা ফেরেশতাদেরই একটি দল, আর ইবলিস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আর এজন্যে তাদেরকে 'জ্বীন' বলা হয়। আর তাদেরকেই মুশরেকরা আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান বলে আখ্যা দিত।

কোন কোন মক্কাবাসী যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান বললো, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাদের মাতা কে'? তারা বললো, 'পরীরাই হলো তাদের মাতা'। (বায়হাকী)

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۝

'অথচ জ্বীনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্যে অবশ্যই হাযির করা হবে'।

আলোচ্য আয়াতের نسب শব্দটি বংশীয় সম্পর্ক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ শব্দটি প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আয়াতের মর্মকথা হবে, কাফেররা জ্বীনদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধারণা করে।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۝

'তারা যা বলে, আল্লাহ পাক তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, মহান'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি হওয়া এবং জ্বীনদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রভৃতি থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ۝

'কিন্তু আল্লাহ পাকের মনোনীত বন্দাগণ অবশ্যই এর ব্যতিক্রম'।

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখে এবং পূর্ণ আন্তরিকতা এবং

একাগ্রতার সাথে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করে, সে সব নেককার বন্দাগণই আল্লাহ পাকের রহমত লাভে ধন্য হবে। এতদ্ব্যতীত, কেয়ামতের কঠিন দিনের বিপদ থেকে কেউ রক্ষা পাবেনা।

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ
صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ
الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾
لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾
فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ
الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ
الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

তরজমা

(১৬১) অতএব, তোমরা এবং যাদের তোমরা পূজা কর,

(১৬২) তোমরা কেউই কাউকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা।

(১৬৩) তবে যে কেউ দোযখে প্রবেশকারী হবে শুধুমাত্র তাকেই।

(১৬৪) আর আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে।

(১৬৫) আর নিশ্চয় আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান রয়েছি।

(১৬৬) এবং আমরা অবশ্যই তাঁর তসবীহ পাঠকারী।

(১৬৭) তারাই তো বলে এসেছে,

(১৬৮) যদি আমাদের নিকট পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবের ন্যায় কোন কিতাব থাকত,

(১৬৯) তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ বন্দা হতাম।

(১৭০) এরপর তারা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করে এবং অতি শীঘ্রই তারা (এর পরিণতি) জানতে পারবে।

(১৭১) আমার প্রেরিত বন্দাগণের সম্পর্কে পূর্বেই স্থির হয়ে রয়েছে যে,

(১৭২) তারা অবশ্যই সাহায্য লাভ করবে।

(১৭৩) আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।

(১৭৪) অতএব, (হে রসূল!) কিছুকালের জন্যে আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন।

(১৭৫) আপনি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন, অচিরেই তারা (পরিণতি) প্রত্যক্ষ করবে।

(১৭৬) তবে কি তারা আমার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চায়?

(১৭৭) এরপর যখন শাস্তি তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন সতর্কিতদের প্রভাত হবে অত্যন্ত মন্দ।

(১৭৮) অতএব (হে রসূল!) কিছুকালের জন্যে আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন।

(১৭৯) (হে রসূল!) আপনি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন, অচিরেই তারা (পরিণতি) প্রত্যক্ষ করবে।

(১৮০) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক মহান মর্যাদা সম্পন্ন এবং তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

(১৮১) এবং রসূলগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

(১৮২) আর সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের জন্যে।

তফসীরুল কোরআন

কাফেরদের ধারণা ছিল যে, ফেরেশতাদের হাতে রয়েছে নেক আমলের দায়িত্ব, আর জ্বীনদের হাতে রয়েছে পাপকার্যের দায়িত্ব। তারা ইচ্ছা করলে মানুষকে দিয়ে পাপ বা পূণ্য কাজ করিয়ে নিতে পারে, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত পাপ পূণ্যের ক্ষেত্রে

কারো কোন ক্ষমতা নেই, তোমরা এবং যাদের তোমরা পূজা কর, সবাই সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করেও আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবেনা। শুধু সে-ই পথভ্রষ্ট হবে, যার দোযখী হবার কথা আল্লাহ পাকের এলমে রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে মক্কাবাসীকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা জ্বীনদের সঙ্গে আল্লাহ পাকের আত্মীয়তার কথা বলেছ (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক), কিন্তু তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যরা মিলেও কাউকে আল্লাহ পাকের মর্জির খেলাফ পথভ্রষ্ট করতে পারবেনা, তবে আল্লাহ পাকের এলম মোতাবেক যার দোযখী হওয়া নির্ধারিত রয়েছে, সে-ই শুধু তোমাদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হবে।

وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ۝

'আর আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে'।

ফেরেশতাগণের অবস্থান

ফেরেশতাদের সম্পর্কে মুশরেকরা যে সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলতো, তার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে এবং ফেরেশতাগণের ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর বন্দেগীর ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করাই আমাদের কাজ।

অথবা এর অর্থ হলো, আসমানে আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে, যার পরিবর্তন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, যেখানে প্রত্যেকটি ফেরেশতা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! আসমানে চার আঙ্গুলের সমান স্থানও এমন নেই, যেখানে কোন ফেরেশতা আল্লাহ পাককে সেজদা করছেনা। (বগভী)

অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো, প্রত্যেক ফেরেশতার জন্যেই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নৈকট্যের একটি মর্তবা সুনির্দিষ্ট রয়েছে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আবুবকর ওয়াররাক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ এর অর্থ হলো, বন্দেগীর মকাম যেমন ভয়, আশা, মহব্বত, ভালবাসা, সন্তুষ্টি প্রভৃতি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো ফেরেশতাদের জন্যে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। এর মধ্যে কম-বেশী হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

পক্ষান্তরে, মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়। মানুষ সর্বদা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের পথে উন্নতি করতে থাকে। যেমন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমার বন্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য-ধন্য হতে থাকে, এমনকি, তার সাথে আমার মহব্বত হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যখন থেকে ইস্রাফিল (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে দন্ডায়মান রয়েছেন। কখনো উপরের দিকে চোখ তুলে দেখেন না। তার মধ্যে এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে, যদি ঐ পর্দার কাছেও ইস্রাফিল (আঃ) যায়, তবে জ্বলে শেষ হয়ে যাবে। (তিরমিজী)

وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ۝

'আর নিশ্চয় আমরা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি'। একথাটিও ফেরেশতা-গণের। তারা তাদের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ পাকের বন্দেগীর সময় অথবা তাঁর আদেশ শ্রবণ কালে আমরা কাতারবন্দী হয়ে দন্ডায়মান থাকি।

এবনে আবি হাতেম এজীদ এবনে মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হবার পূর্বে লোকেরা বিক্ষিপ্ত ভাবে নামায আদায় করতো, অর্থাৎ কাতারবন্দী হতোনা, কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নামাযের সময় কাতারবন্দী হবার নির্দেশ দিলেন।

এবনুল মুনজের এবং এবনে জোরায়েযও এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

কালবী (রঃ) বলেছেন, আসমানে ফেরেশতাগণ নামাযের সময় এভাবেই কাতারবন্দী হয়, যেভাবে জমীনে মানুষ কাতারবন্দী হয়ে নামাযে দন্ডায়মান হয়।

হযরত যাবের এবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা ফেরেশতাদের ন্যায় কাতারবন্দী হও না কেন? আমরা আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ফেরেশতারা কিভাবে কাতারবন্দী হয়? তিনি এরশাদ করলেন, ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারগুলোকে সর্ব প্রথম পুরো করে এবং পরস্পর মিলেমিশে দাঁড়ায়। আয়াতের মর্মকথা হলো, আমরা আল্লাহ পাকের আনুগত্য এবং বন্দেগী করার সময় কাতারবন্দী হয়ে থাকি।

وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ۝

'আর নিশ্চয় আমরা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকি' তথা তাঁর তসবীহ পাঠে রত থাকি। তিনি যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি', খুঁত, ক্ষয়-ক্ষতি যথা সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে মুক্ত এবং পবিত্র এসব কথা ঘোষণা করে থাকি। কাফের মুশরেকদের মত আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করিনা; শুধু এক আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী করি, তাঁর তসবীহ পাঠে রত থাকি এবং তাঁর প্রতি সর্বক্ষণ অনুগত থাকি।[১]

এভাবে ফেরেশতাগণ নিজেই আল্লাহ পাকের অনুগত বন্দা হবার কথা স্বীকার করে, অতএব ফেরেশতাগণ কখনও উপাস্য হতে পারেনা। যারা ফেরেশতাদেরকে উপাস্য মনে করে অথবা যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে নির্লজ্জ মিথ্যা কথা বলে, তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। যেখানে ফেরেশতারা নিজেরাই বলে, আমাদের অবস্থান নির্দিষ্ট এবং আমাদের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে, আমরা আল্লাহ পাকের অনুগত, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে রত রয়েছি, এর কোন প্রকার ব্যতিক্রম করার সাধ্য আমাদের নেই। এ অবস্থায় ফেরেশতাদের সম্পর্কে অন্য কোন কথা বলা বা কোন প্রকার ধারণা পোষণ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ۝ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ۝ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ۝

'এবং তারাই তো বলে এসেছে, 'যদি আমাদের নিকট পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবের ন্যায় কোন কিতাব থাকত, তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ বন্দা হতাম'।

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে মক্কার কাফেররা একথা বলতো, যদি আমাদের নিকট পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় আসমানী গ্রন্থ নাযিল হতো, তবে আমরাও তার উপর আমল করার সুযোগ পেতাম এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় বন্দা হতে পারতাম, কিন্তু যখন পবিত্র

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৪৯

কোরআন নাযিল হলো এবং তাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো, তখন তারা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত নবীকে অমান্য করে তারা তাদের সর্বনাশ ডেকে আনলো। তাদের কুফরী ও নাফরমানীর পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, তা তারা অচিরেই জানতে পারবে।

কুফরী ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি মৃত্যুর সময় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে দুনিয়ার জীবনেও আযাব আপতিত হয়, যেমন মক্কার কাফেররা বদরের যুদ্ধে তাদের সমুচিত শাস্তি পেয়েছে এবং মক্কা বিজয়ের দিন তাদের সকল অহংকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তারা দুনিয়াতেই তাদের অপকর্মের শোচনীয় পরিণতি দেখে নিয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কাবাসী সম্পর্কে, তারাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আর্বিভাবের পূর্বে বলতো যে, বনী ইসরাঈলের মত যদি আমাদের নিকটও কোন নবী রসূল আগমন করতেন এবং কোন জ্ঞান-গ্রন্থ নাযিল হতো, তবে আমরা তার উপর আমল করে আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় বন্দা হতে পারতাম। কিন্তু যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন, আসমানী গ্রন্থ নাযিল হলো, তখন তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করলো।[১]

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۞

'আর আমার প্রেরিত বন্দাগণের সম্পর্কে পূর্বেই স্থির হয়ে রয়েছে যে, তারা সাহায্য লাভ করবে। আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, মক্কার কাফেরদের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেকই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়, কিন্তু মক্কার কাফেররা তাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছে, তাই আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেরদের বিরোধিতায় নবী রসূলগণের কিছুই যায় আসেনা, কেননা বহু পূর্বেই আল্লাহ পাকের এ সিদ্ধান্ত স্থির

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১৯-২০

হয়ে রয়েছে যে, তাঁর প্রেরিত নবী রসূলগণকে আল্লাহ পাক সাহায্য করবেন। আর যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করে, তার আর কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ কারো বিরোধিতাও তাদের সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনা। অতএব, মক্কাবাসী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে কষ্ট দিয়েছিল, তা তাঁর সাফল্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি, কেননা সত্যের জয় সুনিশ্চিত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ۝

'আর নিশ্চয় আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী'।

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, বিজয় মুসলমানদের জন্যে সুনির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফৌজ কখনো পরাজিত হয়না। কেননা তারা আল্লাহ পাকের মদদপুষ্ট হয়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ

'আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, আমার ও আমার রসূলের বিজয় অবশ্যম্ভাবী'। আর অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا

(নিশ্চয় আমি সাহায্য করবো আমার রসূলগণকে, আর যারা আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করে তাদের বিজয় হয় সুনিশ্চিত।) প্রকাশ্যে বিজয়ের কোন উপকরণ না থাকলেও নবী রসূলগণের বিজয় থাকে সুনির্ধারিত। পৃথিবীর ইতিহাস একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ۝

'অতএব, (হে রসূল!) কিছুদিনের জন্যে আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন'। তারা যে জুলুম অত্যাচার করছে, তার উপর সবর অবলম্বন করুন। সামান্য কয়েক দিনের ব্যাপার, এরপরই আসবে আল্লাহ পাকের সাহায্য। ধরা-পৃষ্ঠ থেকে এ অবাধ্য কাফেরদের চিরবিদায় করা হবে। যেমন মক্কার কাফেরদেরকে হিজরতের মাত্র এক বছর পরই সমুচিত শাস্তি দেয়া হয়েছিল। এজন্যে তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের حين শব্দটি দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিন উদ্দেশ্য করা

হয়েছে। অর্থাৎ কিছুকাল অপেক্ষা করার যে নির্দেশ এ আয়াতে রয়েছে তা কতদিন? এর জবাবেই তফসীরকারগণ বদরের যুদ্ধের দিন পর্যন্ত বলেছেন।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম, সুদ্দী (রঃ)-এর তরফ থেকে এ ব্যাখ্যারই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, জেহাদের আদেশ নাযিল হওয়া পর্যন্ত কাফেরদেরকে উপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

وَّأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۝

'(হে রসূল!) আপনি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন, অচিরেই তারা (পরিণতি) প্রত্যক্ষ করবে'।

মুসলিম জাতির বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

অর্থাৎ আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের সাহায্য অতি আসন্ন, আল্লাহ পাক বিজয় দানের যে অঙ্গীকার করেছেন তা পূরণ. হতে আর অধিক বিলম্ব নেই, সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী এবং নেককার মুসলমানদের শুভ পরিণতিও সুনিশ্চিত।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এজালাতুল খেফা'য় লিখেছেন যে, এ আয়াতে মুসলিম জাতির বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী রয়েছে এ মর্মে যে, ইসলামের দুশমনরা অদূর ভবিষ্যতে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে। আর তাদের মোকাবেলায় আল্লাহ পাকের বাহিনী তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করবে এবং বিজয়ী হবে। আর বিজয়ের এ সুসংবাদ শুধু নবী রসূলগণের জীবনেই বাস্তবায়িত হবে এমন নয়; বরং তাঁদের পরেও এ বিজয় আসবে। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক ঐতিহাসিক বিজয় দান করেছিলেন। তদানীন্তন পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ সেদিন মুসলমানদের করতলগত হয়েছিল। মাত্র এক যুগের মধ্যে পারশ্য এবং রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের হাতে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল এমনকি, প্রায় দেড় হাজার বছর পর আজো পৃথিবীর ৫২টি রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতেই রয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে বর্তমান পৃথিবীর ১৪০ কোটি মানুষ মুসলমান। এসব কিছু আলোচ্য আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তবায়ন।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন এ আয়াত- فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (অচিরেই তারা দেখতে পাবে) নাযিল হলো তখন কাফেররা জিজ্ঞাসা করলো, এ আযাব কবে আসবে? কবে আমরা আমাদের পরিণতি দেখতে পাব? তখন নাযিল হলোঃ

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ۝

'তবে কি তারা আমার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চায়'? তাদের জানা উচিত যে, তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে তাদের তাড়াহুড়া করা উচিত নয়, কেননা আযাবের দিন তাদের জন্যে হবে অত্যন্ত বড় বিপদের দিন।

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ۝

'এরপর যখন শাস্তি তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন সতর্কিতদের প্রভাত হবে অত্যন্ত মন্দ'।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বর অভিযানের সময় (সপ্তম হিজরীতে অনুষ্ঠিত) রাত্রিকালে সেখানে পৌঁছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি নিয়ম ছিল, যদি কোন দুশমনের বিরুদ্ধে অভিযান করতেন তবে রাত্রেই সেখানে পৌঁছতেন, কিন্তু সকাল পর্যন্ত দুশমনের উপর হামলা করতেন না। সকাল হলে ইহুদীরা তাদের কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখে বলতে শুরু করে, আল্লাহর শপথ! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেনঃ 'আল্লাহু আকবর, খায়বর ধ্বংস হয়েছে, আমরা যখন তাদের আঙিনায় অবতরণ করেছি, তখন তাদের দিন অত্যন্ত মন্দ হয়েছে'। (বগভী)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন জনপদের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেন তখন সকাল হওয়ার আগে হামলা করতেন না, বরং সকাল হওয়ার অপেক্ষা করতেন, যদি সে জনপদ থেকে আযানের শব্দ শ্রবণ করতেন, তবে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শ্রবণ না করতেন তবে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতেন। আমরা রাত্রিকালে খায়বর পৌঁছি, সকাল হলো এবং খায়বরের কোন জনপদ থেকে আযান শ্রুত হলোনা, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যানবাহনের উপর আরোহণ করলেন, খায়বরবাসী তখন কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে বের হয়, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখে বললো, আল্লাহর শপথ! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী সহ, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহু আকবর, খায়বর ধ্বংস হয়েছে, আমরা যখন কোন দুশমনের আঙিনায় পৌঁছি তখন তাদের প্রভাত হয় অত্যন্ত মন্দ, কেননা অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়, আর তাদেরকে ইতোপূর্বে ভয় প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু তারা সতর্ক হয় না।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝

'অতএব, (হে রসূল!) কিছুকালের জন্যে তাদেরকে আপনি উপেক্ষা করুন, (হে রসূল!) আপনি তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকুন। অচিরেই তারা (পরিণতি) প্রত্যক্ষ করবে'।

ইতোপূর্বে একথাটি বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে দ্বিতীয়বার বলা হলো। কথা একটি হলেও প্রসঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন। ইতোপূর্বে এ কথাটি বলা হয়েছে সত্য-সাধক নবী রসূলগণের সুনিশ্চিত বিজয় সম্পর্কে, আর আলোচ্য আয়াতে একথাটি বলা হয়েছে বাতিল পন্থীদের অনিবার্য শাস্তি সম্পর্কে। তাই যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি মনে হয়, কিন্তু মর্মের দিক থেকে এর তাৎপর্য ভিন্ন।

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۝
وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

'(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক মহান মর্যাদা সম্পন্ন এবং কাফেররা যা বর্ণনা করে তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, এবং রসূলগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের জন্যে'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াত সমূহে আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য স্থান পেয়েছে। আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা সর্ব প্রকার খুঁত, ত্রুটি এবং কলংকের অনেক উর্দ্ধে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। কাফের মুশরেকরা এ সম্পর্কে যে সব অলীক মন্তব্য করে তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। হে নবী! আপনার পরওয়ারদেগার মহান মর্যাদার অধিকারী। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, কাফের মুশরেকরা তাঁর সম্পর্কে যে সব ভিত্তিহীন মন্তব্য করে, তিনি সেসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সমস্ত নবী রসূলগণের প্রতি, আর তাঁদের অনুসরণেই রয়েছে শান্তির পথ। যাঁদের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়া যায়, তাঁদের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের জন্যে। বন্দার কর্তব্য হলো, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি শোকর গুজার হওয়া।

বিশেষতঃ এ নেয়ামতের জন্যে যে, আল্লাহ পাক দয়া করে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি তাঁর নবী রসূলগণের সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের দুশমনদেরকে ধ্বংস করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাতের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। رب শব্দটি দ্বারা আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ রহমত এবং হেকমতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং عزة শব্দটি দ্বারা তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত এবং সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর يصفون এর মাধ্যমে একদিকে তিনি যে কাফের মুশরেকদের বর্ণিত ভিত্তিহীন কথাবার্তা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র তা ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, যারা নেককার, ঈমানদার, তত্ত্বজ্ঞানী তাদের সত্য-উপলব্ধির সকল শক্তিরও উর্দ্ধে তিনি-একথা يصفون এর দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ আরো বলেছেন, এ কয়েকটি বাক্যে দ্বীন ইসলামের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ মুশরেক ও কাফেররা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তাদের মূর্খতাপ্রসূত যেসব মন্তব্য করে, তা থেকে তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তৌহীদের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নবী রসূলগণের প্রতি সালামের কথা এবং তাঁদের মাহাত্মের কথা ঘোষণা করে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের জন্যে' একথা বলে আল্লাহ্ পাকের অসীম নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তা'লিম দেয়া হয়েছে। এভাবে তৌহীদ, রেসালত এবং শোকর গুজারীর শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কারো ইচ্ছা হয় যে, কেয়ামতের দিন তাকে পরিপূর্ণ পরিমাপে সওয়াব দেয়া হোক, তবে তার কর্তব্য হলো প্রত্যেক মজলিস থেকে ওঠার সময় যেন তার শেষ কথা হয়ঃ[১]

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۝ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ۝
وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ۝

আলহামদুলিল্লাহ! আজ মঙ্গলবার ১৬ রবিউসসানী, ১৪১৬হিঃ মোতাবেক ১২ সেপ্টেম্বর সূরা আস্ সাফ্‌ফা-তের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর এ মহান সাধনা। আমীন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৯৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৫৯
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩২০-২১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ছোয়াদ

سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ① بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ②

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ③

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের নামে (শুরু করছি)

তরজমা

(১) ছোয়াদ, পবিত্র কোরআনের শপথ, যা উপদেশে পরিপূর্ণ।

(২) বরং কাফেররা ঔদ্ধত্য ও সত্য বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে।

(৩) তাদের পূর্বে আমি অনেক সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করেছি, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছিল, কিন্তু তখন নিস্কৃতি লাভের কোন সময় ছিলনা।

সূরা ছোয়াদ প্রসঙ্গে

এ সূরা ছোয়াদ মক্কা শরীফে অবতীর্ণ। আয়াত-৮৮, বাক্য-৭৩২, অক্ষর-৩,০৬৬।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে।

এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে সকল গুনাহ থেকে রক্ষা করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে তৌহীদ ও রেসালতের আলোচনার উপর, আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং শানের বর্ণনা দ্বারা, যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত ও নবুওয়্যতের দলিল।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী সূরায় পূর্বকালের কয়েকজন সত্য-সাধক নবী রসূলগণের ঘটনা স্থান পেয়েছে। এমনিভাবে এ সূরায়ও হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং হযরত আইউব (আঃ)-এর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ পূর্ববর্তী সূরার শেষে কাফেরদের একথার উদ্ধৃতি রয়েছে–

لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ

'মক্কার কাফেররা বলতো, 'যদি আমাদের নিকট কোন উপদেশমূলক গ্রন্থ নাযিল হতো, তবে আমরা পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় আল্লাহ পাকের খাঁটি বন্দা হতে পারতাম'। তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতেই পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে এবং এ সূরার শুরুতে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, 'পবিত্র কোরআনের শপথ! যা উপদেশে পরিপূর্ণ'।[১]

শানে নুযুল

আহমদ, তিরমিজী, নাসায়ী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আবু তালেব যখন অসুস্থ হয় তখন কোরায়শ নেতারা তাকে দেখতে আসে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও আগমন করেন, তখন কোরায়শ আবু তালেবের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আবু তালেব বলেন, 'হে আমার ভ্রাতঃস্পুত্র! 'তুমি লোকদের কাছে কি চাও'? তিনি বললেন, 'আমি শুধু একটি কথার স্বীকৃতি চাই যার কারণে সারা আরব তাদের অনুগত হবে এবং পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষ তাদেরকে কর আদায় করবে'। আবু তালেব বলেন, 'সেই একটি কথা কি'? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা,

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০

তিনিই রিয্কদাতা এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রসূল)। কোরায়শ বললো, সে-তো সকল উপাস্যকে এক উপাস্য করে ফেলেছে। তখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

তফসীরুল কোরআন

صٓ

অন্যান্য 'মোকাত্তায়াত' অক্ষরের ন্যায় এর অর্থও একমাত্র আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন (এ সম্পর্কে তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম খন্ডে আলোচনা হয়েছে)। অবশ্য তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, ص অক্ষরটি আল্লাহ পাকের একটি পবিত্র নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন صمد অথবা صَادِقُ الْوَعْدِ থেকে ص নেয়া-হয়েছে। অথবা صدق محمد فى كل ما اخبر به عن الله থেকে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ ص ব্যবহৃত হয়েছে صدق الله অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক সত্যই বলেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, ص অর্থ হলো صدق محمد رسول الله অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, ص এর পরের و অব্যয়টি শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর জবাব এখানে উহ্য রয়েছে, আর তা হলো, '(হে রসূল!) আপনি অবশ্যই সত্যবাদী' অথবা 'এই কোরআন অবশ্যই সত্য'।[১]

وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ۞

'পবিত্র কোরআনের শপথ, যা উপদেশে পরিপূর্ণ', যা জ্ঞানগর্ভ, মহা মূল্যবান গ্রন্থ। যার মহান শিক্ষাই তার সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন আকীদা ও বিশ্বাস, বিধি-নিষেধ, ঈমানদারদের জন্যে শুভ-পরিণতি, কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী এবং অতি মূল্যবান উপদেশে সমৃদ্ধ রয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯০৬

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'জিকর' শব্দটি দ্বারা অতি উচ্চ মর্যাদা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ মহা মূল্যবান এবং সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন গ্রন্থ হলো পবিত্র কোরআন। যে সব কাফের পবিত্র কোরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করেনা এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করে, তারা এর কোন ত্রুটির জন্যে তা করেনাঃ

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ۝

'বরং কাফেররা ঔদ্ধত্য ও সত্য বিরোধিতায় লিপ্ত'।

অর্থাৎ তারা তাদের অহংকার এবং বিদ্বেষের কারণেই পবিত্র কোরআনের সত্যতায় অবিশ্বাস করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে। যদি তাদের এ দম্ভ, অহমিকা, বিদ্বেষ ও সত্য বিরোধিতা থেকে তারা রেহাই পেত, তবে পবিত্র কোরআনের সত্যতায় অবশ্যই বিশ্বাস করতো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকেও অস্বীকার করতো না।

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ۝

'তাদের পূর্বে আমি অনেক সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করেছি, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছিল, কিন্তু তখন নিস্কৃতি লাভের কোন সময় ছিলনা'।

এ পৃথিবীতে ইতোপূর্বে এমনিভাবে বহু জাতি সত্যদ্রোহিতা এবং ঔদ্ধত্যের কারণে ধ্বংস হয়েছে। তারাও এভাবে নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছিল, পরিণামে যখন তাদের উপর আযাব এসেছে তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছে, কিন্তু তা তাদের জন্যে উপকারী হয়নি; তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। মক্কার কাফেররাও যদি এভাবে তাদের আত্মগরিমা এবং সত্য বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে তাদেরকেও অনুরূপ ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে, তখন তাদের হাহাকার আর্তনাদও কোন কাজে আসবেনা।

وَعَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٌ
كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾
وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا
لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ۖ إِنْ هَٰذَا إِلَّا
اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن
ذِكْرِي ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿٨﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ
الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾

তরজমা

(৪) তারা বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছেন, আর কাফেররা বলে, এ ব্যক্তি যাদুকর, মিথ্যাবাদী।

(৫) সে কি বহু মা'বুদের পরিবর্তে একজন মাত্র মা'বুদই স্থির করে নিয়েছে? নিশ্চয় এটি এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

(৬) তাদের কয়েকজন প্রধান একথা বলে সরে পড়ে যে, তোমরা বলে যাও একথা এবং তোমাদের দেবতাদের পূজায় অবিচলিত থাক, নিশ্চয় এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।

(৭) আমরা পূর্ববর্তী কোন দ্বীনে এমন কথা শ্রবণ করিনি, এটি একটি মনগড়া উক্তি মাত্র।

(৮) আমাদের সবার মধ্যে কি তারই প্রতি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হলো? বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা আমার কোরআন সম্পর্কে সন্দিহান; বরং তারা এখনো আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।

(৯) (হে রসূল!) আপনার পরম শক্তিশালী এবং মহান দাতা প্রতিপালকের ভান্ডার কি তাদেরই নিকট রয়েছে?

(১০) অথবা আসমান জমীন এবং তাদের অর্ন্তবর্তী সব কিছুর উপর কি তাদেরই রাজত্ব রয়েছে? যদি থাকে তবে তারা সিড়ি বেয়ে (আসমানে) আরোহণ করুক।

(১১) বহুদলের এ বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।

তফসীরুল কোরআন

وَعَجِبُوٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز

'তারা বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, মক্কার কাফেররা তাদের ঔদ্ধত্য এবং সত্য-বিরোধিতার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে অবিশ্বাস করেছে। আর এ আয়াতে তাদের ভ্রান্ত ধারণার আরো বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। কাফেররা এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করছে যে, আমাদের মধ্য থেকেই একজন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নবুওয়্যতের দাবী করে বসলেন, তিনি তো আমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, আকৃতি ও প্রকৃতিতে তাঁর এবং আমাদের মাঝে দৃশ্যতঃ কোন পার্থক্য নেই, অথচ তিনি আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছেন, এ-তো নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার! যদি এমন হতো যে, আসমান থেকে কোন ফেরেশতা অবতরণ করে তাঁর সম্পর্কে কোন খবর দিত, তবুও একটা যুক্তির কথা ছিল, এমনও তো নয়; এতদ্ব্যতীত, লোকটি আসলে যাদুকর, সে নবুওয়্যতের দাবী করছে, তার যাদুর ভেল্কিকে মোজেযা বলছে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)।

وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝

'আর কাফেররা বলে, এ ব্যক্তি যাদুকর, মিথ্যাবাদী'।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেনঃ এ স্থলে আল্লাহ পাক قالوا যদি বলতেন তবে এ মর্ম প্রকাশে তা যথেষ্ট হতো, কিন্তু তিনি قال الكٰفرون বলেছেন, এর দ্বারা কাফেরদের মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও মানবতার সার্বিক কল্যাণের কথা বলেন, এসব কথা কখনো যাদুকররা

বলেনা, যাদুকরের কথা এবং নবী রসূলের কথায় যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা অনুধাবন করার শক্তিও এ মূর্খ কাফেরদের ছিলনা।

মূলতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনটি কথা বলেছেন (এক) তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ অর্থাৎ এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা এক আল্লাহ পাক, (দুই) নবুওয়্যত ও রেসালত অর্থাৎ আল্লাহ পাকই মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন; তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, তাঁর কাজ হলো মানুষের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছে দেয়া এবং মানুষকে হেদায়েত করা। (তিন) মানুষকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সতর্ক করা।

কাফেরদের নিকট এর প্রত্যেকটি কথাই ছিল বিস্ময়কর। তৌহীদের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে তারা বলেছে–

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝

'সকল মা'বুদের পরিবর্তে সে কি একই মা'বুদ ঠিক করে নিয়েছে? নিশ্চয় এটি হলো বিস্ময়কর ব্যাপার'।

কাফেররা এ সত্যও উপলব্ধি করতে পারেনি যে, এ বিশাল পৃথিবী একজন মাত্র স্রষ্টা পরিচালনা করেন, এটি কি করে সম্ভব? তাদের পূর্ব পুরুষরা তো অনেক ঠাকুর দেবতার পূজা করেছে, অনেক উপাস্যের সম্মুখে মাথানত করেছে, তারা সারা জীবন এই তো দেখে এসেছে, আর নবুওয়্যতের দাবীদার এই ব্যক্তি বলছেন, এসব কথা মিথ্যা, এক আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন সমগ্র বিশ্ব জগৎকে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, আর কাফেররা অতিশয় হতাশা বোধ করলো, ওলীদ এবনে মগীরাহ পঁচিশ জন আরব সর্দারকে একত্রিত করলো এবং পরস্পরের পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, তারা সমবেতভাবে আবু তালেবের নিকট তাদের দাবী দাওয়া পেশ করবে। পরামর্শ মোতাবেক সবাই আবু তালেবের নিকট হাযির হলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো, 'আপনি দয়া করে আপনার ভ্রাতঃস্পুত্র এবং আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন', আবু তালেব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে খবর দিলে তিনি তশরীফ আনলেন, আবু তালেব তাঁকে বললেন, 'হে আমার ভ্রাতঃস্পুত্র! তোমার সম্প্রদায় তোমার নিকট কিছু আবেদন জানাতে চায়, তুমি তাদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী রায় দিওনা', তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম কোরায়শকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা আমার নিকট কি চাও'? তারা বললো, 'তুমি আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে কিছু বলোনা, আমরাও তোমাকে তোমার মা'বুদের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করবো না'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে একটি কথার ওয়াদা কর, যার কারণে তোমরা সারা আরবের উপর ক্ষমতা বিস্তার করবে এবং অনারব বিশ্বও তোমাদের অনুগত হবে'। আবু জেহেল বললো, 'যদি এমন অবস্থা হয় তবে একটি নয়, দশটি কথা মানতে সম্মত রয়েছি'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা বলো,'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই) একথা শ্রবণ করেই সমস্ত লোক উঠে গেল এবং বললো–

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا........

'সে কি সব মা'বুদের স্থলে এক মা'বুদ স্থির করে ফেলেছে? নিশ্চয় এটি হলো বিস্ময়কর ব্যাপার'।[১]

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ

'তাদের কয়েকজন প্রধান একথা বলে সরে পড়ে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাদের পূজায় অবিচলিত থাক'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কলেমায়ে তৈয়্যেবার দাওয়াত শ্রবণ করে কাফের সর্দাররা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং একে অন্যকে বলে, তোমরা তোমাদের মূর্তিপূজায় অবিচল থাক, এ ব্যক্তির প্রচারে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করোনা, এর বিরোধিতার জন্যে সর্ব প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। তারা আরো বলে,

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۞

'নিশ্চয় এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক'।

অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং এক আল্লাহর বন্দেগীর জন্যে আহবান করেন, এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত, নিশ্চয় এতে তাঁর কোন স্বার্থ রয়েছে, আমরা কোন অবস্থাতেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হতে দেবনা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৫৩

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ বাক্যটির ব্যাখ্যা হলো কোরায়শ নেতারা বলেছে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেননা এটিই আল্লাহ পাকের মর্জি। কাজেই তাঁকে বাধা দিয়ে রাখা যাবেনা, তিনি অপ্রতিরোধ্য।[১]

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ

'আমরা পূর্ববর্তী কোন দ্বীনে এমন কথা শ্রবণ করিনি, এটি একটি মনগড়া উক্তি মাত্র'।

অর্থাৎ কাফেররা বলে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যে তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আমাদেরকে আহবান জানায়, আমরা ইতোপূর্বে কোন ধর্মে তৌহীদের কথা শ্রবণ করিনি'।

আলোচ্য আয়াতের (পূর্ববর্তী কোন দ্বীন) দ্বারা কোন্ ধর্মকে বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), কালবী (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা খৃষ্ট ধর্মকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ছয়শ' বছর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করেছিলেন।

অতএব, 'পূর্ববর্তী দ্বীন' বলতে ঈসায়ী বা খৃষ্ট ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। আর ঈসায়ীরা তৌহীদে বিশ্বাস করেনা, তারা বিশ্বাস করে ত্রিত্ববাদে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, 'পূর্ববর্তী দ্বীন' বলতে আরবদের পূর্ব পুরুষের দ্বীনকে বোঝানো হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, ইতোপূর্বে সর্বশেষ নবীর এবং সর্বশেষ ধর্মের যে অপেক্ষা করা হচ্ছিল, তাতে তৌহীদের কথা থাকবে, তা তো কখনো শুনিনি।

তবে অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন, 'পূর্ববর্তী দ্বীন' বলতে কোরায়শ সর্দাররা তাদের পিতা পিতামহদের ধর্মকেই উদ্দেশ্য করেছে, অর্থাৎ আমাদের পিতা-পিতামহরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি এবং এ সম্পর্কে কোন কথাও শ্রবণ করেনি।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৭৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৪

অথবা এ ধর্মের পূর্বে এসেছে খৃষ্ট ধর্ম। খৃষ্টানরাও তো একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা। অতএব, একথাটি এ ব্যক্তির মনগড়া কথা, যদি খৃষ্টানরাও তৌহীদে বিশ্বাস করতো, তবে আমরা বিষয়টি ভেবে দেখতাম।[১]

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ط

'আমাদের সকলের মধ্যে কি তাঁরই প্রতি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হলো? বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা আমার কোরআন সম্পর্কে সন্দিহান, বরং তারা এখনো আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি'।

কাফেররা বলে, যদি আল্লাহ পাক কোন নবী প্রেরণের ইচ্ছা করেও থাকেন, তবে আমাদের মধ্যে এর চেয়ে অনেক ধনী এবং সম্মানিত ব্যক্তি ছিল, তাদেরই নিকট তাদের কাউকে নবী মনোনীত কতে পারতেন, তিনি যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেই নবী করে প্রেরণ করবেন, একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা।

কাফেরদের এ ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথার জবাবই রয়েছে পরবর্তী বাক্যেঃ

بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ج

'বরং তারা আমার কোরআন সম্পর্কেই সন্দিহান'।

অর্থাৎ এ কাফেররা শুধু যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করে তাই নয়; বরং তারা আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআনের সত্যতা সম্পর্কেই সন্দেহ পোষণ করে। তাদের এ কুফরী ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে তাদেরকে যে সতর্ক করা হচ্ছে, তাতেও তারা বিশ্বাস করেনা। এর কারণ এই, তারা আল্লাহর আযাব এখনো দেখেনি; এজন্যেই তাদের এমনি বাড়াবাড়ি। যদি আসমানী গজব তারা দেখত তবে তাদের এ অবস্থা হতোনা, যদি তারা কখনো আল্লাহর আযাব আস্বাদন করে, তবে তাদের ঔদ্ধত্য-বিদ্বেষ এবং সন্দেহ চিরতরে দূরীভূত হয়ে যাবে।

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝

'(হে রসূল!) আপনার পরম শক্তিশালী এবং মহান দাতা প্রতিপালকের ভান্ডার কি তাদেরই নিকট রয়েছে'?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৪
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯০৭

যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে, তারই জবাবে এরশাদ হয়েছে যে, মহান দাতা এবং মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের ভান্ডার কি তাদের হাতেই রয়েছে যে, তাদের যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দেয়া হবে? এমনতো নয়; বরং নবুওয়্যত আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন। তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারেনা, কাকে তিনি নবী মনোনীত করবেন তা তিনিই ভাল জানেন, আল্লাহ পাকের নবী মনোনয়নের ব্যাপারে কারো সাথে পরামর্শ করারও প্রয়োজন নেই এবং কারো নিকট কৈফিয়ত দেয়ারও দরকার নেই, এটি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার, এতে নাক গলাবার অধিকার কারোই নেই।

মূলতঃ নবুওয়্যত আল্লাহ পাকের দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা; কেননা তিনি মহা পরাক্রমশালী, আর তিনি মহান দাতা।

أَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْأَسْبَابِ ۞

'অথবা আসমান জমীন এবং তাদের অর্ন্তবর্তী সব কিছুর উপর কি তাদেরই রাজত্ব রয়েছে? যদি থাকে তবে তারা সিঁড়ি বেয়ে (আসমানে) আরোহন করুক'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাদের হাতে কি আল্লাহর রহমতের ভান্ডার রয়েছে যে, যাকে ইচ্ছা তাকে নবুওয়্যত দিয়ে দেবে? আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, রহমতের ভান্ডারের কথা থাক, তাদের হাতে কি আসমান জমীনের এবং এর মধ্যেকার কোন কিছুর কর্তৃত্ব রয়েছে? বিশ্ব সৃষ্টির উপর তাদের কি কোন আধিপত্য রয়েছে? যদি থাকে, তবে তারা দড়ি ঝুলিয়ে বা সিঁড়ি বেয়ে আসমানে আরোহণ করুক, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অহরহ যে ওহী নাযিল হয় তা বন্ধ করার চেষ্টা করুক এই কাফেররা, যদি তা না পারে আর তা কখনো পারবেও না, তবে ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুক।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'আসবাব' শব্দটির অর্থ হলো আসমানের দরজা এবং এক আসমান থেকে অন্য আসমানে যাওয়ার পথ। এ বাক্যটিতে রয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী যে, তারা এমন ভিত্তিহীন কথা বলে, যার কঠিন শাস্তি অবধারিত।

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ

'বহু দলের এ বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে'।

অর্থাৎ ইতোপূর্বে যেমন যুগে যুগে নবী রসূলগণের বিরোধিতাকারীরা ধ্বংস হয়েছে, তেমনি মক্কার এ কাফেররাও অনুরূপ পরিণতি ভোগ করবে তথা এদের ধ্বংসও অনিবার্য।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহর রসূল! মক্কার কাফেররা যত বাড়াবাড়িই করুক না কেন, অবশেষে তাদের পরাজয় এবং ধ্বংস অবধারিত।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতে বদরের রণাঙ্গণে কাফেরদের যে পরাজয় হয়েছিল তারই সুসংবাদ রয়েছে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করেছেনঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

'অচিরেই কাফেরদের দল পরাজিত হবে এবং তারা পলায়ন করবে'।

অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতেও কাফেরদের পরাজয়ের ইঙ্গিত রয়েছে, যা বদরের দিন বাস্তবায়িত হয়েছিল, কেননা সত্যের জয় সব সময় হয়। আর অসত্যের পরাজয় থাকে অবধারিত।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৬৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩২৩

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾
وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَّأَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ۚ أُولٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِنْ
كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ
إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا
عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ اِصْبِرْ عَلٰى مَا
يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১২) তাদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ জাতি এবং পেরেকধারী ফেরাউনও রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।

(১৩) আর সামুদ জাতি, লুতের জাতি এবং আইকাবাসীও (রসূলগণকে) মিথ্যা জ্ঞান করেছে। তারা ছিল বিরাট বিরাট বাহিনী।

(১৪) তাদের প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, পরিণামে (তাদের ব্যাপারে) আমার আযাব সাব্যস্ত হয়েছিল।

(১৫) এই কাফেররা তো শুধু মাত্র একটি হুংকারেরই অপেক্ষা করছে, যাতে কোন বিরাম থাকবেনা।

(১৬) আর তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের অংশ আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও।

(১৭) (হে রসূল!) আপনি তাদের উক্তি সম্পর্কে সবর অবলম্বন করুন এবং স্মরণ করুন আমার বন্দা দাউদের কথা। সে ছিল শক্তিশালী এবং নিশ্চয় সে ছিল আল্লাহ পাকের প্রতি তন্ময়-চিত্ত।

(১৮) নিশ্চয় আমি পাহাড় সমূহকে আদেশ করেছিলাম, যেন তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করে (তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে)।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ সত্য-বিরোধীদের শাস্তি এবং নবী রসূলের বিজয় নতুন কিছু নয়; বরং পৃথিবীর ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝

তাদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ জাতি এবং পেরেকধারী ফেরাউনও রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। আর সামুদ জাতি, লূতের জাতি এবং আইকাবাসীও রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তারা ছিল বিরাট বিরাট বাহিনী। তাদের প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাই তাদের ব্যাপারে আমার আযাব সাব্যস্ত হয়েছে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর

মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে ইতোপূর্বে যে সব জাতি অনুরূপ অন্যায়ের জন্যে কোপগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে পূর্বের ছয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি; তারা হযরত নূহ (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তাঁর বিরোধিতা করেছিল, তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর তাদের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাদের নাফরমানী এতটুকু হ্রাস পায়নি, তাই প্রলয়ংকরী বন্যা দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

২. আদ জাতি; হযরত হুদ (আঃ)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে, পরিণামে আল্লাহ পাক তাদেরকে তীব্র বায়ু প্রবাহ দ্বারা ধ্বংস করেছেন।

৩. হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করা হয়। ফেরাউন ছিল ক্ষমতায় মদ-মত্ত। লক্ষ লক্ষ সৈন্যবাহিনী, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তার ঔদ্ধত্য এবং আত্মগরিমা বৃদ্ধি করেছিল। আল্লাহর নবী মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সে মন্দ আচরণ করেছিল। সে সত্যকে তার সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিয়েছিল, পরিণামে শাস্তি আপতিত

হয়েছে, আল্লাহ পাক তাকে তার দলবল সহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেছেন।

৪. সামুদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু সামুদ জাতি তাঁকে মানেনি, পরিণামে তাদেরকেও ধ্বংস করা হয়েছিল। হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর একটি গর্জনই তাদের ধ্বংসের জন্যে যথেষ্ট ছিল।

৫. হযরত লূত (আঃ)-এর জাতি সদুম নামক এলাকার অধিবাসী ছিল। তারা ছিল অশ্লীল কর্মে লিপ্ত। হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করেছে, শাস্তি স্বরূপ তারা ধ্বংস হয়েছে।

৬. আইকাবাসী হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি, হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁর পথভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ হতভাগা জাতি আল্লাহর নবীর হেদায়েত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, পরিণামে তারাও ধ্বংস হয়েছে।

অতএব, যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত, যে কোন সময় তাদের উপর শাস্তি আপতিত হতে পারে।

وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ

আলোচ্য আয়াতে ফেরাউনকে 'জুল আওতাদ' বলা হয়েছে। 'আওতাদ' শব্দটি 'ওয়াতাদুন' এর বহুবচন। ওয়াতাদুন অর্থ পেরেক। ফেরাউন যদি কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিত, তখন তার হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে দিয়ে ফেলে রাখত। এভাবে তার মৃত্যু হতো। এজন্যে ফেরাউনকে 'জুল আওতাদ' বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মোহাম্মদ এবনে কা'ব (রাঃ) বলেছেন, 'ওয়াতাদ' অর্থ হলো খুঁটি। যেভাবে খুঁটির মাধ্যমে ইমারত মজবুত হয়, ঠিক তেমনি ফেরাউনের রাজত্বের খুঁটিও ছিল অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ়। তার বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ ছিলনা। তাই তার হাতে ছিল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। কিন্তু আল্লাহর রসূলের বিরোধিতার কারণে তার মূলোৎপাটন হয়েছে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, 'জুল আওতাদ' শব্দটির অর্থ হলো, অত্যন্ত বড় শক্তির অধিকারী। আর আতিয়্যা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো (ফেরাউন) যার অনেক সৈন্যবাহিনী ছিল।

যেহেতু ভ্রমণকালে তার লক্ষ লক্ষ সৈন্যবাহিনীর জন্যে অনেক তাঁবু তৈরী করতে হতো এবং এর জন্যে অনেক পেরেক এবং খুঁটি ব্যবহার করা হতো, এভাবে তার রাজকীয় শান-শওকত এবং শক্তির বহিঃপ্রকাশ হতো, এজন্যে তাকে 'জুল আওতাদ' বলা হয়েছে।

আর তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, অহংকারী ফেরাউন যখন মানুষকে শাস্তি দিত, তখন তাকে চিৎ করে শায়িত অবস্থায় হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে দিয়ে বিষধর সাপ বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এভাবে লোকটির মৃত্যু হতো, তাই তাকে 'জুল আওতাদ' বলা হয়েছে।[১]

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ۝

'তাদের প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, পরিণামে (তাদের ব্যাপারে) আমার আযাব সাব্যস্ত হয়েছিল'।

অতএব, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে, তাদের সাবধান হওয়া উচিত।

وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ۝

'আর তারা তো শুধু একটি মাত্র হুংকারের অপেক্ষা করছে, যাতে কোন বিরাম নেই'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, هٰؤُلَاءِ দ্বারা মক্কাবাসীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের অন্যায়-আচরণে একথা অনুভূত হয় যে, তারা ইস্রাফীল (আঃ)-এর শিংগার হুংকারের অপেক্ষা করছে, এর পূর্বে তাদের মধ্যে চেতনা ফিরে আসবেনা, সত্যকে গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত হবেনা।

কেয়ামতের জন্যে যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, যখন এ বিশ্ব কারখানা ধ্বংসোম্মুখ হবে, তখনই তারা ঈমান আনবে কিন্তু তখনকার ঈমান কোন উপকারেই আসবেনা; আর ইস্রাফীলের শিংগার গর্জন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সে গর্জন হবে বিরামহীন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৭
তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১৭১
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৭১

অথবা এর অর্থ হলো, তারা দুনিয়াতেই কোন ভয়ংকর গর্জনের অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আযাবের অপেক্ষা করছে। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের فواق শব্দটির অর্থ হলো অবকাশ।

আবু ওবায়দা এবং ফররাও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। একথার তাৎপর্য হলো, এ দূরাত্মা কাফেররা কেয়ামতের দিনের শাস্তি না দেখা পর্যন্ত সঠিক পথে আসবেনা।

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ۞

'তারা আরো বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাবের দিনের পূর্বেই আমাদেরকে আমাদের অংশ দিয়ে দাও'।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, সূরা আল হাক্কা-হ এর এ আয়াত-

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ

(আর যার ডান হাতে দেয়া হবে তার আমলনামা)

যখন নাযিল হয় তখন মক্কার কাফেররা বিদ্রুপ করে বলেছিল, 'হে পরওয়ারদেগার! হিসাবের দিনের প্রয়োজন নেই, আমাদের আমলনামা এখানেই দিয়ে দাও'। এ ব্যা খ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে জান্নাতের কথা বলেছেন, তাতে আমাদের যে অংশ রয়েছে, তা এ পৃথিবীতেই আমাদেরকে দিয়ে দেয়া হোক।

হাসান বসরী (রঃ), কাতাদা (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, পরকালীন জীবনে যে আযাব সম্পর্কে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, তা আমাদেরকে দুনিয়াতেই দেয়া হোক।

আর তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, এ উক্তি করেছিল মক্কার কাফের নজর এবনে হারেস। সে বলেছিল, হে আল্লাহ! যদি এই নবী সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা তিনটি বিষয় অবিশ্বাস করতো (এক) তৌহীদ, (দুই) রেসালত, (তিন) আখেরাত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৯

আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কাল কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কর্মের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা দেয়া হবে। যদি ঈমানদার ও নেককার হয় তবে ডান হাতে, আর বেঈমান ও পাপীষ্ঠ হলে বাম হাতে আমলনামা পাবে। তাই দুরাত্মা কাফেররা বিদ্রুপ করে বলেছিল, আমাদের আমলনামা দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হোক, আমরা দেখি তাতে কি রয়েছে আর যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যারা ঈমানদার ও নেককার হবে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত এবং যারা বেঈমান ও বদকার হবে, তাদের জন্যে রয়েছে দোযখের কঠিন শাস্তি'। তখন কাফেররা বিদ্রুপ করে বলেছিল, 'কেয়ামতের দিনের অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের জান্নাতে যে অংশ রয়েছে অথবা দোযখে যে শাস্তি রয়েছে, তা এখানেই হিসাবের পূর্বেই দিয়ে দেয়া হোক'। কাফেরদের এ বিদ্রুপাত্মক এবং মূর্খতাপ্রসূত উক্তির ব্যাপারে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পরবর্তী আয়াতে স্থান পেয়েছেঃ

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি তাদের উক্তি সম্পর্কে সবর অবলম্বন করুন এবং স্মরণ করুন আমার বন্দা দাউদের কথা, সে ছিল শক্তিশালী এবং নিশ্চয় সে ছিল আল্লাহ পাকের প্রতি তন্ময়-চিত্ত'।

সবর অবলম্বনের তা'লিম

কাফেরদের অন্যায় আচরণে তাদের উপহাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মন যেন ভেঙে না যায়, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) কাফেরদের বিদ্রুপাত্মক কথায়, তাদের অভদ্র আচরণে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না, সবর অবলম্বন করুন। কাফেরদের এমন ব্যবহার শুধু আপনার বেলাতেই নয়, অন্যান্য নবী রসূলগণের সঙ্গেও কাফেররা এমন অপ্রিয় আচরণ করেছে। ঐ অবস্থায় তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ

এ পর্যায়ে আমার বন্দা দাউদের কথা স্মরণ করুন। দাউদ (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, অতীব সাহসী। আল্লাহ পাকের এবাদতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদৃঢ়,

আল্লাহ পাকের এবাদতে তিনি থাকতেন অনন্য। দুশমনের মোকাবেলায় তিনি থাকতেন তৎপর, তাঁকেও কঠিন মুহূর্তে সবর অবলম্বন করতে হয়েছে। অতএব (হে রসূল!) কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনিও সবর অবলম্বন করুন।

إِنَّهُ أَوَّابٌ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো হযরত দাউদ (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত বড় এবাদত গুজার ব্যক্তি। সাঈদ এবনে যোবায়ের (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তিনি ছিলেন অনেক বেশী তসবীহ পাঠকারী।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্ল'ল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল দাউদ (আঃ)-এর (নফল) রোযা। তাঁর রোযা রাখার পন্থা ছিল এই, একদিন তিনি রোযা রাখতেন আর একদিন তিনি বাদ দিতেন। আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল দাউদ (আঃ)-এর নামায। তিনি অর্ধেক রাত নিদ্রিত থাকতেন। এরপর এক তৃতীয়াংশ রাত নামায আদায় করতেন। আর রাতের শেষ অংশ তথা এক ষষ্ঠমাংশ তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। (এভাবে তিনি রাতের দু' তৃতীয়াংশ ঘুমের জন্যে আর এক তৃতীয়াংশ এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।)

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۝

'নিশ্চয় আমি পাহাড় সমূহকে আদেশ দিয়েছিলাম তারা যেন সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করে'।

আল্লাহ পাক পাহাড়-পর্বতকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর অনুগত করে দিয়েছিলেন। পাহাড়-পর্বতও তাঁর সাথে তসবীহ পাঠ করতো। হযরত দাউদ (আঃ) সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে মশগুল থাকতেন। তাঁর সঙ্গে পাহাড়গুলোও তসবীহ পাঠ করতো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এশরাক বলে চাশ্‌তের নামায উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, আমি এ আয়াত দ্বারাই চাশ্‌তের নামাযের এলম হাসিল করেছি।

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾
إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ
بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ
سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ
نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

তরজমা

(১৯) এবং পাখীরাও সমবেতভাবে তসবীহ্ পাঠ করতো এবং প্রত্যেকেই তার সম্মুখে তন্ময় হয়ে থাকত।

(২০) আর আমি তার সাম্রাজ্যকে শক্তি প্রদান করেছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও মীমাংসায় উপনীতকারী বাকশক্তি।

(২১) আর (হে রসূল!) আপনার নিকট কি সেই বাদী বিবাদীদের সংবাদ পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে এবাদতখানার প্রবেশ করেছিল।

(২২) যখন তারা দাউদের নিকট প্রবেশ করে তখন তিনি তাদের কারণে ভীত হয়ে পড়েন। তারা বলে, ভয় করবেন না আমরা বিবদমান দু' পক্ষ। আমরা একে অপরের প্রতি জুলুম করেছি. অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন এবং অবিচার করবেন না। আর আমাদের সকল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

(২৩) নিশ্চয় এ আমার (ধর্মীয়) ভাই, তার নিকট নিরানব্বইটি মাদী দুম্বা রয়েছে। আর আমার নিকট রয়েছে মাত্র একটি। তবুও সে বলে, একটিও আমাকে দিয়ে দাও এবং সে আমার সঙ্গে জবরদস্তি করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর এ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করতেন তখন পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের

হুকুমে তাঁর সঙ্গে তসবীহ পাঠ করতো। আলোচ্য আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর এমনি আরো বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ط كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ۝

অর্থাৎ শুধু পাহাড়ই নয়; বরং আকাশের উড়ন্ত পাখীরাও তাঁর সম্মুখে একত্রিত হতো এবং আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে মশগুল হতো। হযরত দাউদ (আঃ)-এর সঙ্গে পাহাড় এবং পাখীদের তসবীহ পাঠের বিষয়টি ছিল তাঁর মোজেযা, আর সকলেই তসবীহ পাঠে তথা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায় তন্ময় থাকত।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۝

'আর আমি তার সাম্রাজ্যকে শক্তি প্রদান করেছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও মীমাংসায় উপনীতকারী বাক শক্তি'।

আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে দান করেছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজত্ব, অসধারণ রাষ্ট্রীয় প্রভাব এবং বিশাল সামরিক শক্তি। আল্লাহ পাক তাঁকে আরো দান করেছিলেন নবুওয়্যত, হেকমত, প্রজ্ঞা, রাষ্ট্রনায়কোচিত বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং এর পাশাপাশি আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছিলেন এমন অনন্য-সাধারণ বাক শক্তি যে, তাঁর কথায় যে কোন দুরুহ বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যেত।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক দুনিয়ার সকল বাদশাহদের মধ্যে হযরত দাউদ (আঃ)-কে অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছিলেন, তাঁর শাহী মহলের প্রহরায় ছত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়োজিত থাকত।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, প্রত্যেক রাতেই এমন নতুন সৈন্যবাহিনী তাঁর শাহী মহলের প্রহরায় নিয়োজিত হতো, যারা বছরে মাত্র একবারই এ সুযোগ পেত।

আল্লামা বগভী (রঃ) একরামা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বনী ইসরাঈলে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট এ মামলা দায়ের করলো যে, এ ব্যক্তি আমার গাভী ছিনিয়ে নিয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ) বিবাদীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে অভিযোগ অস্বীকার করলো। তখন তিনি বাদীকে বললেন, তোমার আরজীর পক্ষে সাক্ষী হাযির কর। কিন্তু তার কাছে কোন সাক্ষী ছিলনা। তখন তিনি তাদেরকে

বললেন, তোমরা এখন চলে যাও। আমি তোমাদের বিষয়টি চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেব। আল্লাহ পাক স্বপ্নযোগে হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক। জাগ্রত হবার পর তিনি চিন্তা করলেন, এটি তো একটি স্বপ্ন মাত্র, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়ো করবো না। দ্বিতীয় দিনেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন, কিন্তু এদিনও তিনি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করলেন না। তৃতীয় দিনও তিনি অনুরূপ স্বপ্ন দেখলেন এবং ওহী আসলোঃ বিবাদীকে হত্যা কর অথবা তাকে কঠিন শাস্তি দাও। জাগ্রত হয়ে তিনি বিবাদীকে তলব করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ পাক আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন এ মর্মে যে, আমি যেন তোমাকে হত্যা করি'। সে আরজ করলো, 'কোন প্রমাণ ব্যতীতই আমাকে হত্যা করবেন'? হযরত দাউদ (আঃ) বললেন, 'হ্যা, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের হুকুম অবশ্যই জারী করবো'। যখন লোকটি দেখল যে, হযরত দাউদ (আঃ) তাকে অবশ্যই মৃত্যুদন্ড দান করবেন তখন সে বললো, 'আপনি আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না, আমি প্রকৃত ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করছি। আমার এ অপরাধের জন্যে এ শাস্তি নির্দিষ্ট হয়নি; বরং অন্য একটি অপরাধের জন্যে এ শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে আর তা হলো, আমি বাদীর পিতাকে প্রতারণা করে অতর্কিতভাবে হত্যা করেছিলাম, এটি তারই শাস্তি'। বিবাদীর স্বীকারোক্তির পর হযরত দাউদ (আঃ)-এর আদেশক্রমে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়। এ ঘটনার পর বনী ইসরাঈল জাতির মনে হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিরাট প্রভাব সৃষ্টি হয়; তাঁর ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম এ বিবরণটি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে সংকলন করেছেন।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের الحكمة শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর একাধিক অর্থ হতে পারে যেমন নবুওয়্যত, পরিপূর্ণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং কর্মের দৃঢ়তা।

فصل الخطاب

অর্থাৎ এমন বাগ্মিতা, যার মাধ্যমে যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হাসান বসরী (রঃ), কালবী (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণের মতে, এর অর্থ হলো কোন জটিল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ সুস্পষ্ট কথা অর্থাৎ এমন কথা যার দ্বারা উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। শ্রোতার কথার অর্থ বুঝতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। যে কথা এত সংক্ষিপ্ত না হয় যে, মর্ম অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে, আবার এত দীর্ঘও না হয়, যা শ্রবণকারীর ক্লান্তির কারণ হয়। যেমন, হিজরতের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মে মাবাদের আস্তানায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, সে তাঁর সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছিল তা হলো, তাঁর কথা এত কম ছিলনা যে, তার মর্ম উপলব্ধিতে অসুবিধা হয়, আর এত বেশীও ছিলনা যে, শ্রোতা ক্লান্তি বোধ করে।

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۙ

'আর (হে রসূল!) আপনার নিকট কি সেই বাদী বিবাদীদের সংবাদ পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে এবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল'।

হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর জীবনের কর্মসূচী এভাবে প্রণয়ন করেছিলেন যে, তিনি একদিন দরবারে বসতেন, মানুষের মধ্যে বিচার করতেন। একদিন পরিবার-পরিজনের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। আর একদিন শুধু আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। ঐদিন তাঁর নিকট কারো যাতায়াত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আর তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন যে, বাড়ীতে সর্বক্ষণ যেন আল্লাহ পাকের এবাদত হতে থাকে। কেউ যেন দরবারে এলাহীতে সেজদারত থাকে, আল্লাহ পাকের এবাদত ব্যতীত কোন মূহূর্তও যেন অতিবাহিত না হয়। আর একদিন রেখেছিলেন মানুষকে উপদেশ দেয়ার জন্যে।

আল্লাহ পাকের তৌফিক বিনা এবাদত সম্ভব হয়না

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, হযরত দাউদ (আঃ) এ আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে, তাঁকে যেন তাঁর পূর্ব পুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়। এ মর্মে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করেন। আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করেন। তোমার পূর্ব পুরুষগণকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন পরীক্ষা তোমার হয়নি। যেমন ইব্রাহীম (আঃ)-কে নমরূদের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়। হযরত ইসহাক (আঃ)-কে অন্ধ করা হয় এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে তাঁর প্রাণ প্রিয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিরহ সইতে হয় দীর্ঘ চল্লিশ বছর। সকল নবী রসূলগণ এসব কঠিন মুহূর্তে সবর অবলম্বন করেন। হযরত দাউদ (আঃ) আরজ করেন, 'হে পরওয়ারদেগার! যদি তুমি আমার পরীক্ষা গ্রহণ কর, আমি ইনশাআল্লাহ সবর

অবলম্বন করবো'। একবার এবাদতের জন্যে নিদৃষ্ট দিনে তিনি তাঁর এবাদত খানায় প্রবেশ করেন এবং যবুর তেলাওয়াত করতে শুরু করেন। নিয়ম অনুযায়ী কেউ তখন তাঁর নিকট আসতে পারেনা। আর সর্বক্ষণ তাঁর ঘরে আল্লাহ পাকের এবাদত হতে থাকে। এক মুহূর্তের জন্যেও এবাদত বন্দেগী বন্ধ হয়না। এ কারণে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। তাঁর মনের গহনে এজন্যে আত্ম-সন্তোষ ও আত্ম-তৃপ্তির ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। আত্ম প্রসাদের এ ভাবটি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পছন্দনীয় হয়নি, কেননা আল্লাহ পাকের বন্দেগীর ব্যাপারে যত সুন্দর এবং সঠিক ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, আল্লাহ পাক তৌফিক না দিলে তাঁর এবাদত করা সম্ভব হয়না। তাই আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে এ সত্য বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, সর্বক্ষণ এবাদত বন্দেগী অব্যাহত রাখার মধ্যে হযরত দাউদ (আঃ)-এর কোন কৃতিত্ব নেই; বরং এটি আল্লাহ পাকেরই মেহেরবানী। কেননা আল্লাহ পাক তৌফিক না দিলে এবং দয়া করে তিনি সাহায্য না করলে এবাদতের ব্যাপারে কারো কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হতে পারেনা। এ সত্যের প্রমাণ স্বরূপ হযরত দাউদ (আঃ)-এর এবাদত খানায় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ

(হে রসূল!) আপনার নিকট কি সেই বাদী বিবাদীর সংবাদ পৌছেছে?)

ঘটনা ছিল এই, হযরত দাউদ (আঃ) ঐ দিন এবাদতে মশগুল ছিলেন। বাইরে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। কেউ সে মুহূর্তে নিয়ম মোতাবেক তাঁর নিকট আসতে পারেনা। কিন্তু দুটি লোক প্রাচীর ডিঙিয়ে অতর্কিতভাবে তাঁর এবাদত খানায় প্রবেশ করলো।

اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ج

এমনি অস্বাভাবিক ভাবে হঠাৎ করে দু'টি লোক প্রবেশ করলে হযরত দাউদ (আঃ) ভীত হয়ে পড়লেন, তিনি ভাবছিলেন তারা কি মানুষ না অন্য কিছু। যদি মানুষ হয় তবে এত প্রহরা থাকা সত্ত্বেও তারা কিভাবে আসলো? আর এমন দুঃসাহস কেন দেখালো, আর প্রাচীর ডিঙিয়ে আসার দরকার কি? আর কি উদ্দেশ্যেই বা তারা আসলো? এ অবস্থায় তারা বললো, 'আপনি ভীত হবেন না'।

خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ

وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ۝

'আমরা বিবদমান দু' পক্ষ, আমরা একে অপরের প্রতি জুলুম করেছি, অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন এবং অবিচার করবেন না, আর আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন'।

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য তা হলো, যেদিন এবং যে সময়ে এ দু' ব্যক্তি হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট হাযির হয়, তা তাঁর এবাদতের দিন ছিল, বিচারের দিন নয়। যেখানে কারো উপস্থিতি নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে তারা হাযির হয়। এতদ্ব্যতীত, তারা অতর্কিতে প্রাচীর ডিঙিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। তিনি তাদেরকে এসব অপরাধের জন্যে কোন প্রকার শাস্তি দেননি, এমনকি তিরস্কারও করেননি; বরং অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এটি ছিল তাঁর আদর্শ। এজন্যেই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন ঃ

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ

'(হে রসূল!) কাফেররা যে সব আপত্তিকর কথাবার্তা বলে, সে সম্পর্কে আপনি সবর অবলম্বন করুন, আর আমার বন্দা দাউদের কথা স্মরণ করুন', কেননা দাউদ (আঃ) এক্ষেত্রে সবর অবলম্বন করেছেন।

اِنَّ هٰذَآ اَخِىْ قف لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ

এ আয়াতে বাদী-বিবাদীর আরজীর বিবরণ রয়েছে। বাদীর বক্তব্য হলো, আমার প্রতিপক্ষ এ ভাইটির ৯৯ দুম্বা রয়েছে। আর আমার মাত্র একটি দুম্বা রয়েছে। কিন্তু তবুও সে আমার এই একটি দুম্বা নিয়ে যেতে চায়। সে বলে, তুমি এই একটি দুম্বা রেখে কি করবে, আমাকে দিয়ে দাও, আমার একশ'টি পূর্ণ হবে। আমি তার সঙ্গে কথায় পেরে উঠিনা। তার প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে তার কথার জোরও বেশী। জবরদস্তিমূলক ভাবে সে আমার দুম্বাটি নিয়ে যেতে চায়।

হযরত দাউদ (আঃ) ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শ্রবণ করলেন।

উল্লেখ্য, এ দু' ব্যক্তির মোকদ্দমাটি প্রকৃত অবস্থায় কোন মোকদ্দমা ছিলনা; বরং এটি ছিল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর জন্যে একটি পরীক্ষা। এ দু' ব্যক্তির একজন ছিলেন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আর অপরজন ছিলেন মিকাঈল (আঃ)। তাঁরা মানব রূপ ধারণ করে মোকদ্দমা নিয়ে হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট হাযির হন। আর তা এ কারণে যে, হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর এবাদতের জন্যে যে নিখূত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তাতে এক মুহূর্তও তাঁর

পরিবারের মধ্যে আল্লাহর বন্দেগী বন্ধ থাকত না। তাঁর ব্যবস্থাপনা এমন ছিল যে, দিবা-নিশি প্রতিটি মুহূর্তে কেউ না কেউ আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত থাকত। আর তিনি যেদিন এবাদতে মশগুল হতেন, সেদিন কারো সঙ্গেই কথা বলতেন না। এ সু-ব্যবস্থাপনায় তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক তাঁকে পরীক্ষায় ফেলেছেন, শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি সেদিন আল্লাহ পাকের এবাদত করতে পারলেন না। ছত্রিশ হাজার সৈন্যের প্রহরা সত্ত্বেও বাদী বিবাদী তাঁর নিকট হাযির হলো, এজন্যে আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে বলেছিলেন, হে দাউদ! তুমি যা কিছু করছো তাতে তোমার কৃতিত্ব নেই, কেননা সব কিছু আমার তৌফিকেই হয়ে থাকে। যদি আমার তৌফিক না থাকে, তবে শত চেষ্টা করেও কেউ আমার বন্দেগী করতে পারেনা।

কোন কোন হাদীস শরীফে রয়েছে, বন্দা যদি কোন নেক কাজ করে বলে, হে আল্লাহ! আমি এ কাজ করেছি, আমি সদকা করেছি, আমি নামায আদায় করেছি, আমি গরীব দুঃখীকে আহার করিয়েছি। তার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ 'আর আমি তোমাকে সাহায্য করেছি, আমি তোমাকে তৌফিক দিয়েছি'।

পক্ষান্তরে, বন্দা যখন বলে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, তুমি আমাকে তৌফিক দান করেছ এবং তুমি আমার প্রতি এহসান করেছ। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ 'তুমি আমল করেছ, তুমি ইচ্ছা করেছ এবং তুমি নেক আমল করেছ'।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদি আল্লাহ পাক কোন নেক আমলের তওফিক দান করেন, তবে তার জন্যে আত্ম প্রসাদ লাভ করা উচিত নয়; বরং আল্লাহ পাকের তওফিকের জন্যে শোকর গুজার হওয়া উচিত। কেননা, কোন নেক আমলের তওফিক পাওয়া বন্দার প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত।

দ্বিতীয়তঃ জীবনের সকল অবস্থায় সবর অবলম্বন করা উচিত। কেননা সবর অবলম্বনের কর্মসূচীই সাফল্যের কারণ হয়।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ব্যাপারে এ পর্যায়ে কোন কোন তফসীরকার অনেক সুদীর্ঘ কাহিনীর অবতারণা করেছেন যা সাধারণতঃ ইস্রাঈলীদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ), আল্লামা এবনুল জওযী (রঃ), কাজী আবুস সউদ (রঃ), কাজী ইয়াজ (রঃ), ইমাম রাজী (রঃ), আল্লামা আবু হাইয়ান (রঃ), আল্লামা জমখশরী (রঃ), আল্লামা খাজেন (রঃ), আল্লামা এবনে হজম (রঃ), আল্লামা মাহমুদ আলুসী (রঃ) ঐসব ঘটনাকে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই সে সব ঘটনার উল্লেখ আমরা সমীচিন মনে করিনা।

হযরত দাউদ (আঃ) যখন উপলব্ধি করলেন যে, এটি হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পরীক্ষা, আর একথাই চির সত্য যে, আল্লাহ পাকের তওফিক না হলে কেউ তাঁর বন্দেগী করতে পারেনা; তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন, ৪০ দিন পর্যন্ত সেজদারত ছিলেন, ক্রন্দনরত ছিলেন, এর মাঝে পানাহার করেননি; সর্বক্ষণ আল্লাহ পাককে ডাকতেন এবং তওবা কবুল হবার জন্যে আরজী পেশ করতেন। তিনি এভাবে দোয়া করতেন, 'পবিত্র সেই আল্লাহ পাক, যিনি সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, যিনি যে কোন সময় তাঁর সৃষ্টিকে পরীক্ষা করেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত, তুমি আমার মোনাজাত কবুল কর। হে আমার মা'বুদ! স্বীয় রহমতে আমার গুনাহ মাফ করে দাও, যদি তুমি আমাকে তোমার রহমত থেকে দূরে রাখ, তবে আমি অপমানিত হবো'। এভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একাধারে ক্রন্দনের পর আসমান থেকে এ ঘোষণা আসেঃ 'হে দাউদ! আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি'।

আল্লামা আলুসী (রঃ) ইমাম আহমদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে আরশে এলাহীর সম্মুখে দন্ডায়মান করবেন এবং এই বলে আদেশ দেবেনঃ হে দাউদ! যেভাবে, যে সুরে তুমি দুনিয়াতে আমার তসবীহ পাঠ করতে, আজো সেভাবে তসবীহ পাঠ কর। হযরত দাউদ (আঃ) আরজ করবেন, 'হে পরওয়ারদেগার! সে তো দুনিয়ার জীবনে ছিল, এখন তো সে অবস্থা নেই'। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ 'আমি তোমাকে তোমার সে আকৃতি এবং কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে দিচ্ছি'। তখন হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ পাকের জিকর এবং তসবীহ শুরু করবেন, তখন জান্নাতের সমস্ত অধিবাসী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বেন।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৬-২৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৯০ ও ৯৯-১০০
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৮৪

قَالَ لَقَدْ
ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ
مَآبٍ ﴿٢٥﴾ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ
ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

তরজমা

(২৪) তিনি বলেন, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সঙ্গে একত্রিত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। অধিকাংশ শরীকরাই একে অন্যের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে যারা ঈমানদার হয় ও নেক আমল করে, তারা এর ব্যতিক্রম, অবশ্য তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। আর দাউদ উপলব্ধি করেন যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি, ফলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন, বিনীত হয়ে লুটিয়ে পড়েন এবং আল্লাহ পাকের প্রতি রুজু হন।

(২৫) এরপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম, নিশ্চয় তার জন্যে আমার নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণতি।

(২৬) হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি মনোনীত করেছি। অতএব, তুমি জনসাধারণের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ক্ষমতা পরিচালনা কর, আর নিজের খেয়াল-খুশির অনুসারী হয়োনা, নতুবা তা তোমাকে আল্লাহ পাকের পথ

থেকে বিচ্যুৎ করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাকের পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি, কেননা তারা হিসাবের দিনকে ভুলে রয়েছে।

(২৭) আমি আসমান জমীন এবং উভয়ের মধ্যকার কোন কিছুকেই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; যদিও কাফেররা তাই ধারণা করে। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে দোযখের শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ط

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর দরবারে অতর্কিতভাবে দু'জন আগন্তুকের উপস্থিতি এবং মোকদ্দমা পেশ করার বিবরণ ছিল। হযরত দাউদ (আঃ) এ মোকদ্দমায় যে রায় ঘোষণা করেছেন, তা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর রায়

হযরত দাউদ (আঃ) পেশকৃত মোকদ্দমায় রায় দিলেন এভাবেঃ এ লোকটি তোমার একটি মাত্র দুম্বা নিয়ে যাওয়ার দাবী করে চরম অন্যায় করেছে। অথচ তার নিকট ৯৯টি দুম্বা রয়েছে। আসলে এটিই দুনিয়ার নিয়ম, অধিকাংশ শরীকরাই একে অন্যের হক্ব আত্মসাত করতে চায়; পরস্পরের প্রতি জুলুম করতে চায়, ধন-সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও অন্যের সম্পদ কেড়ে নিয়ে নিজের সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে চায়। এ ব্যক্তি তোমার দুম্বাটি নিয়ে যাওয়ার দাবী করে নিঃসন্দেহে তোমার প্রতি অবিচার করেছে, আমি তা করতে দেবনা, যারা প্রকৃত ঈমানদার এবং নেককার তারাই একে অন্যের প্রতি জুলুম করেনা, আর সমাজে এমন লোকদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

হযরত দাউদ (আঃ) যখন বাদী-বিবাদীকে তাঁর এ রায় শুনিয়ে দিলেন তখন তারা একে অন্যের দিকে দেখে মুচকি হাসল, এরপর উভয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ۩

'আর দাউদ উপলব্ধি করেন যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি, ফলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন, বিনীত হয়ে লুটিয়ে পড়েন এবং আল্লাহ পাকের প্রতি রুজু হন'।

হযরত দাউদ (আঃ) কেন পরীক্ষার সম্মুখীন হন?

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর কর্মসূচী এবং জীবন ধারার প্রতি তাঁর আত্মপ্রসাদ জন্মেছিল যে, একদিন তিনি দরবারে বসে জনকল্যাণ সাধন করেন, আর একদিন সম্পূর্ণ সময় আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে অতিবাহিত করেন, এর মধ্যে অন্য কোন কাজ করেন না এবং আরেক দিন তিনি পরিবারবর্গের মাঝে অতিবাহিত করেন, কিন্তু এ ব্যবস্থাপনা শুধু যে তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে তা নয়; বরং আল্লাহ্ পাকের তৌফিকেই হচ্ছে, এ সত্য উপলব্ধি করানোই ছিল তাঁকে পরীক্ষা করার কারণ। কেননা, এবাদতের মুহূর্তে শত প্রহরা থাকা সত্ত্বেও বিনা অনুমতিতে দু' ব্যক্তি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে এবং মোকদ্দমা দায়ের করে, ফলে বিনষ্ট হয় তাঁর এবাদতের নিরঙ্কুশ সুযোগ, প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ্ পাকের তৌফিক বিনা কেউ তাঁর এবাদত করতে পারেনা।

কোন কোন তফসীরকার হযরত দাউদ (আঃ)-এর সম্পর্কে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর দরবারের উরিয়া নামক একজন কর্মকর্তা জেহাদে গিয়েছিলেন এবং শাহাদত বরণ করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর বিধবা পত্নীকে বিয়ে করেছিলেন। আর উরিয়ার শাহাদতের কারণে তিনি তেমন চিন্তিত ও ব্যথিত হননি, আর এটুকু ত্রুটির জন্যেই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়, কেননা নবীগণের মর্যাদা অনেক উচ্চে, তাঁদের সামান্য ত্রুটিও আল্লাহ্ পাকের দরবারে অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উরিয়া নামক ঐ কর্মকর্তা একজন স্ত্রীলোককে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন। এরপর তিনি জেহাদে চলে গিয়েছিলেন, হযরত দাউদ (আঃ) ঐ স্ত্রীলোককে বিয়ে করেন, তখন তাঁর ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন। এ কারণে আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। যখন ঐ দু' ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকট হাযির হলেন এবং দুম্বার মোকদ্দমা পেশ করলেন, তখন হযরত দাউদ (আঃ) ঐ মোকদ্দমায় তাঁর রায় দিলেন যে, এ ব্যক্তি তোমার একটি মাত্র দুম্বা চেয়ে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। এ রায় পেয়ে ক্ষণিকের মধ্যে ঐ দু'জন মানবরূপী ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হযরত দাউদ (আঃ) উপলব্ধি করলেন, এ দু' ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ নন; ফেরেশতা, আর তারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই এসেছেন এবং তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ.....

'আর দাউদ উপলব্ধি করেন যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি'।

আলোচ্য আয়াতের فتناه শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, পরীক্ষাটি এমনই, যেমন হাদীস শরীফে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে খোতবা দিচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময় শিশু হাসান, হোসায়েন (রাঃ) হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর নিকটে আসলেন, তিনি সইতে পারলেন না, ঐ মুহূর্তে খোতবা প্রদান বন্ধ করে মিম্বর থেকে নীচে নামলেন, স্নেহের পৌত্রদেরকে কোলে নিয়ে আদর করলেন এবং এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে সত্যই বলেছেনঃ

إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

'তোমাদের অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ', আমি এ শিশুদেরকে আসতে দেখে ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না, এমনকি ক্ষণিকের জন্যে খোতবা বন্ধ করে তাদেরকে আদর করতে হলো। যেভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কাজটিকে পরীক্ষা বলে আখ্যায়িত করেছেন, ঠিক তেমনি হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের আগমনের ফলে যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাকেও 'পরীক্ষা' বলা হয়েছে আর যখন দাউদ (আঃ) উপলব্ধি করলেন যে, তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই তিনি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থী হলেন, সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং একাধারে ক্রন্দন করতে থাকলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেজদারত অবস্থায়। তাঁর চোখের অশ্রুতে সেজদার স্থানটি ভিজে গিয়েছিল এবং সে স্থানে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছিল।

সেজদারত অবস্থায় হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এভাবে মোনাজাত করেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দাউদের দ্বারা এমন অপরাধ হয়েছে যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দূরত্বের চেয়েও বড়। হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি আমার প্রতি দয়া না কর তবে কে আমার প্রতি দয়া করবে'? এভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেজদায় থেকে ক্রন্দণের পর আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে ক্ষমা করার সুসংবাদ দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ছোয়াদের এ আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছেন, এরপর এরশাদ করেছেন, দাউদ (আঃ) তওবার সেজদা করেছেন, আর আমরা শোকর গুজারীর সেজদা করি। (নেসায়ী)

পরবর্তী আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-কে ক্ষমা করার সুসংবাদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ۖ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

'এরপর আমি তার ক্রটি ক্ষমা করলাম, নিশ্চয় তার জন্যে আমার নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণতি'।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর ক্রন্দন

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-এর তওবা কবুল করার পরও তিনি দরবারে এলাহীতে ক্রন্দন এবং তওবা এস্তেগফার অব্যাহত রেখেছেন, দিবা-নিশি তাঁর নয়ন যুগল থেকে সর্বক্ষণ অশ্রু ঝরতো, মুহূর্তের জন্যেও অশ্রু প্রবাহে কোন বিরাম ছিলনা। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। এ ঘটনার পর তিনি তাঁর জীবনের কর্মসূচীতে পরিবর্তন সাধন করলেন, একদিন বনী ইসরাঈলের মামলা-মোকদ্দমা শ্রবণ করে রায় দিতেন, একদিন বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করতেন, আর একদিন তাঁর এবাদতখানায় ক্রন্দন করতেন, ঐদিন তাঁর সঙ্গে চার হাজার দরবেশ একত্রিত হয়ে ক্রন্দন করতেন। যখন তিনি পাহাড়-পর্বতে যবুর পাঠ করে, ক্রন্দন করতেন তখন পাহাড়-পর্বত, পশু-পক্ষী, চতুঃষ্পদ জন্তু তাঁর সঙ্গে ক্রন্দন করতো। সবার ক্রন্দনের কারণে নহর প্রবাহিত হতো, এরপর তিনি নদীর তীরে যেতেন, উচ্চস্বরে কাঁদতেন এবং পানির মাছও তাঁর সঙ্গে কাঁদত। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। আর যেদিন তিনি ঘরে এবাদতখানায় ক্রন্দন করতেন সেদিন পূর্বাহ্নে ঘোষণা হতো, আজ হযরত দাউদ (আঃ)-এর ক্রন্দনের দিন, যারা এতে তাঁর সঙ্গে শরীক হতে ইচ্ছুক, তারা যোগ দিতে পারেন। তখন চার হাজার দরবেশ তাঁর নিকট হাযির হতেন, তিনি উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতেন এবং দরবেশরাও তাঁর অনুসরণ করতেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়তেন, তখন তাঁর পুত্র হযরত সোলায়মান (আঃ) এসে তাঁকে সেজদা থেকে তুলতেন, তিনি দু' হাতে তাঁর অশ্রু নিয়ে মুখমন্ডলে ফিরিয়ে নিতেন এবং বলতেন, 'হে আমার রব! আমার ক্রটি মাফ করুন'।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ক্রন্দনকে একত্রিত করা হয়, তবে একা হযরত দাউদ (আঃ)-এর ক্রন্দন তার সমান হবে।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেন, যে পর্যন্ত ফেরেশতা এসে তাঁকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ক্ষমা করার সুসংবাদ দেননি; সে পর্যন্ত তিনিও সেজদা

থেকে মাথা তোলেননি। এরপর সমগ্র জীবন তিনি তাঁর ত্রুটির জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্রন্দন করতে থাকেন।

আওজায়ী (রঃ) হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দাউদ (আঃ)-এর নয়ন যুগল পানির মশকের ন্যায় ছিল। সর্বক্ষণ তা থেকে অশ্রু ঝরতে থাকত। অশ্রু প্রবাহের কারণে তাঁর চেহারায় গর্ত হয়েছিল যেমন বারি বর্ষণের কারণে মাটিতে গর্ত হয়ে থাকে। যে পর্যন্ত পানিতে তাঁর চোখের পানি মিশিয়ে না নিতেন সে পর্যন্ত তিনি পানি পান করতেন না। এমনিভাবে তিনি রুটির টুকরো গুলোকে চোখের পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতেন। এর উপর লবনের ছিটা দিয়ে খেতেন এবং বলতেন, 'এটি গুনাহগারদের খাবার'। এ ঘটনার পূর্বে হযরত দাউদ (আঃ) একদিন পর একদিন রোজা রাখতেন, এরপর তিনি প্রতিদিনই রোজা রাখতেন। এমনিভাবে পূর্বে তিনি রাতের দু' তৃতীয়াংশ নিদ্রিত থাকতেন, কিন্তু এ ঘটনার পর তিনি সারা রাত এবাদতে মশগুল থাকতেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি যখন যবুর তেলাওয়াত করতেন তখন বন-জঙ্গলের চতুঃষ্পদ জন্তু পর্যন্ত তেলাওয়াত শ্রবণে একত্রিত হতো। কিন্তু এ ঘটনার পর চতুঃষ্পদ জন্তু এবং পশু-পক্ষী তেলাওয়াত শ্রবণে আসত না এবং বলতো, আপনার এ ত্রুটি আপনার কণ্ঠের মিষ্টভাগ ছিনিয়ে নিয়েছে।[১]

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি যে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি নবুওয়্যত ও রেসালতের দায়িত্ব পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঐ দায়িত্বের পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বের কথা ঘোষিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

'হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি মনোনীত করেছি'। এ বাক্যটিতে কয়েকটি কথা রয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১০৭-০৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৮৪
তফসীরে তাবারী খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৯০-৯৬

(এক) হযরত দাউদ (আঃ)-কে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মনোনীত করার ঘোষণা, বনী ইসরাঈলে কোন কোন ক্ষেত্রে যিনি নবী বা রসূল হতেন, তাঁকেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হতো, যেমন হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ) এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকের জন্যে

(দুই) আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে পৃথিবীতে তাঁর 'খলীফা' বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, রাষ্ট্র পরিচালক যিনি আল্লাহর প্রতিনিধি রূপে কাজ করেন তাঁর কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করা, আল্লাহ্ পাকের আইন জারী করা, মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার কায়েম করা। আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি হিসেবেই এসব পবিত্র দায়িত্ব রাষ্ট্র পরিচালককে যত্ন সহকারে পালন করতে হয়। আর এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্যেই হযরত দাউদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে দু'টি উপদেশ দেয়া হয়েছে।

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

'অতএব, তুমি জনসাধারণের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ক্ষমতা পরিচালনা কর'।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ক্ষমতা গ্রহণ ও পরিচালনা করার মূল লক্ষ্য হতে হবে ন্যায় বিচার কায়েম করা।

দ্বিতীয়তঃ ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালকের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হবে। ন্যায় বিচারের মূলনীতি সর্বদা সমুন্নত রাখতে হবে। ন্যায়-বিচারের প্রধানতম অন্তরায় হলো মানুষের প্রবৃত্তির তাড়না, মানুষের ভাবাবেগ, ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার অপপ্রয়াস, এসব কিছু পরিহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

'আর নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসারী হয়োনা'।

মানুষ যখন নিজের খেয়াল-খুশী মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে তখন সে হয় পথভ্রষ্ট। আর পথভ্রষ্ট ব্যক্তি অবশেষে কোপগ্রস্ত হয়। সে নিজেই তার সর্বনাশ ডেকে আনে। পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় মানব জাতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার এ দু'টি মূলনীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এ মূলনীতি পালন না করার যে শোচনীয় পরিণতি হবে তাও ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

'নতুবা তা তোমাকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিচ্যুত করবে'।

অর্থাৎ যদি নিজের খেয়াল-খুশী মাফিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যদি হক্ব ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য না রাখা হয়, যদি আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা না করা হয় তবে পথভ্রষ্ট হওয়া তথা আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়াই স্বাভাবিক। আর যারা এ অবস্থায় পতিত হয় তাদের পরিণতি ঘোষিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ۝

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাকের পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি, কেননা তারা হিসাবের দিনকে ভুলে রয়েছে'।

এ আয়াতে জীবন-সাধনার সাফল্যের রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে, আর তা হলো আখেরাতের স্মরণ। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকে অবশেষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে– একথা স্মরণ রেখে জীবন যাপন করলে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করলে হক্ব ও ইনসাফ কায়েম করা এবং সর্বক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে, কেউ যদি একথাটি ভুলে যায় এবং প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে সে পথহারা হয় এমনকি দিশেহারা হয় আর এমন ব্যক্তির সর্বনাশ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে অবধারিত।

এ পর্যায়ে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগের একটি ঘটনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাধারণতঃ হযরত ওমর (রাঃ) জনগণের অবস্থা পরিদর্শনের জন্যে প্রায়শঃ মদীনা শরীফ ও তার উপকণ্ঠে নৈশ ভ্রমণ করতেন। এক রাতে তিনি দেখলেন, এক বৃদ্ধা পানি গরম করছে আর কয়েকটি শিশু ক্রন্দন করছে, হযরত ওমর (রাঃ) তাদের ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধা বললেন, শিশুরা জঠর-জ্বালায় ক্রন্দন করছে, আর যেহেতু ঘরে খাবার বলতে কিছুই নেই, তাই আমি পানি গরম করছি, যাতে করে শিশুরা বোঝে যে খাদ্য বস্তু রান্না করা হচ্ছে। আর এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়বে। রাত কেটে যাবে। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন, তিনি ফিরে এলেন তাঁর

কর্মক্ষেত্রে এবং তাঁর গোলাম আসলামকে নির্দেশ দিলেন আটার একটা বস্তা তাঁর মাথায় তুলে দিতে। আসলাম বললেন, 'হুজুর এ খেদমতের জন্যে আমি হাযির'। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'না', বোঝাটি আমার মাথায় তুলে দাও। কেননা, কাল কেয়ামতের দিন এ ক্ষুধার্ত শিশুদের ক্রন্দনের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে আমাকেই জবাবদেহী করতে হবে, তোমাকে নয়'।

মূলতঃ যারা এভাবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে জবাব দানের জন্যে তৈরী হন, তারা হক্ব ও ইনসাফ কায়েম করতে পারেন।

খলীফা এবং আধুনিক রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে পার্থক্য

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এজালাতুল খেফা'য় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। একবার খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) বিখ্যাত সাহাবী হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যোবায়ের (রাঃ), হযরত কা'ব আহবার (রঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের মতে খলীফা এবং বাদশাহর মধ্যে পার্থক্য কি'? হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বললেন, 'খলিফা হলেন সে ব্যক্তি, যিনি জনগণের মধ্যে সুবিচার কায়েম করেন, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বিতরণ করেন, নিজের পরিবারবর্গকে যেভাবে স্নেহ করেন, ঠিক তেমনি জনগণকে স্নেহ করেন'। একথা শ্রবণ করে হযরত কা'ব (রঃ) বললেন, 'আমার ধারণা ছিল, আমি ব্যতীত একথাগুলো এ মজলিশে আর কেউ জানেন না'।

বর্ণিত আছে, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর মজলিসে বললেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে জানিনা আমি কি খলীফা, না বাদশাহ'। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন বললেন, 'হে আমীরুল মুমেনীন! খলীফা এবং বাদশাহর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। খলীফা হক্ব ও ন্যায় পন্থা ব্যতীত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করেন না, এমনিভাবে অন্যায়ভাবে ব্যয়ও করেন না, আর আলহামদুলিল্লাহ আপনি তেমনই। পক্ষান্তরে, বাদশাহ মানুষের প্রতি জুলুম করে, যেভাবে ইচ্ছা রাজকোষ থেকে ব্যয় করে'। একথা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রাঃ) নীরব হয়ে গেলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি কাঁদতে লাগলেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আমীরে মাবিয়া (রাঃ) বলতেন, 'খেলাফত অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করা বা ব্যয় করার নাম নয়; বরং তা হলো হক্ব ও ইনসাফের ভিত্তিতে কাজ করা এবং ন্যায় বিচার কায়েম করা এবং মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালনের জন্যে প্রস্তুত করা'।

আধুনিক কালে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হোক অথবা রাজতান্ত্রিক, সংসদীয় গণতন্ত্র হোক অথবা রাষ্ট্রপতি শাসিত, যদি খেলাফতের নিয়ম-নীতি পালন করা না হয়, তথা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মূলনীতির অনুসরণ না করা হয়, তবে এমন রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না, আর ইসলামী রাষ্ট্রে জনগণকে যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় তা পাওয়ারও আশা থাকেনা। ইসলামী রাষ্ট্রে জবাবদিহীতা মূলক সরকার কায়েম থাকে। এর প্রত্যেকটি কর্মকর্তা কর্মচারীর মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত থাকে। কাল কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদিহী করতে হবে- এ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকে, আর এ বিশ্বাসের কারণেই মানুষ সরল-সঠিক পথের অনুসারী হয়।

মূলতঃ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলাম যে মহান আদর্শ পেশ করেছে তার মূল কথাই হলো জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা, জনস্বার্থ রক্ষা করা, জনহিতকর কাজ করা এবং জনসাধারণের সকল দুঃখ-কষ্ট লাঘবে সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকা। এটিই রাষ্ট্র পরিচালক এবং তার প্রতিটি সহকর্মীর পবিত্র দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কাল কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে জবাবদেহী করতে হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته- الحديث

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ববান, আর প্রত্যেককে তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতএব, যে রাষ্ট্রনায়ক হবে, তাকে সে রাষ্ট্র এবং জনগণের স্বার্থের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর যে ব্যক্তি একটি পরিবারের পরিচালক, তাকে সে পরিবারভুক্ত লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন গৃহিনীকে তার স্বামীর গৃহ এবং সন্তান-সন্ততি সহ তার যথাসর্বস্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ

نعم الشيئ الامارة لمن اخذها- الحديث

'হুকুমত বা রাষ্ট্র পরিচালনা অত্যন্ত উত্তম কাজ, যদি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়, পক্ষান্তরে, এটি অত্যন্ত মন্দ কাজ, যদি তার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন না করা হয়। আর শেষ বিচারের দিন এটি হবে আক্ষেপ, অনুতাপ এবং অবমাননার কারণ'।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে মহান আদর্শ পেশ করেছেন তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই, তিনি ব্যক্তি স্বার্থকে

কোন অবস্থাতেই জাতীয় স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দেননি; আর তিনি এ আদর্শ শুধু প্রচারই করেননি; বরং নিজের বেলায়ও এ নীতিরই অনুসারী ছিলেন।

ক্ষমতা লাভের জন্যে প্রার্থী না হওয়ার নির্দেশ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্ষমতা লাভের জন্যে নিজেই প্রার্থী না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবদুর রহমান এবনে সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে আবদুর রহমান! তুমি ক্ষমতা লাভের জন্যে প্রার্থী হয়োনা, কেননা যদি তুমি নিজে প্রার্থী হয়ে ক্ষমতা লাভ কর, তবে তোমাকে তার দায়িত্ব পালনে আল্লাহ পাকের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হবে। পক্ষান্তরে, যদি নিজে প্রার্থী না হয়েও ক্ষমতা প্রাপ্ত হও, তবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঐ দায়িত্ব পালনে তোমাকে সাহায্য করা হবে। (বোখারী শরীফ)

যদি জনগণ কাউকে ক্ষমতা লাভের জন্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রার্থী করতে আগ্রহী হয় তবে তাতে রাজী থাকা অবৈধ নয়।

বর্তমান যুগে যেভাবে মানুষ ক্ষমতা লাভের জন্যে লালায়িত হয় এবং তার জন্যে বৈধ-অবৈধ পন্থায় তৎপরতা চালিয়ে যায়, তা আদৌ ইসলাম সমর্থন করেনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

عن ابى هريرة (رضـ) عن النبى صلى الله عليه وسلم ستحرصون على
الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعته وبئست الفاطمة-

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা অচিরেই ক্ষমতা লাভের জন্যে অত্যন্ত লালায়িত হবে, কেয়ামতের দিন ক্ষমতাবান হওয়া তোমাদের জন্যে লাঞ্ছিত, অপমানিত হওয়ার কারণ হবে। ক্ষমতার দুগ্ধ পানের দিনগুলো কত মনোরম, আর সেই দুগ্ধ ছুটবার সময় কত দুঃখজনক! (বোখারী শরীফ)

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, বসরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ এবনে জিয়াদ সাহাবী মা'কাল (রাঃ)-কে মৃত্যু শয্যায় দেখতে এসেছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমি আপনাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস শোনাতে চাই, যা আমি তাঁর নিকট থেকে শ্রবণ করেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন বন্দাকে আল্লাহ পাক কিছু সংখ্যক লোকের উপর শাসন ক্ষমতা দান করলে যদি সে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের সাথে মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা না করে, তবে সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবেনা। (বোখারী শরীফ)

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগে পতিত করবে, আল্লাহ পাক তাকে কেয়ামতের দিন দুর্ভোগে নিপতিত করবেন।

অতএব, ক্ষমতা লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয় নয়; যদি তার হক্ব আদায় না করা হয়। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে দু'টি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছেঃ

(এক) فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

'মানুষের মধ্যে হক্ব ও ইনসাফের সঙ্গে ফয়সালা কর'।

(দুই) وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

'নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করোনা', প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে কোন কাজ করোনা। সব কাজের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন, আর জনস্বার্থেই যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে হবে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًاؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ۝

'আমি আসমান জমীন এবং উভয়ের মধ্যকার কোন কিছুকেই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; যদিও কাফেররা তাই ধারণা করে, আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে দোযখের শাস্তি'।

বিশ্ব–সৃষ্টির গুঢ় রহস্য

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণের ঘোষণা রয়েছে। এর পাশাপাশি এ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালনের আদেশ দেয়া হয়েছে। আর এ সম্পর্কে রয়েছে সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ হেদায়েত, আর এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে বিশ্ব-সৃষ্টির গুঢ় রহস্য, যেহেতু এ পার্থিব জীবন পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রস্তুতি গ্রহণের একটা সুযোগ মাত্র, তাই যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, তাদের জীবন হয় সার্থক এবং সুন্দর। পক্ষান্তরে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা এবং পরকালীন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা, তারা হয় বিপদগ্রস্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ 'আমি আসমান জমীন এবং উভয়ের মধ্যকার কোন কিছুকেই অনর্থক সৃষ্টি করিনি'; বরং বিশ্ব সৃষ্টির পেছনে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে, আর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো যিনি নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মা'রেফাত হাসিল করা,

তাঁর পরিচিতি লাভ করা এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার চেষ্টা করা, কেননা সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এজন্যে অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ

'নিশ্চয় আসমান জমীনের সৃজণে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে স্রষ্টা ও পালনকর্তার বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে'; অতএব, যে বুদ্ধিমান সে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আত্মসমর্পণ করে এবং নিজের প্রবৃত্তির তাড়নাকে পরিহার করে, সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে। আত্ম-সংশোধনের মাধ্যমেই আত্মপরিচয় লাভ হয় আর আত্মপরিচয় লাভের পর স্রষ্টা ও পালনকর্তার মা'রেফাত বা পরিচয় লাভের পথ সুগম হয়। এজন্যেই বলা হয়েছেঃ

من عرف نفسه فقد عرف ربه

'যে নিজেকে চিনেছে, সে-ই তার প্রতিপালককে চিনেছে'।

আর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'আর আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু এজন্যে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা আমার পরিচিতি লাভ করে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতের শব্দটির يعبدون অর্থাৎ يعرفون মানুষ ও জ্বীন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, যেন তারা আমার মা'রেফাত হাসিল করে।

পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা মনে করে বিশ্বজগৎ এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, আবহমান কাল ধরে পৃথিবীতে মানুষ আসে এবং বিদায় গ্রহণ করে। জীবন ও মৃত্যুর এ প্রক্রিয়া এভাবেই অব্যাহত রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে, আখেরাতে তারা বিশ্বাস করেনা, আল্লাহ পাকের একত্ববাদে তারা আস্থা জ্ঞাপন করেনা, আসমান ও জমীনে তথা সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ পাকের যে অগণিত নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান রয়েছে তা তারা দেখেও দেখেনা, বুঝেও বোঝেনা, তাই এ আয়াতে তাদের জন্যে দোযখের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ নিখিল বিশ্বকে অযথা সৃষ্টি করা হয়নি; এমন সময় আসবে যখন ঈমানদার ও নেককার লোকদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, আর অবিশ্বাসী ও অবাধ্য লোকদেরকে কঠিন ও কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। কাফেররা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, বিশ্ব জগৎ অকারণেই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তারা আখেরাতেও বিশ্বাস করেনা, এজন্যে পরকালে তাদের জন্যে দোযখের শাস্তি অবধারিত রয়েছে।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যেভাবে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব জগৎ অহেতুক সৃষ্টি করা হয়নি; যেমনটি কাফেররা ধারণা করে, অন্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি এ ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে অযথাই সৃষ্টি করেছি? আর তোমরা কি আমার নিকট ফিরে আসবেনা'? অর্থাৎ তোমাদেরকে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সৃষ্টি করা হয়নি এবং তোমাদেরকে অবশ্যই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে।[২]

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ
نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ
الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ
تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَ
الْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৬০
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৮৮

তরজমা

(২৮) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আর যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, আমি কি তাদেরকে সমান করে দেব? আমি কি পরহেযগারদেরকে এবং পাপীষ্ঠদেরকে এক সমান গণ্য করবো?

(২৯) (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট এমনি একটি কিতাব নাযিল করেছি যা অত্যন্ত বরকতময়, যেন মানুষ তার আয়াত সমূহ অনুধাবন করে। আর বুদ্ধিমান লোকেরা তার উপদেশ গ্রহণ করে।

(৩০) আর আমি দাউদকে দান করেছি সোলায়মান, তিনি ছিলেন উত্তম বন্দা, নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার প্রতি অত্যন্ত তন্ময় চিত্ত।

(৩১) যখন বিকাল বেলা তাঁর সম্মুখে উত্তম উৎকৃষ্ট অশ্বগুলো পেশ করা হয়।

(৩২) তখন তিনি বলেন, আমি যে আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি। এমনকি, অবশেষে সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়।

(৩৩) এগুলোকে পুনরায় আমার নিকট হাযির কর, এরপর তিনি তাদের পা এবং গলদেশ ছেদন করতে লাগলেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আসমান জমীন এবং তার মধ্যকার সব কিছুকে আল্লাহ পাক অনর্থক সৃষ্টি করেননি; এসব কিছুর যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের নিরীখে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল ঈমানদার, নেককার, আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার, আরেক দল অবিশ্বাসী, অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, পাপীষ্ঠ।

ভাল-মন্দের বিচার অনিবার্য

আলোচ্য আয়াতে এ দু'দল মানুষের পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ۝

'যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আর যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, আমি কি তাদেরকে সমান করে দেব? আমি কি পরহেযগার এবং পাপীষ্ঠদের এক সমান গণ্য করবো'?

অর্থাৎ ঈমানদার, নেককার এবং বেঈমান ও বদকার কখনও এক সমান হতে পারেনা, যেমন আলো ও আঁধার এক সমান হতে পারেনা, মুত্তাকী, পরহেযগার এবং পাপীষ্ঠ সমান হতে পারেনা, যেমন ন্যায় এবং অন্যায়, হক্ব ও বাতিল এক সমান হতে পারেনা, নতুবা ন্যায়ের মূল্য থাকেনা, ইনসাফের মৃত্যু হয়। এজন্যে ঈমানদার ও নেককারদের শুভ পরিণতি অনিবার্য, আর বেঈমান ও পাপীষ্ঠদের শাস্তি অবধারিত। একজন আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের কারণে লোভ ও মোহ বর্জন করে, অন্যায়-অনাচার পরিহার করে, দুর্নীতি থেকে অনেক দূরে থাকে, দুঃখে-কষ্টে জীবন যাপন করে, তবে সততা এবং সত্যবাদিতা, ঈমানদারী ও আমানতদারী অক্ষুন্ন রাখে। পক্ষান্তরে, আরেকজনের মধ্যে ঈমান ও আনুগত্যের লেশ মাত্র নেই, হক্ব ও হালাল পন্থার ধারে কাছেও তার অবস্থান নেই, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত, ক্ষণিকের আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ। যদি ঈমানদার, সততা-পরায়ণ, সত্য-সাধক ব্যক্তির পুরস্কারের ব্যবস্থা না হয়, আর মহাপাপীর শাস্তিরও ব্যবস্থা না হয় তবে ভাল-মন্দ এক সমান হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, নেককার ও বদকার কখনো এক সমান হবেনা, দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করা হবে। বিচার হবে, সে বিচারের দিনক্ষণও রয়েছে নির্দিষ্ট, আর তা হলো কেয়ামতের দিন। পবিত্র কোরআনের ভাষায় যাকে 'ইয়াওমুল হিসাব' বলা হয়েছে, কাফেররা এই দিনকে অবিশ্বাস করেছে, তাই এ আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, যদি কেয়ামতের দিন না আসে, যদি ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা না হয়, তাহলে আমি কি ঈমানদার ও কাফেরকে এক সমান করে দেব? তা কখনো হতে পারেনা। নেককার ও বদকার কখনো এক সমান হবে না, এটি আল্লাহ পাকের নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ

এ আয়াতে কেয়ামতের দিনের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যারা বুদ্ধিমান, তারা এ সত্য অনুধাবন করে যে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর আসবে আরেকটি জীবন, যে জীবনে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য হবে, যে জীবনে ঈমানদার ও নেককারগণ চিরসুখী হবে, আর বেঈমান ও পাপীষ্ঠরা চিরদুঃখী হবে।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ ভাবে পৃথিবীর সমস্ত মোমেন ও কাফেরদের পরিণতি সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২০১

আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যারা ইসলাম কবুল করেছেন এবং চরম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন তাঁদের কথা বলা হয়েছে, যেমন হযরত আলী (রাঃ), হযরত হামজা (রাঃ) এবং হযরত ওবায়দা এবনুল হারস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। আর এ আয়াতে যে পাপীষ্ঠদের কথা বলা হয়েছে তারা হলো ওতবা, ওলীদ, শায়বা এবং আরো অনেকে, বদরের দিন যাদের শাস্তি হয়েছে।[১]

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ۝

'(হে রসূল!) আমি আপনার নিকট এমনি একটি কিতাব নাযিল করেছি যা অত্যন্ত বরকতময়, যেন মানুষ তার আয়াত সমূহ অনুধাবন করে। আর বুদ্ধিমান লোকেরা তার উপদেশ গ্রহণ করে'।

শানে নুযুল

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, মক্কার কাফেররা মুসলমানদেরকে বলতো, 'যদি আখেরাতে তোমাদেরকে কল্যাণ প্রদান করা হয়, তবে তার অংশ আমরাও পাব'।

কাফেরদের এ ভিত্তিহীন আস্ফালনের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভাল-মন্দ, নেককার-বদকার এক সমান হতে পারেনা, এমন অবস্থায় ভাল-মন্দের পরিণাম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে সতর্ক করা একান্ত প্রয়োজনীয়, আর এ উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে।

তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ.........

অর্থাৎ '(হে রসূল!) আপনার নিকট আমি এমন এক কিতাব নাযিল করেছি যা অত্যন্ত বরকতময়'। এ জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ অত্যন্ত কল্যাণময়, যদি কেউ কল্যাণকামী হয়, তবে সে অবশ্যই এ কিতাবে চিন্তা ও গবেষণা করবে এবং অর্জন করবে বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্যের মণি-মানিক্য, লাভ করবে সরল-সঠিক পথের নির্দেশনা এবং এ গ্রন্থে বর্ণিত উপদেশ গ্রহণ করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করবে। কেননা এ পৃথিবী হল মানুষের কর্মক্ষেত্র। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৮৯

الدنيا مزرعة الاخرة .

'দুনিয়া হল আখেরাতের শষ্যক্ষেত্র'।

দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের বীজ বপন করতে হবে, যারা সঠিক সময়ে জমিনে বীজ বপন করে তারাই যথা সময়ে ফসল ঘরে তুলে আনে। এ জীবনে যারা ঈমানদার অবস্থায় নেক আমল করবে আখেরাতের জীবনে তারাই সেই নেক আমলের ফল লাভ করবে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে দু'টি কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ لِيَدَّبَّرُوا اٰيٰتِهٖ অর্থাৎ যেন মানুষ কোরআনের আয়াত সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে। এজন্যে হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআনকে কণ্ঠস্ত করলো অথচ তার উপর আমল করলো না; সে পবিত্র কোরআনে চিন্তা ও গবেষণা করেনি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেনঃ কোরআনে করীম যত বারই পাঠ করা হোক তা পুরাতন মনে হয়না। তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম তাতে যত চিন্তা ও গবেষণা করুন না কেন তাতে তৃপ্তি লাভ হয়না; বরং অতৃপ্তি থেকে যায়। কেননা পবিত্র কোরআনে সর্বকালের সর্ব প্রকার সমস্যার সমাধান রয়েছে, সর্ব প্রকার জিজ্ঞাসার জবাব রয়েছে, এজন্যেই পবিত্র কোরআনের তত্ত্ব ও তথ্য শেষ হয়না, এতে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যারা বুদ্ধিমান, তারা পবিত্র কোরআনের উপদেশ গ্রহণ করে জীবনকে পবিত্র কোরআনের আলোকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান কে? জবাবে তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ যে মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য অধিকতর প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সে-ই সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান।

অতীব পরিতাপের বিষয় এই, বর্তমান যুগে বুদ্ধিমান মনে করা হয় সে সব লোককে যারা ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য না করে যে কোনভাবে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে বা ক্ষমতা লাভ করে বা উভয়টি অন্যদের চেয়ে বেশী লাভ করে, অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর শক্তি-সামর্থ্য, সম্মান, মর্যাদা, ঐশ্বর্য ও তার প্রাচুর্য এক কথায় সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান যখন অতর্কিতভাবে কার্যকর হয় তখন এখানকার সব সত্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদে সমৃদ্ধ হয় ও আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়, তবে দুনিয়ার এ সম্পদশালী ব্যক্তি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব হয়ে যায়, শুধু তাই নয়, বরং চরম বিপদগ্রস্ত হয়, আর এ বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ হল পবিত্র কোরআন থেকে শিক্ষা লাভ করে

তার উপর আমল করা। আর কিভাবে আমল করতে হবে তা হাতে কলমে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, এজন্যে তাঁর পরিপুর্ণ অনুসরণ করতে হবে, আর এটিই পরিপূর্ণ সাফল্য এবং কল্যাণের পথ।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ط نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗ اَوَّابٌ ﴿۳۰﴾

'আর আমি দাউদকে দান করেছি সোলায়মান, তিনি ছিলেন উত্তম বন্দা, নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার প্রতি অত্যন্ত তন্ময়-চিত্ত'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে প্রদত্ত দ্বীন দুনিয়ার নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় যে সব গুণাবলীর প্রয়োজন হয় আল্লাহ পাক তা তাঁকে দান করেছিলেন এবং এ পথে যে সব অন্তরায় থাকে সে সম্পর্কেও তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে। আর এসব কিছুর বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতে আরও একটি বড় নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, তা হল আল্লাহ পাক দাউদ (আঃ)-কে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ন্যায় পুত্র দান করেছেন, যাঁকে আল্লাহ পাক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের অনেক নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করা হয়নি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ........

আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে হযরত সোলায়মানের (আঃ) ন্যায় গুণবান পুত্র দান করেছেন, যিনি তাঁর নবুওয়্যতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। এজন্যে অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ

'হযরত দাউদ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী হয়েছেন হযরত সোলায়মান (আঃ)'। তিনি অত্যন্ত বড় এবাদত গুজার ছিলেন। আল্লাহ পাকের স্মরণে তিনি তন্ময় থাকতেন।

তফসীরকার মাকহুল (রঃ) বলেছেন, একবার হযরত দাউদ (আঃ) হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জবাব শ্রবণ করে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে বলেছেন, 'আপনি আল্লাহর নবী'। হযরত দাউদ (আঃ) জিজ্ঞাসা করেছেন, সর্বাধিক উত্তম বস্তু কি? সোলায়মান (আঃ) বললেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শান্তি ও তাঁর প্রতি ঈমান। এরপর দাউদ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে মন্দ বস্তু কি? সোলায়মান (আঃ) বললেন, ঈমানের পর কুফর।

দাউদ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে মিষ্ট জিনিষ কি? সোলায়মান (আঃ) আরজ করলেন, আল্লাহ পাকের রহমত। হযরত দাউদ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে শান্তিদায়ক জিনিস কি? হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ক্ষমা লাভ করা, আর মানুষের মধ্যে পরস্পরকে ক্ষমা করা।[১]

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾

'যখন বিকাল বেলা তাঁর সম্মুখে উত্তম অশ্বগুলো পেশ করা হয়'।

একবার হযরত সোলায়মান (আঃ) জেহাদের জন্যে মওজুদ অশ্বগুলোর তত্ত্বাবধান করছিলেন, দ্রুতগামী এ অশ্বগুলো দেখতে ছিল অতি সুন্দর, সময়টা ছিল বিকেল, অশ্বের তত্ত্বাবধানে সময় অতিবাহিত হয় এমনকি, সূর্য অস্তমিত হয় এবং হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আছরের নামাজ কাযা হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অশ্বগুলোর যে গুণের উল্লেখ রয়েছে, তা হলো অশ্বগুলো ছিল উত্তম এবং দ্রুতগামী।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) দামেশক এবং নাসিবাঈন নামক স্থানের অধিবাসীদের সঙ্গে যে জেহাদ করেছিলেন, এ অশ্বগুলো সে জেহাদ থেকে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ হিসেবেই পেয়েছিলেন। মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ অশ্বগুলো হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তবে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, মোকাতেল (রঃ)-এর একথাটি সঠিক নয়। কেননা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমরা নবীগণ কোন লোককে উত্তরাধিকারী করিনা, আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ আল্লাহ পাকের রাহে দান খয়রাত করা হয়।

কালবী (রঃ) বলেছেন, এ অশ্বগুলোর সংখ্যা ছিল এক হাজার।

আবদ এবনে হোমায়েদ, ফরিয়াবী, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম, ইব্রাহীম তাঈমীর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ অশ্বগুলোর সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। আবদ এবনে হোমায়েদ এবং এবনুল মুনজের আওফের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন যে, এ অশ্বগুলো ছিল ডানা বিশিষ্ট। সমুদ্র থেকে এগুলো আনা হয়েছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে। একরামা (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এ উত্তম, দ্রুতগামী এবং ডানা বিশিষ্ট সামুদ্রিক অশ্বগুলোর সংখ্যা ছিল বিশ হাজার।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৬০

হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর কুরসীতে উপবিষ্ট ছিলেন। সারিবদ্ধভাবে অশ্বগুলো তাঁর সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, নয়শত অশ্ব দেখার পর হঠাৎ তাঁর আছরের নামাযের কথা মনে হয়, কিন্তু তখন সূর্য অস্তমিত হয়ে পড়েছিল, তাঁর সম্মানের কথা বিবেচনা করে কেউ তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়নি, যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে, অশ্বের তত্ত্বাবধানে থেকে তাঁর নামায কাযা হয়ে গেছে তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত, অনুতপ্ত হন।

فَقَالَ اِنِّیْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّیْ ۚ حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۞

'তখন তিনি বলেন, 'আমি যে আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি'।

আলোচ্য আয়াতে ঐ অশ্বগুলোর উদ্দেশ্যে الخير। শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো 'কল্যাণ', কেননা অশ্বের সঙ্গে কল্যাণ জড়িত রয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামত পর্যন্ত অশ্বের ললাটের সঙ্গে কল্যাণ জড়িত থাকবে। আর কল্যাণ হলো জেহাদের সওয়াব এবং জেহাদ লব্ধ সম্পদ। হযরত সোলায়মান (আঃ) অশ্বের তত্ত্বাবধানে মশগুল থাকার কারণে যেহেতু তাঁর আছরের নামাজ কাযা হয়েছে, এজন্যে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এর দৃষ্টান্ত হলো পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধে মশগুল থাকার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন আছরের নামায আদায় করতে পারেননি। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফেই রয়েছে এ ঘটনার বিবরণ। হযরত ওমর (রাঃ) কাফেরদেরকে বদদোয়া করতে করতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন এবং আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি আছরের নামায আদায় করতে পারিনি', হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'আমিও আছরের নামায আদায় করতে পারিনি', অথচ তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত ওমর (রাঃ) তখন প্রথমে আছরের নামায এবং পরে মাগরেবের নামায আদায় করলেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হতে পারে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর শরীয়তে জেহাদের প্রয়োজনে নামায বিলম্বিত করার অনুমতি ছিল।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১১৩-১৪

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'সালাতুল খওফে'র বিধান প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই ছিল।

হযরত সোলায়মান (আঃ) নামায কাযা হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ব্যথিত হয়ে আদেশ দিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝

'ঐ অশ্বগুলোকে পুনরায় আমার নিকট হাযির কর, এরপর তিনি তাদের পা এবং গলদেশ ছেদন করতে লাগলেন'।

অর্থাৎ হযরত সোলায়মান (আঃ) ঐ অশ্বগুলোকে জবেহ করে দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), কাতাদা (রহঃ), মোকাতেল (রহঃ) এবং অধিকাংশ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

তেবরানী 'আল আওছাতে' এবং ইসমাঈল 'মুওযেমে' এবং এবনে মরদবিয়া হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে অশ্বগুলোকে জবেহ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে ক্ষণিকের জন্যে যে গাফলত হয়েছিল তা থেকে তওবা করার লক্ষ্যে, আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তিনি এ কাজ করেছেন। এর দৃষ্টান্ত হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী নামাযের অবস্থায় তাঁর মনে বাগানের খেয়াল এসেছিলো, এজন্যে নামায শেষ করেই তিনি ঐ বাগানটি আল্লাহর রাহে সদকা করেন।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই, জেহাদ আল্লাহ পাকের এবাদত আর জেহাদের প্রস্তুতিতে অশ্বের তত্ত্বাবধানও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। একটি এবাদতে মশগুল থাকার কারণে হযরত সোলায়মান (আঃ) আরেকটি এবাদতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঈমানের পর নামায হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, আর অশ্বের তত্ত্বাবধানের কারণে নামাযের কথা ভুলে যাওয়াকে হযরত সোলায়মান (আঃ) গুনাহ মনে করেছেন, আর যে অশ্বগুলোর কারণে এ ঘটনা ঘটেছে সে অশ্বগুলোকেই তিনি আল্লাহ পাকের রাহে কোরবানী করেছেন, হতে পারে সে যুগে অশ্বের গোশ্ত হালাল ছিল অথবা অশ্বের কোরবানী তখন জায়েয ছিল।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) অশ্বগুলোকে জবেহ করে গোশত খয়রাত করেছেন।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন অশ্বগুলোকে জবেহ করেন তখন আল্লাহ পাক (অশ্বের বদলে) তাঁকে এমন যানবাহন দান করলেন যা অশ্ব থেকে অনেক দ্রুতগামী অর্থাৎ আল্লাহ পাক বাতাসকে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত করে দিলেন।[১]

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ
اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ
بَعْدِىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ
رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّاٰخَرِيْنَ
مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ
اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾
اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ
اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৩৪) নিশ্চয় আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করি এবং তাঁর সিংহাসনে ফেলে দেই একটি ধড়, এরপর তিনি রুজু হয়ে যান।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১১৫
তফসীরে আদদুরুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬

(৩৫) সোলায়মান বলেন, 'হে পরওয়ারদেগার! আমাকে ক্ষমা কর এবং দান কর এমন এক সাম্রাজ্য যা আমার পর আর কারো জন্যে শোভা না পায়, নিশ্চয় তুমি তো পরম দাতা'।

(৩৬) তখন আমি বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিলাম। তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন, বাতাস সেখানে তাঁর আদেশ-ক্রমে চলতো।

(৩৭) এবং শয়তানদেরকে যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী, তাদের সবাইকে তাঁর অনুগত করে দেই।

(৩৮) এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেককে তাঁর অনুগত করে দেই।

(৩৯) এসবই আমার দান, তা থেকে তুমি অন্যকে দিতে পার অথবা নিজে রাখতে পার, এর জন্যে তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবে না।

(৪০) আর নিশ্চয় তাঁর জন্যে আমার নিকট রয়েছে অতি উচ্চ মর্যাদা এবং শুভ পরিণাম।

(৪১) আর স্মরণ কর আমার বন্দা আইউবকে, যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেন, 'হে পরওয়ারদেগার! শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে ও কষ্টে ফেলেছে'।

(৪২) আমি তাকে বললাম, 'তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো রয়েছে গোসলের সুশীতল পানি এবং পানীয়'।

(৪৩) আর আমি তাকে দান করলাম তাঁর পরিবার-পরিজনবর্গ এবং সে সঙ্গে তাদের সমান সংখ্যক আরো দান করলাম বিশেষ রহমতে এবং বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে (এ ঘটনা চিরস্মরণীয়) উপদেশ স্বরূপ (হয়ে থাকবে)।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে নবীপুত্র এবং রাজপুত্র। এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁকেও নবুওয়্যত ও রাজত্ব দান করেছিলেন। আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ করতেন। আর জেহাদের জন্যে প্রস্তুত দ্রুতগামী অশ্বগুলোর দেখা-শোনায় মশগুল থাকার কারণে তিনি নামাযের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এজন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে তিনি ঐ অশ্বগুলোকে আল্লাহ্ পাকের নামে কোরবান করে দেন এবং গোশ্‌তগুলো দান খয়রাত করেন।

এরপর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ۝

'নিশ্চয় আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করি এবং তাঁর সিংহাসনে ফেলে দেই একটি ধড়, এরপর তিনি রুজু হয়ে যান'।

আল্লাহ পাকের কুদরতের খেলা

এ আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর যে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে তা কোন্ পরীক্ষা? এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে যে বিবরণ স্থান পেয়েছে তা এই, হযরত সোলায়মান (আঃ) শপথ করেন, 'আমি আজ রাত আমার স্ত্রীদের নিকট যাব, তাদের প্রত্যেকের ঘরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তারা বড় হয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করবে'। কিন্তু একথা বলার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। যেহেতু নবী রসূলগণের মর্যাদা অনেক উচ্চে তাই এতটুকু ভুলও তাঁদের পক্ষে অনেক বড় ভুল, এজন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে এবং তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর একশত স্ত্রীর মধ্যে একজন মাত্র অন্তস্বত্বা হয়েছেন, আর তিনি যা প্রসব করেন তা ছিল একটি অপূর্ণ শিশুর ধড় মাত্র, এখানেই প্রমাণিত হয় মহান আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর লীলাখেলা, আল্লাহ পাক দান না করলে কেউ সন্তান লাভ করেনা, যে যত বড় মর্যাদা সম্পন্ন হোক না কেন এবং যত বড় শক্তিধরই হোক না কেন, সকলেই একমাত্র আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন এবং সর্বক্ষণ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। এ পৃথিবীতে যা কিছু হয় তা একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতেই হয়, আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জি না হলে কিছুই হয়না, এজন্যেই সে সময় হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর কোন সন্তান হলোনা। ধাত্রী সেই অপূর্ণ শিশুর ধড়টি এনে তাঁর সিংহাসনের উপর রেখে বললো, 'এই হলো আপনার শপথের ফল', তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا

'এবং তাঁর সিংহাসনের উপর ফেলে দেই একটি ধড়'। হাত পা ব্যতীত একটি মানব শিশুর অপূর্ণ দেহ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সম্মুখে রাখা হয়, তিনি তা দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হন।

ثُمَّ اَنَابَ

'এরপর তিনি আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ করেন'।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) শপথ করার সময় যদি 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তবে আল্লাহ পাক তাঁর শপথ পূর্ণ করার তওফিক দান করতেন, তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো এবং তাঁর আশা পূর্ণ হতো।

অবশ্য হযরত সোলায়মান (আঃ) মানব শিশুর ধড়টি দেখা মাত্রই উপলব্ধি করলেন যে, আমি 'ইনশাআল্লাহ' না বলে নিজেরই বিরাট ক্ষতি করেছি, অতএব মোমেন মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে কথা বলা, অর্থাৎ 'ইন্শাআল্লাহ' বলে নিজের মনোবাসনা প্রকাশ করা। এতদ্ব্যতীত, সাফল্য লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই হযরত সোলায়মান (আঃ) সত্য উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মোহাম্মদ এবনে এসহাক ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) জানতে পারেন যে, সমুদ্রের মাঝে 'সাইদুন' নামক একটি দ্বীপ রয়েছে, সেখানে স্বাধীন রাজা রয়েছে, চতুর্দিকে সমুদ্র থাকার কারণে কেউ সেখানে পৌঁছতে পারেনা। হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক বাতাসের উপর ক্ষমতাবান করেছিলেন, তিনি তাঁর হাওয়াই জাহাজে উড়ে সেখানে গমন করেন, যুদ্ধে রাজা পরাজিত হয়, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের সঙ্গে রাজার জোরাদা নাম্নী কন্যাটিও আসে, হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁকে বিয়ে করেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন শৌচাগারে গমন করতেন তখন তাঁর হাতের আংটিটি জোরাদার নিকট রেখে যেতেন। কেননা, তাতে আল্লাহ পাকের 'এসমে আজম' লিপিবদ্ধ ছিল। একদিনের ঘটনা। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর আংটিটি জোরাদার নিকট রেখে শৌচ কর্ম সম্পন্ন করতে গিয়েছেন, ঐ মুহূর্তে 'সখর' নামক এক জ্বীন অবিকল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আকৃতি ধারণ করে হাযির হয় এবং জোরাদার নিকট থেকে আংটিটি নিয়ে নেয় এবং তাঁর সিংহাসনে আসীন হয়। এদিকে হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন ফিরে এসে তাঁর আংটি তলব করলেন, তখন জোরাদা তাঁকে বললো, 'আমি তাঁকে আংটি দিয়ে দিয়েছি', তিনি বললেন, 'আমিই তো সোলায়মান, তুমি কাকে আংটি দিয়েছ'? এরই মধ্যে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসে, যার সম্মুখেই তিনি গমন করতেন, কেউ তাঁকে চিনতে পারতো না। অন্যদিকে 'সখর' তাঁর সিংহাসনে আসীন হয়ে ক্ষমতা পরিচালনা করতে থাকে। যারা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর পরীক্ষা স্বরূপ

এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তারা আলোচ্য আয়াতাংশের وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ব্যাখ্যায় বলেন, 'আর আমি তাঁর সিংহাসনে একটি দেহ ফেলে দিয়েছি', অর্থাৎ 'সখর' নামক জ্বীন তাঁর সিংহাসনে আসীন হয়েছে।

হযরত সোলায়মান (আঃ) এ অবস্থা দেখে ভীত হলেন এবং উপলব্ধি করলেন, হয়তো এটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন পরীক্ষা, তাই তিনি তখন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হলেন এবং দোয়া করতে লাগলেন।

ثُمَّ أَنَابَ

(এরপর তিনি আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করেন)

এ অবস্থায় চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি দয়া করেন, তাঁর দরবারী লোকদের মধ্যে সোলায়মান (আঃ)-এর বেশধারী জ্বীন সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে, তার আচরণে সবার মনে সন্দেহ ঘণীভূত হয়, ধর্মযাজকগণ সিংহাসনের চারিপার্শ্বে তৌরাত পাঠ করতে শুরু করেন, এতে করে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আকৃতি ধারণকারী 'সখর' সিংহাসন ছেড়ে পলায়নে বাধ্য হয়। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আংটিটি সে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, যা একটি মাছ গিলে ফেলে।

এদিকে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে যখন কেউ স্বীকৃতি দিলনা, তখন তিনি সমুদ্র তীরে এসে সাধারণ শ্রমিকের বেশে কাজ করতে থাকেন। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তি সমুদ্র তীর থেকে কিছু মাছ ক্রয় করলো, বাহক হিসেবে তাঁকে নিল, তার কেনা মাছ তিনি বাড়ী পৌঁছে দিলেন, ঐ ব্যক্তি পারিশ্রমিক হিসেবে দু'টি মাছ তাঁকে দিয়ে দেয়। হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন মাছটি কাটেন তখন তার পেট থেকে হারিয়ে যাওয়া আংটিটি বের হয়। হযরত সোলায়মান (আঃ) আংটিটি হাতে দেয়া মাত্র তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয়, রাজত্ব আবার তাঁর হাতে চলে আসে, সমস্ত জ্বীন এবং মানুষ তাঁর অনুগত হয়, পাখীরা যথারীতি তাঁর উপর ছায়া ফেলতে থাকে। এভাবে তাঁর পরীক্ষা সমাপ্ত হয়।[১]

অবশ্য কোন কোন তফসীরকার এ ঘটনার সত্যতাকে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা বলেছেন, পূর্বোল্লেখিত ঘটনাটিই হলো সঠিক এবং প্রামাণ্য। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর শপথের সময় 'ইনশাআল্লাহ' না বলার কারণেই তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হন। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁকে ক্ষমা করেন।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৯৮-৯৯
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৪১
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১
তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২০৭-০৮

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর একশত স্ত্রীর মধ্যে একজনের নাম ছিল জোরাদা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আমানতদার। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁকে সর্বাধিক পছন্দ করতেন। যখন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতেন তখন জোরাদার নিকটই আংটিটি রেখে যেতেন। একদিন জোরাদা আরজী পেশ করলো, 'আমার ভাইয়ের সঙ্গে অন্য একটি লোকের ঝগড়া রয়েছে, আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, যখন আমার ভাই আপনার নিকট হাযির হয়, তখন আপনি তার পক্ষে রায় দিয়ে দিন'। হযরত সোলায়মান (আঃ) সম্মতি দিলেন। এভাবে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন যে, তাঁর ভাইয়ের পক্ষে তিনি রায় দেবেন, কিন্তু পরে তিনি তা করেননি, আর এজন্যেই হযরত সোলায়মান (আঃ) পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।[১]

সাঈদ এবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) একাধারে তিনদিন পর্যন্ত জনসমক্ষে আসেননি। তখন আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, তুমি তিন দিন একাধারে আমার বন্দাদের থেকে দূরে রয়েছ, তাদের ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করনি, এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন।

আবদ এবনে হোমায়েদ, নাসায়ী এবং এবনে মরদবিয়া ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ)-এর বর্ণনার ন্যায় এ ঘটনাটিও বর্ণনা করেছেন। আর একথাও লিখেছেন যে, এ ঘটনা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ঘটনা যা-ই হোক, আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে ক্ষমা করেছেন।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

সোলায়মান বলেন, 'হে পরওয়ারদেগার! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক সাম্রাজ্য, যা আমার পর আর কারো জন্যে শোভা না পায়। নিশ্চয় তুমিই তো পরম দাতা'।

নবী রসূলগণ এবং নেককারগণের পছন্দনীয় পন্থা হলো সর্ব প্রথম তাঁরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এরপর যদি কিছু চাওয়ার থাকে, তার

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১২০

জন্যে আরজী পেশ করেন। হযরত সোলায়মান (আঃ)-ও তাই করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এরপর আরজী পেশ করে বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান কর যে, আমার পরে কেউ যেন এমন সাম্রাজ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন না করতে পারে'। এভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ) অনন্য-সাধারণ রাজত্ব লাভের জন্যে আরজী পেশ করেন।

বর্ণিত আছে, সে যুগে রাজা-মহারাজাদের দাপট ছিল অনেক বেশী। তাই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এ দোয়া ছিল সম্পূর্ণ যুগোপযুগী।

এতদ্ব্যতীত হাদীস শরীফে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের জন্যে একটি দোয়ার সুযোগ রয়েছে, যা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অবশ্যই কবুল হয়। সমস্ত নবী রসূলগণ দুনিয়াতেই তাঁদের সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ঐ দোয়া করেছেন, কিন্তু আমি ঐ দোয়ার সুযোগটি কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্যে রেখে দিয়েছি, দুনিয়াতে ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিনি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে দোয়ার উল্লেখ রয়েছে, তা হলো সেই দোয়া, যার কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে।

তফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল, মূলতঃ তা ছিল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একটি পরীক্ষা, যাতে করে দুনিয়া এবং আখেরাতে তাঁর মর্তবা বুলন্দ করা হয়। যেমন, হযরত আইউব (আঃ)-এর প্রতি যে বিপদ এসেছিল, তা-ও তাঁর মর্তবা বলুন্দ করার লক্ষ্যেই এসেছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ ক্ষমতা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একটি দুষ্ট জ্বীন রাত্রে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আমার নামায বিনষ্ট করতে এসেছিল, আল্লাহ পাক তার উপর আমাকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে ধরে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেধে রাখি, যাতে করে তোমরা সকালে এসে তাকে দেখতে পাও, কিন্তু এরপর আমার ভাই সোলায়মান (আঃ)-এর দোয়ার কথা আমার মনে হলো, তিনি দোয়া করেছিলেন–

وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ

(হে পরওয়ারদেগার! আমাকে দান কর এমন এক সাম্রাজ্য যা আমার পর আর কারো জন্যে শোভা না পায়।)

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর একথা স্মরণ হওয়ার কারণে আমি ঐ দুষ্ট জ্বীনটিকে ছেড়ে দেই।

মানুষের কল্যাণেই ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আরজী

কারো মনে এ ভ্রান্ত ধারণা যেন না হয় যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর শৌর্য-বীর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এ দোয়া করেছেন। মূলতঃ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের দ্বীন প্রতিষ্ঠা, তাঁর মহিমা প্রকাশ এবং মানুষের কল্যাণ সাধনের খাতিরেই তিনি এ দোয়া করেছেন। এজন্যে যে, নবী রসূলগণ দুনিয়াদারীর উদ্দেশ্যে কখনো ক্ষমতা পরিচালনা করেননি; তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানুষের কল্যাণ সাধন।

বস্তুতঃ যে ব্যক্তির মন সর্বদা আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় থাকে, যার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কোন প্রকার লোভ-লালসা না থাকে, সে যখন ক্ষমতা লাভ করে তখন জনগণের কল্যাণের জন্যেই তার ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়, কেননা সে বিশ্বাস করে সার্বিক কল্যাণ, পরিপূর্ণ সাফল্য ভোগে নয়; ত্যাগে। আর এজন্যেই হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অনন্য-সাধারণ ক্ষমতার জন্যে আরজী পেশ করেছিলেন।

একটি সন্দেহ ও তার নিরসন

কারো মনে এমন সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনন্য-সাধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতা এবং মর্যাদা দান করেছেন। প্রকৃত অবস্থা তা নয়; বরং একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) সহ সমস্ত নবী রসূলগণের চেয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সর্বাধিক, তিনি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চে, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব, তিনিই প্রথম নবী এবং তিনিই সর্বশেষ নবী, তিনি নবুওয়্যত লাভ না করলে কোন মানুষের পক্ষে নবী রসূল হওয়া সম্ভবই হতোনা। অন্য নবীগণ যেমন হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতভুক্ত হবার জন্যে আরজী পেশ করেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর আবেদন গ্রহণ করেছেন। শেষ জমানায় তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং আমাদের

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতভুক্ত হয়ে গৌরবান্বিত হবেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ) যে ক্ষমতার জন্যে মুনাজাত করেছেন এবং যা তাঁকে প্রদান করা হয়েছে, এমন ক্ষমতা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়নি এমন নয়; বরং আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যতের পাশাপাশি বাদশাহাতও দান করেছেন, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা নিজের জন্যে পছন্দ করেননি, তিনি বাদশাহাত থেকে ফকিরীকেই বেশী ভালবেসেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে ওহোদ পাহাড় স্বর্ণে রূপান্তরিত করার এবং তা ভ্রাম্যমাণ স্বর্ণের পাহাড় হিসেবে তাঁর সঙ্গে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিনীত ভাবে আবেদন করেন, 'আমি স্বর্ণের পাহাড় চাইনা, আমি একদিন আহার করে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতে চাই, আরেক দিন অভুক্ত থেকে সবর অবলম্বন করতে চাই'।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে জ্বীনদের উপর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, এমনি ক্ষমতা আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও দিয়েছেন, সেজন্যেই পূর্বোক্ত হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ঐ দুষ্ট জ্বীনকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি সে ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি; জ্বীন ও মানব জাতি এমনকি সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপরে আল্লাহ পাক তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তিনি ডাকলে বৃক্ষগুলো দ্রুতবেগে তাঁর নিকট হাযির হতো, এজন্যেই কবি বলেছেনঃ

تاتى بدعوته الاشجار ساجدة
تمشى اليه على ساق لاقدم

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ডাকে বৃক্ষগুলো সেজদারত অবস্থায় তাঁর নিকট হাযির হতো, তাদের পা থাকেনা, তবুও তারা ডালার সাহায্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হতো।

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

'নিশ্চয় তুমিই তো পরম দাতা'। তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে থাক, তুমি দান করার ইচ্ছা করলে কেউ বাধা দিতে পারেনা, আর তুমি দান না করলে কেউ দিতেও পারেনা।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দোয়া সম্পর্কে আরো কিছু কথা

পবিত্র কোরআনে নবী রসূলগণের যে অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি চিন্তা ও গবেষণা করলে জানা যায় যে, নবী রসূলগণ আল্লাহ্ পাকের নিকট যা কিছুর জন্যে আরজী পেশ করেন তা আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ক্রমেই করেন, আল্লাহ্ পাকের অনুমতি নেই, এমন কিছুর জন্যে তাঁরা আরজী পেশ করেন না।

হযরত সোলায়মান (আঃ) এর জমানায় অনেক অত্যাচারী রাজা-বাদশাহ ছিল। আর আল্লাহ্ পাকের এটিই ব্যবস্থা, যে যুগে যে নবীকে প্রেরণ করেন তাঁকে সে যুগের উপযোগী মোজেযা প্রদান করেন। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদু বিদ্যার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী, আর এ কারণেই হযরত মূসা (আঃ)-কে লাঠির মোজেযা দেয়া হয়েছে। ফেরাউনের আহুত যাদুকরদের ছেড়ে দেয়া লক্ষাধিক সাপকে হযরত মূসা (আঃ)-এর অজগর রুপী লাঠিটি নিমেষেই গিলে ফেলে। ঠিক এমনিভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর যুগে পৃথিবীতে রাজা মহা-রাজাদের দৌরাত্ম ছিল। তারা আল্লাহর বন্দাদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন চালাতো। তাই আল্লাহ্ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে অনন্য-সাধারণ রাজকীয় ক্ষমতা প্রদান করেন, এটি ছিল তাঁর মোজেযা, এর দ্বারা দ্বীনের তবলিগ এবং মানুষের কল্যাণ সাধনই উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁর এ ক্ষমতা জালেমদের জুলুম বন্ধ করার ব্যাপারে কার্যকর হয়েছিল। হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর রাজত্ব দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হবার চেষ্টা করতেন না, দ্বীন ইসলামের সত্যতা প্রকাশ, মানবতার বিকাশ সাধনই ছিল এর মূল লক্ষ্য।

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝

'তখন আমি বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিলাম, তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন, বাতাস সেখানে তাঁর আদেশক্রমে চলতো'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিলেন, দ্রুতগামী অশ্বের আর তাঁর কোন প্রয়োজন রইলনা। জেহাদের জন্যে প্রস্তুত অশ্বগুলোর তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থাকায় তাঁর নামায কাযা হয়েছে, এ দুঃখ-বেদনা এবং অনুতাপে তিনি অশ্বগুলোকে আল্লাহ্ পাকের নামে কোরবান করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এমন ক্ষমতার জন্যে মোনাজাত করেছিলেন যা আর কাউকে দেয়া হবেনা। তাঁর এ দোয়া কবুল করেই আল্লাহ্ পাক বায়ুমন্ডলকে তাঁর অনুগত করে দেন। ফলে তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক বাতাস তাঁর সিংহাসনকে সৈন্য-সামন্ত সহ উড়িয়ে নিয়ে যেত। তিনি সকালে এক

ঘন্টায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন, এমনিভাবে বিকেলেও এক ঘন্টায় এক মাসের পথ ভ্রমণ করতেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দোয়া

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে এরশাদ করলেনঃ তোমার কোন প্রয়োজন থাকলে আমার নিকট বল। হযরত সোলায়মান (আঃ) আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমাকে এমন অন্তর দান কর, যা সর্বক্ষণ তোমাকে ভয় করতে থাকে, যেমন আমার পিতা সর্বদা তোমাকে ভয় করতেন। আর আমার অন্তরে তোমার মহব্বত দিয়ে দাও, যেমন তা আমার পিতার অন্তরে ছিল'।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এ আরজী শ্রবণ করে আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন যে, আমার বন্দা আমার নিকট আমার ভয় এবং মহব্বতের জন্যে আরজী পেশ করে। আমার পবিত্র সত্ত্বার শপথ! আমি তাঁকে এমন রাজত্ব দান করবো, যা তাঁর পরে আর কাউকে দান করা হবেনা। এরপর আল্লাহ পাক বাতাসকে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত করে দেন, শুধু তাই নয়; বরং ইমারত নির্মাতা ও ডুবুরী জ্বীনদেরকেও আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত হতে বাধ্য করেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ۝

'এবং শয়তানদেরকে যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী, তাদের সবাইকে তাঁর অনুগত করে দেই'।

অর্থাৎ ইমারত নির্মাণে যে সব দৈত্য-দানব পারদর্শী ছিল এবং সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে অতি মূল্যবান মণি-মুক্তা আহরণে সুদক্ষ ডুবুরী দৈত্য-দানবদেরকেও আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত করেন।

وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ۝

'এবং শৃংখলাবদ্ধ আরো অনেককে তাঁর অনুগত করে দেই'।

অনেক দৈত্য-দানবকে তাদের দুস্কৃতি এবং দৌরাত্মর জন্যে হযরত সোলায়মান (আঃ) পায়ে জিঞ্জির বেধে বন্দী করে রেখেছিলেন, আল্লাহ পাক এমন ক্ষমতাও হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে দান করেছিলেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) জ্বীনদেরকে দু'দলে বিভক্ত করেছিলেন, একদলকে বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করার কঠিন দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, আর যে সব দুষ্কৃতকারী দৈত্য-দানব ছিল, তাদেরকে জিঞ্জির দ্বারা আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, যাতে করে মানুষ তাদের দৌরাত্ম থেকে রক্ষা পায়। একথাও বর্ণিত আছে, ইতিহাসে হযরত সোলায়মান (আঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণি-মুক্তা সংগ্রহ করিয়ে ছিলেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক যখন দৈত্য-দানবের উপর প্রচন্ড ক্ষমতা দান করেছেন, এমন অবস্থায় ইবলিসকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন কেন করেননি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাবে বলেছেন, সৃষ্টির প্রথম দিন যখন আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি মনোনীত করেন এবং ইবলিস শয়তানকে অভিশপ্ত ঘোষণা করেন, তখন ইবলিস শয়তান কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের অবকাশ চেয়েছিল, আল্লাহ পাক তাকে অবকাশ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেনঃ

اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ

(কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো।)

যেহেতু পূর্বেই আল্লাহ পাক এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই ইবলিসকে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়নি।

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۝

'এসবই আমার দান, তা থেকে তুমি অন্যকে দিতে পার, অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্যে তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবেনা'।

আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে বলেন, রাজত্ব, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, বায়ুমন্ডলের নিয়ন্ত্রণ এবং তোমার প্রতি দৈত্য-দানবদের আনুগত্য-এসবই তোমার প্রতি আমার দান। এ থেকে কাউকে কিছু দেয়া না দেয়া তোমার ইচ্ছাধীন, এজন্যে আমার নিকট তোমাকে কোন কৈফিয়ত দিতে হবেনা, কোন হিসাবও দিতে হবেনা, তোমাকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা আর কাউকে দেয়া হয়নি, তোমার ইচ্ছা হলে তুমি তা থেকে কাউকে কিছু দিতেও পার, আর ইচ্ছা হলে না-ও দিতে পার, তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা, 'কেন দিয়েছ?' অথবা 'কেন দাওনি'?

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যাদেরকে দুনিয়ার নেয়ামত দান করেন, যদি সে নেয়ামতের শোকর গুজারী না করা হয়, অথবা নেয়ামতের সদ্ব্যবহার না করা হয়, তবে ঐ নেয়ামতের পরিণতি হয় শোচনীয়। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী, আল্লাহ পাক তাঁকে এ অধিকার দিয়েছেন যে, যদি তিনি কাউকে প্রদত্ত নেয়ামত থেকে কিছু দান করেন, তবে তাঁর সওয়াব হবে। আর যদি কাউকে কিছু দান না করেন, তবে এজন্যে তাঁকে জবাবদেহী করতে হবেনা।

আলোচ্য আয়াতের بِغَيْرِ حِسَابٍ কথাটির আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, অর্থাৎ হে সোলায়মান! আমি তোমাকে অগণিত নেয়ামত দান করেছি।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, দৈত্য-দানবদের অনুগত হওয়া হে সোলায়মান! এটি তোমার প্রতি আমার বিশেষ দান। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি তাদের কাউকে ছেড়েও দিতে পার, অথবা সবাইকেই তোমার অনুগত করে রেখে দিতে পার। যদি তুমি কাউকে ছেড়ে দাও, অথবা সবাইকে বন্দী করে রাখ, তবে এজন্যে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেনা।

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۞

'আর নিশ্চয় তাঁর জন্যে আমার নিকট রয়েছে অতি উচ্চ মর্যাদা এবং শুভ পরিণাম'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে এ পার্থিব জীবনে যে সব নেয়ামত দেয়া হয়েছে, তার উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে তাঁর আখেরাতের নেয়ামতের বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও তার প্রাচুর্য যেমন তাঁকে দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি আখেরাতেও তিনি হবেন আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য। তিনি লাভ করবেন আখেরাতে অতি উচ্চ মর্যাদা এবং শুভ-পরিণাম।

বিস্ময়কর

বর্ণিত আছে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রভূত শান-শওকতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবনে এর দ্বারা উপকৃত হতেন না; বরং তিনি স্বহস্তে ঝুড়ি তৈরী করতেন এবং তা বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মানব স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য এই, দুনিয়ার ভোগ-সম্পদে মুগ্ধ থাকার কারণে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফলত হয়ে থাকে। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ) এ

ব্যাপারেও ছিলেন ব্যতিক্রম, তিনি সর্বদা আল্লাহ পাকের স্মরণে থাকতেন তন্ময়। কখনো আল্লাহ পাকের জিকর থেকে গাফেল হতেন না, আর এজন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ

(আর নিশ্চয় তার জন্যে আমার নিকট রয়েছে অতি উচ্চ মর্যাদা এবং শুভ পরিণাম।)

এতে একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব এবং ঐশ্বর্য আল্লাহ পাকের স্মরণের ব্যাপারে গাফলতের কারণ হতে পারেনি। তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য থাকতেন। এজন্যে বিখ্যাত মরমী কবি খাকানী (রঃ) বলেছেনঃ

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی
که اك دم با خدا بودن به از تخت سلیمانی

"ত্রিশ বছরের অক্লান্ত সাধনার পর খাকানী এ সত্য উপলব্ধি করেছে যে, এক মুহূর্ত আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় থাকা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনে বসে রাজত্ব করার চেয়েও উত্তম"।

বলাবাহুল্য, এ সত্য হযরত সোলায়মান (আঃ)-ই সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করেছিলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) একবার তাঁর উড়োজাহাজে করে ভ্রমণ করছিলেন, একজন কৃষিজীবী মানুষ তাঁর শান-শওকতের ঐ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে বিস্মিত হল। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তখন তার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় 'সোবহানল্লাহি বিহামদিহী', বাতাস তা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছে দেয়। হযরত সোলায়মান (আঃ) তৎক্ষণাৎ সেখানেই অবতরণ করেন এবং লোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আমাকে উড়ে যেতে দেখে কি বলেছিলে'? হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে দেখে সে রীতিমত ভীত হয়ে পড়ে, তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে সে অক্ষম হয়, তখন তিনি বলেন, 'তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনে ফেলেছি, তবে তোমার নিকট তা আবার শুনতে চাই'। তখন সে বলে, 'হুজুর, আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার রাজকীয় বহর দেখে আমি আশ্চর্যন্বিত হয়েছি এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবেই আমার কণ্ঠ থেকে 'সোবহানাল্লাহি বিহামদিহী' বের হয়েছে', হযরত সোলায়মান (আঃ) তখন বললেন, 'তোমার এই একবার সোবহানাল্লাহি বিহামদিহী পাঠ করা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমার রাজত্ব থেকে অনেক বেশী মূল্যবান'।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۞

'আর স্মরণ কর আমার বন্দা আইউবকে, যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেন, 'হে পরওয়ারদেগার! শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে ও কষ্টে ফেলেছে'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং তাঁকে যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত আইউব (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এবং তাঁকে যে পরীক্ষা করা হয়, তার বর্ণনা রয়েছে। বিশেষতঃ হযরত আইউব (আঃ)-এর সংকল্পের দৃঢ়তা এবং কঠিন বিপদের মুখেও তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণের উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আইউব (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নবী হওয়া সত্ত্বেও রোগের বর্ণনাতীত কষ্ট এবং চরম অভাব-অভিযোগের সময় তাঁর অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে যে আদর্শ হয়ে রয়েছে, তারও বিবরণ রয়েছে এ আয়াতে। এরপর আল্লাহ্ পাক কিভাবে তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করেছেন তা-ও বিশ্ববাসীর জন্যে হয়ে রয়েছে এক শিক্ষণীয় বিষয় যা আলোচ্য আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) কীভাবে তাঁর শোকর আদায় করেছেন, তার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত আইউব (আঃ) তাঁর কঠিন বিপদের সময় কীভাবে সবর করেছেন। শোকর এবং সবর-দু'টি গুণই একান্ত জরুরী, দু'টিই আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি এবং সান্নিধ্য লাভের উপকরণ, তাই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনার পর হযরত আইউব (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ

'আর স্মরণ কর আমার বন্দা আইউবকে'।

হযরত আইউব (আঃ) আল্লাহ্ পাকের অত্যন্ত প্রিয় বন্দা এবং নবী ছিলেন। তাঁর আবাস ছিল প্যালেষ্টাইনের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত 'এওয়াজ' নামক স্থানে। তাঁর বয়স হয়েছিল ২১০ বছর। তৌরাতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে এভাবেঃ 'এওয়াজ এলাকায় আইউব নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল সত্যবাদী। আল্লাহকে ভয় করতো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকত'।[১]

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯১২

নবী হওয়ার পাশাপাশি হযরত আইউব (আঃ) অত্যন্ত স্বচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাত পুত্র এবং তিন কন্যার জনক ছিলেন। ৩০০০ উষ্ট্র ও ৭০০০ দুম্বার মালিক ছিলেন তিনি। পাঁচশ' জোড়া গরু ছিল তাঁর। এছাড়া পাঁচশ' গাধাও ছিল। তাঁর এলাকায় তাঁর চেয়ে বিত্তবান অন্য কেউ ছিলনা। চাকর-বাকরের সংখ্যাও ছিল অনেক। কিন্তু হঠাৎ তিনি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাঁর জমির ফসল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গৃহপালিত জন্তুগুলো আর বেঁচে রইল না। শত্রুরা তাঁর চাকর-বাকরকে মেরে ফেলে। বাড়ীর ছাদ ভেঙে পড়ার কারণে সন্তান-সন্ততি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হযরত আইউব (আঃ) এমন কঠিন অবস্থায় সবরের প্রতীক হয়ে রইলেন, ইতোমধ্যে তিনি নিজেও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন, অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে রইল না, এমনি অবস্থায় তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত অবস্থায় আরজী পেশ করলেনঃ

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

'যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলেন, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে ও কষ্টে ফেলেছে'।

তফসীরকার মোকাতেল এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের نصب শব্দটি দ্বারা শারীরিক অসুস্থতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'আযাব' শব্দ দ্বারা আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর যেহেতু সকল মন্দ কাজের সম্পর্ক শয়তানের সঙ্গে করা হয় যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনায় মাছের কথা ভুলে যাওয়াকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ

'আর শয়তানই মাছের কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে' ঠিক তেমনি আলোচ্য আয়াতেও হযরত আইউব (আঃ) বলেছেন, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, কষ্টে ফেলেছে। এভাবে তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করার জন্যে মোনাজাত করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর মোনাজাত কবুল করেছেন, তাঁর বিপদ দূরীভূত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

'তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো রয়েছে গোসলের সুশীতল পানি এবং পানীয়'।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আইউব (আঃ) যখন মাটিতে পদাঘাত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো, তিনি ঐ ঝর্ণার পানিতে গোসল করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং পানি পান করলেন, তখন তাঁর দেহের অভ্যন্তরীণ রোগগুলো দূরীভূত হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আইউব (আঃ) দু' বার মাটিতে পদাঘাত করেন। প্রথম পদাঘাতে সুশীতল পানি বের হয় এবং তিনি তা পান করলেন। দ্বিতীয় পদাঘাতে গরম পানি বের হয়, তিনি তা দ্বারা গোসল সম্পন্ন করেন। এভাবে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ

আর আমি তাঁকে দান করলাম তাঁর দ্বিগুণ পরিবার-পরিজনবর্গ, কেননা ছাদ ধ্বসে ইতোপূর্বে তাঁর পরিবারবর্গ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। এবার আল্লাহ পাক তাঁকে তার দ্বিগুণ পরিজনবর্গ দান করলেন। এসব ছিল আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে রহমত, বুদ্ধিমান লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যে, বিপদে পড়ে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক সাহায্য করেন, তাঁর বিশেষ রহমতে বিপদ দূরীভূত করেন এবং তাদেরকে শুভ পরিণতি দান করেন।[১]

১। হযরত আইউব (আঃ)-এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১১৭-৩৪

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ
نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾ وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
اُولِى الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى
الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ
وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هٰذَا ذِكْرٌ ۗ وَاِنَّ
لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾
مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾

তরজমা

(৪৪) আর এক গুচ্ছ ঘাস তোমার হাতে নাও, এরপর তা দ্বারা তাকে আঘাত কর, শপথ ভঙ্গ করোনা। নিশ্চয় আমি পেয়েছি তাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল। কত উত্তম বন্দা সে, নিশ্চয় সে ছিল আল্লাহর প্রতি তন্ময়-চিত্ত।

(৪৫) আর স্মরণ কর আমার বন্দা ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবকেও, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

(৪৬) নিশ্চয় আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম, আর তা ছিল পরকালের স্মরণ।

(৪৭) আর নিশ্চয় তারা ছিল আমার মনোনীত এবং উত্তম বন্দাগণের অর্ন্তভুক্ত।

(৪৮) আর স্মরণ কর ইসমাঈল, আলয়াসা এবং জুলকিফলের কথা। তাদের প্রত্যেকেই ছিল সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

(৪৯) এটি হলো উপদেশ, আর পরহেযগার লোকদের জন্যে রয়েছে উত্তম বাসস্থান।

(৫০) চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্যে উম্মুক্ত রয়েছে যার দ্বার।

(৫১) তারা সেখানে হেলান দিয়ে আসীন হবে, সেখানে অনেক ফলমূল ও পানীয়ের জন্যে তারা আদেশ দেবে।

তফসীরুল কোরআন

হযরত আইউব (আঃ) অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী তাঁর চিকিৎসার জন্যে ব্যাকুল ছিলেন, এমন সময় চিকিৎসকের বেশে ইবলিস এসে বলে, 'আমি তাঁর চিকিৎসা করতে পারি তবে শর্ত হলো তুমি আমাকে বলবে, 'তুমি তাকে সুস্থ করেছ', চিকিৎসার জন্যে আমি কোন বিনিময় নেবোনা, শুধু একথাটি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই'। এখানে উল্লেখ্য, উক্তিটির মধ্যে শেরক রয়েছে, কেননা রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা কোন চিকিৎসকের থাকেনা, তা একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে।

যখন হযরত আইউব (আঃ)-এর স্ত্রী তাঁর নিকট আগন্তুক চিকিৎসকের প্রস্তাবের কথা বললেন, তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয় স্ত্রীকে বললেন, 'যে তোমাকে একথা বলেছে সে হলো ইবলিস শয়তান, তার এত আস্পর্ধা সে আমার স্ত্রীকে দিয়ে শেরকের কথা উচ্চারণ করাতে চায়! আমি শপথ করে বলছি, যখন আমাকে আল্লাহ পাক সুস্থ করবেন তখন তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করবো', অথচ হযরত আইউব (আঃ)-এর এ স্ত্রীই ছিলেন তাঁর দুঃখের দিনের সাথী এবং একমাত্র তিনিই তাঁর সেবা-যত্নে নিয়োজিত ছিলেন। চরম দুঃখ-কষ্টে, দারিদ্র-প্রপীড়িত অবস্থায় তাঁকে সুদীর্ঘ আঠারোটি বছর অতিবাহিত করতে হয়েছে, এমনি অবস্থায় স্ত্রীর প্রতি যেন কোন প্রকার অত্যাচার না হয় এবং হযরত আইউব (আঃ)-এর শপথও রক্ষা হয়, তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক এর কৌশল নির্দেশ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ط

'আর একগুচ্ছ ঘাস তোমার হাতে নাও, এরপর তা দ্বারা তাকে আঘাত কর, শপথ ভঙ্গ করোনা'।

হযরত আইউব (আঃ) 'আজখর' নামক একশ'টি ঘাস একত্রিত করে একবার তাঁর স্ত্রীর দেহে আঘাত করেন, এভাবে তাঁর শপথ পূর্ণ হয়। স্বীয় অনুগ্রহে আল্লাহ পাক তাঁর শপথ পূর্ণ করার কাজটি সহজ করে দিয়েছেন। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, শপথ পূর্ণ করার এ সহজ কৌশল শুধু হযরত আইউব (আঃ)-এর ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট ছিল, অন্য কারো জন্যে এমন কৌশল অবলম্বন করা বৈধ নয়। হযরত আইউব (আঃ) সুদীর্ঘ সময় শারীরিক, আর্থিক এবং মানসিক যে অস্বাভাবিক কষ্ট ভোগ করেছেন, তার উপর সর্বদা তিনি সবরের অবস্থায় ছিলেন, কখনো তাঁর কণ্ঠ থেকে কোন প্রকার অভিযোগ-অনুযোগ শ্রুত হয়নি, এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا

'নিশ্চয় আমি তাঁকে পেয়েছি অত্যন্ত ধৈর্যশীল'।

এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁকে স্বাস্থ্য, অর্থ, সম্মান, মর্যাদা এবং পরিবারবর্গ সবই ফেরত দিয়েছেন। এমনকি, তাঁর ধন-সম্পদ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। পূর্বে ছিল সাত হাজার দুম্বা, পরে তা বার হাজারে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে ছয় হাজার উষ্ট্র, এক হাজার জোড়া গরু এবং এক হাজার গাধা তাঁর মালিকানায় এসেছে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা সবর অবলম্বন করে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে থাকে, আল্লাহ পাক এভাবে তাদেরকে সৌভাগ্য দান করেন।

একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, হযরত আইউব (আঃ) ছিলেন ধৈর্যের প্রতীক; এতদসত্ত্বেও কথা থেকে যায় যে, হযরত আইউব (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে শয়তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, প্রশ্ন হলো শয়তানের বিরুদ্ধে তাঁর এ অভিযোগ সবরের মূল চেতনার পরিপন্থী নয় কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, বন্দা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তার সকল অবস্থায় মিনতি জানাবে, সকল দুঃখ-যাতনা থেকে পানাহ চাইবে এটিই স্বাভাবিক, আর প্রকৃত বন্দার বৈশিষ্ট্যও তাই, অতএব হযরত আইউব (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শয়তানের প্রতারণার যে অভিযোগ করেছেন, তা কোন অবস্থাতেই তাঁর সবরের আদর্শের পরিপন্থী নয়।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুসংবাদ

হযরত মির্জা জানে জানা (রঃ) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, যখন হযরত আইউব (আঃ) তাঁর মহা বিপদে বছরের পর বছর সবর অবলম্বন করেছেন, তখন স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর দুঃখ-কষ্ট নিবারণের ইচ্ছা করেছেন, তাই আল্লাহ পাক হযরত আইউব (আঃ)-এর অন্তরে এ ভাব সৃষ্টি করেছেন যে, আল্লাহ পাকের দরবারে কাকুতি-মিনতি কর এবং তোমার দুঃখ-যাতনার কথা তাঁর সমীপে পেশ কর, যেন তিনি তোমার বিপদ দূর করেন। হযরত আইউব (আঃ) তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবর অবলম্বনের উপরই অটল অবিচল ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের মর্জি এবং সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তিনি দরবারে এলাহীতে বিনীত অবস্থায় দোয়া করতে থাকেন। এভাবে তিনি সবরের মকাম থেকে উন্নীত হয়ে রেজা ও সন্তুষ্টির মকামে পৌছেন। আল্লাহ পাক হযরত আইউব (আঃ)-এর সবরের মূল্যায়ন করে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا

'নিশ্চয় আমি তাঁকে সবর অবলম্বনকারী পেয়েছি'।

এরপর হযরত আইউব (আঃ) যে 'রেজা ও সন্তুষ্টির মকামে' উন্নীত হয়েছেন, তারই ঘোষণা রয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

'কত উত্তম বন্দা ছিল সে, নিশ্চয় সে ছিল আল্লাহর প্রতি তন্ময়-চিত্ত'।[১]

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۝

'আর স্মরণ কর আমার বন্দা ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবকেও, তারা ছিল শক্তিশালী, সূক্ষ্মদর্শী'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত আইউব (আঃ)-এর ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আল্লাহ্ পাক হযরত আইউব (আঃ)-কে যে বিশেষ দানে ধন্য করেছেন, তারও উল্লেখ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। নবী রসূলগণের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যমে এ সত্য উদ্ভাসিত হবে যে, তাঁদের গুণাবলীর কারণেই আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে বিশেষ রহমতে ধন্য করেছেন। অতএব, যারা এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত লাভ করতে চায়, তাদের এসব গুণাবলী অবশ্যই অর্জন করতে হবে যা আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে ছিল, তথা নবী রসূলগণের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। যারা নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা যারা করে বা ভবিষ্যতে করবে তাদের পরিণতিও যে ভয়াবহ হবে- এ সত্য উপলব্ধি করতে বিলম্ব হবার কথা নয়। এসব হলো শিক্ষণীয় বিষয়। বুদ্ধিমান মাত্রেরই এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ

'আর আমার বন্দা ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের কথা স্মরণ কর'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১২৭

নবী রসূলগণের বৈশিষ্ট্য

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর কয়েকজন প্রিয় এবং মনোনীত বন্দা ও রসূলগণের গুণাবলী এবং ফজিলত বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)।

أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী এবং সূক্ষ্মদর্শী'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী এবং আনুগত্যে তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী, আর আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করার ব্যাপারে তাঁরা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) আলোচ্য বাক্যের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

শারীরিক এবাদতে তাঁরা কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন, এক্ষেত্রে সামান্য গাফলত বা দুর্বলতা কখনো তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। এমনিভাবে আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করার ব্যাপারেও তাঁদের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁরা ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী।[১]

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, 'তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী', একথার তাৎপর্য হলো, প্রবৃত্তির তাড়না বিতাড়নে এবং শয়তানী শক্তির মোকাবেলায় তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁরা যেমন আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে সর্বদা মশগুল থাকতেন, ঠিক এমনিভাবে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনে তাঁরা থাকতেন সর্বক্ষণ তৎপর। এক কথায় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেক আমলে সর্বদা তাঁরা মশগুল থাকতেন।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, যখন তাঁকে নমরুদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ধৈর্যের পরীক্ষা হয় যখন তাঁর প্রিয়পুত্র ইউসুফ (আঃ) হারিয়ে যান এবং পুত্র-শোকে ক্রন্দন করতে করতে তিনি অন্ধ হয়ে যান। আরো লক্ষ্যণীয়, মানুষের অধিকাংশ আমল হাত দ্বারা করতে হয়, আর চক্ষু দ্বারা যা দেখে তার উপর মানুষ চিন্তা ও গবেষণা করে। এজন্যে দু'টি অঙ্গের উল্লেখ করার মাধ্যমে মানুষের যাবতীয় কর্মশক্তি এবং চিন্তাশক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১২৭
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯১৩

অর্থাৎ আল্লাহর নবী রসূলগণ আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন। এটি ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۝

'নিশ্চয় আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম, আর তা ছিল পরকালের স্মরণ'।

এ আয়াতে নবী রসূলগণের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহ্ পাককে এভাবে স্মরণ করেছেন, যা আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়না। পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা তাঁরা সর্বদা স্মরণ রাখতেন। মূলতঃ তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়া, আর বাস্তবে এটি সম্ভব হবে আখেরাতের জীবনে। তাই নবী রসূলগণ আখেরাতের জীবনের প্রস্তুতিতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে হেদায়েত করতেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ذِكْرَى ٱلدَّارِ একটি শব্দ উহ্য আছে তা হলো অর্থাৎ যিনি আখেরাতের মালিক, তাঁর সন্তুষ্টি লাভই হলো নবী রসূলগণের জীবনের সকল সাধনার উদ্দেশ্য।

পরকালের স্মরণ তথা পরকালের মালিক আল্লাহ্ পাকের স্মরণই হলো তাঁদের বৈশিষ্ট্য। আর ذِكْرَى ٱلدَّارِ শব্দটি বলে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া নয়; আখেরাতই হলো মানুষের আবাসস্থল; দুনিয়া হলো একটি পথ বা সেতু মাত্র, এ পথ অতিক্রম করতে হবে, এ সেতু পেরিয়ে যেতে হবে এবং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসান ঘটবে এবং চিরস্থায়ী জীবন শুরু হবে। মালেক এবনে দিনার (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি নবী রসূলগণের অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করে দিয়েছি আর তাদেরকে আখেরাতের স্মরণের এবং আল্লাহ্ পাকের মহব্বতের বৈশিষ্ট্য দান করেছি।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, নবী রসূলগণ মানুষকে আখেরাতের দিকে ডাকতেন এবং আল্লাহর পথের দিকে আহবান জানাতেন।

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক নবী রসূলগণকে আখেরাতের ভয়ের বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আখেরাতের অগণিত নেয়ামত সমূহ স্মরণ রাখার বৈশিষ্ট্য তাঁদেরকে প্রদান করা হয়েছে।[১]

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۝

'আর নিশ্চয় তাঁরা ছিল আমার মনোনীত এবং উত্তম বন্দাগণের অন্তর্ভুক্ত', কেননা নবী রসূলগণ আল্লাহ পাকের মা'রেফাতের সর্বোচ্চ মকামে অবস্থান করেন। পরিপূর্ণ এখলাস এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্য লাভে ধন্য হন। এটিই বন্দার জন্যে সর্বোচ্চ সম্মানিত অবস্থান।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝

'আর স্মরণ কর ইসমাঈল, আলয়াসা এবং জুলকিফলের কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত'।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বিশেষ মর্যাদা এবং শানের কারণে তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর ভাই হযরত ইসহাক (আঃ) থেকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। আলয়াসা এবং জুলকিফলের আলোচনা ইতোপূর্বে হয়েছে। আলয়াসা (আঃ)-কে বনী ইসরাঈল তাদের সর্দার মনোনীত করেছিল, পরে আল্লাহ পাক তাঁকে নবী মনোনীত করেন। জুলকিফল হযরত আলয়াসা (আঃ)-এর চাচাত ভাই অথবা বশর এবনে আইয়ুব (আঃ)-এর পুত্র ছিলেন। তাঁর নবুওয়্যত সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, তিনি নবী ছিলেন, আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি নবী নন; আল্লাহর ওলী ছিলেন। অত্যন্ত নেককার পরহেযগার লোক ছিলেন। দৈনিক একশত বার নামায আদায় করতেন।

هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

'এটি হল উপদেশ, আর নিশ্চয় পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে উত্তম বাসস্থান',

অর্থাৎ এ পর্যন্ত যা বর্ণিত হলো তা ছিল উপদেশ, যারা এ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে তারাই প্রকৃত পরহেযগার, আর নিশ্চয় পরহেযগারদের জন্যে আখেরাতে রয়েছে অতি উত্তম বাসস্থান।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১২৮

অথবা هٰذَا ذِكْرٌ এর অর্থ হলো এ পর্যন্ত নবী রসূলগণের আলোচনা হলো, এখন সাধারণ পরহেযগার লোকদের কথা শ্রবণ কর, তাদের জন্য রয়েছে অতি উত্তম বাসস্থান।

অথবা এর অর্থ হলো এই কোরআন যা তোমাদের নিকট পাঠ করা হচ্ছে, তা হল অতি সুন্দর নসিহত, মনে রেখ, পরহেযগার লোকদের শুভ-পরিণতি সুনিশ্চিত, তাদের জন্যে রয়েছে অতি উত্তম আবাসস্থল।

جَنّٰتِ عَدۡنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الۡاَبۡوَابُ۞

'চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্যে উম্মুক্ত রয়েছে যার দ্বার'।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ বেহেশতের দ্বার উম্মুক্ত, একথার তাৎপর্য হলো বেহেশতবাসীগণ সেখানে পৌঁছামাত্র নিজ নিজ বাসস্থানে আপনা আপনিই চলে যাবেন, কারো কোন প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হবেনা। عدن একটি জান্নাতেরও নাম অর্থাৎ তারা চিরসুখী হবে, চিরদিন তারা জান্নাতে বসবাস করবে।

مُتَّكِئِيۡنَ فِيۡهَا يَدۡعُوۡنَ فِيۡهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ وَّشَرَابٍ۞

'তারা সেখানে হেলান দিয়ে আসীন হবে, জান্নাতে তাঁরা অনেক ফল-মূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দেবে'।

অর্থাৎ বেহেশতবাসীগণ অনেক সুস্বাদু ফলমূল, সুস্বাদু পানীয়ের জন্যে আদেশ দেবে। বেহেশতবাসীগণ কখনও ক্ষুধার্ত হবেনা, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, বেহেশতের পানাহার ক্ষুধা নিবারণের জন্যে হবেনা, বরং স্বাদ গ্রহণ এবং আনন্দ-উল্লাসের জন্যেই হবে, কেননা জান্নাতে কোন প্রকার কষ্ট হবে না, তাই কখনও ক্ষুধায় কারো কষ্ট হবেনা।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১২৯

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ
الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هٰذَا ۚ وَاِنَّ
لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا
فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هٰذَا
فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۭ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا
بَلْ اَنْتُمْ ۣ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۭ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾
قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ ﴿٦١﴾
وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

তরজমা

(৫২) এবং তাদের কাছে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা হুরগণ।

(৫৩) এটি হল হিসাবের দিনের জন্যে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।

(৫৪) এটিই আমার প্রদত্ত রিয্ক, যা কখনও শেষ হবে না।

(৫৫) একথা তো শেষ হল। আর অবাধ্য লোকদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।

(৫৬) তা হল জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে আর তা জঘন্য নিকৃষ্ট স্থান।

(৫৭) তা ফুটন্ত পানি ও পূঁজ, তারা তা আস্বাদন করুক।

(৫৮) আর তাতে রয়েছে এরূপ আরও বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি।

(৫৯) এই যে আরও একদল তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে, তাদের জন্যে নেই কোন অভিনন্দন, নিশ্চয় তারা সকলেই যে দোযখে প্রবেশ করবে।

(৬০) অনুসারীরা (নেতাদেরকে) বলবে, 'বরং তোমাদেরই উপর হোক আল্লাহর গজব, কেননা তোমরাই তো এই মহাবিপদ আমাদের নিকট এনেছ, কত জঘন্য এ বাসস্থান'!

(৬১) তারা বলবে, 'হে পরওয়ারদেগার! যে আমাদের কাছে এ আযাব এনেছে, দোযখে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি বাড়িয়ে দাও'।

(৬২) আর তারা আরও বলবে, 'আমাদের কি হল যে, আমরা যে সব লোককে মন্দ বলে মনে করতাম তাদেরকে দেখতে পাই না কেন'?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ জান্নাতবাসীদের জন্যে সংরক্ষিত নেয়ামতের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াতেও জান্নাতবাসীদের আরো একটি নেয়ামতের ঘোষণা করা হয়েছে। জান্নাতবাসীগণের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে লজ্জাবনতা সম বয়স্কা আনত-নয়না স্ত্রীগণ থাকবেন। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জান্নাতবাসীগণের জন্যে অনন্ত-অসীম নেয়ামতের বিশেষ আয়োজন থাকবে। হিসাবের দিন তথা কেয়ামতের দিনের জন্যে এসব হল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি। কেয়ামতের দিন কবর থেকে উঠে হিসাব-নিকাশ থেকে অবসর হলে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে মাগফেরাত পেয়ে ঈমানদার ও নেককারগণ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবেন। এসব হল ঈমানদার ও নেককার লোকদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পুরস্কার যা কখনও শেষ হবেনা, চিরকাল অব্যাহত থাকবে। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

'যা তোমাদের নিকট আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর যা আমার নিকট আছে তা অব্যাহত থাকবে'।

هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

'একথাতো শেষ হল। আর অবাধ্য লোকদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান, তা হল জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে, আর তা জঘন্য নিকৃষ্ট স্থান'।

দোযখের শাস্তির ঘোষণা

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য এই, যেখানে ঈমানদার ও নেককারদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়, সেখানে তার পাশাপাশি বেঈমান ও পাপীষ্ঠদের শাস্তির কথাও ঘোষিত হয়।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে নবী রসূলগণের গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য এবং নেককার মোমেনদের পুরস্কারের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে অবাধ্য কাফের ও পাপীষ্ঠদের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, কাফের, মুশরেক, মুনাফেক, মুরতাদ, বেঈমান তাদের জন্যে কঠিন কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের ঠিকানা হবে

দোযখ, আর তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা। সেখানে উত্তপ্ত পানি, আর দোযখীদের পূঁজই হবে তাদের পানীয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ

'তা ফুটন্ত পানি ও পূঁজ, তারা তা আস্বাদন করুক'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের حميم শব্দটির অর্থ হল গরম পানি যা দোযখীদের পান করতে দেয়া হবে। আর غَسَّاق শব্দটির ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটি হবে প্রচন্ড ঠান্ডা যা দোযখীদের চরম কষ্টের কারণ হবে। তফসীরকার মুজাহেদ এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, যা অত্যন্ত ঠান্ডা তাকে غَسَّاق বলা হয়। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এটি হল পূঁজ, যা দোযখীদের শরীর থেকে বের হবে। এবনে আবি হাতেম, এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত কা'ব (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে غَسَّاق হল দোযখের একটি ঝরণার নাম, যাতে সকল প্রকার বিষাক্ত প্রাণী, সাপ বিচ্ছুর বিষ একত্রিত করা হবে এবং দোযখীদেরকে তাতে নিমজ্জিত করা হবে। একবার নিমজ্জিত করে তুললে দোযখীর দেহের গোশ্‌ত ও চামড়া দেহ থেকে পৃথক হয়ে পা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং তাকে তা টেনে নিয়ে চলতে হবে।

মসনদে আহমদে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি এর এক বালতি غَسَّاق পৃথিবীতে ফেলা হয় তবে সারা পৃথিবী দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে।[১]

وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ

'আর তাতে রয়েছে এরূপ আরও বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি'।

অর্থাৎ এভাবে আরও বহু প্রকার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে দোযখে।

দোযখের অবস্থা

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি একটি পাথর জাহান্নামে ফেলা হয় তবে ৭০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তবুও তা দোযখের তলদেশে পৌঁছবেনা। (তারগীব)।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৩০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৭১
তফসীরে আদদুররুল মানুসর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫০
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২১৫

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতময় খেদমতে বসেছিলাম, এমন সময় আমরা কোন বস্তুর পতনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি জান এটা কিসের আওয়াজ?' আমরা আরজ করলাম, 'আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন'। তিনি এরশাদ করলেন, 'এটি সেই পাথর যা আল্লাহ পাক জাহান্নামের মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন, তা পড়তে পড়তে আজ ৭০ বছর পর দোযখের তলদেশে পৌঁছেছে। এটি তারই পতনের শব্দ' (মুসলিম শরীফ)।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ দোযখ চারদিক থেকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে। ঐ প্রাচীর এত প্রশস্ত যে, প্রত্যেকটি চল্লিশ বছরের পথ অতিক্রম করার দূরত্বের সমান (তিরমিজী)।

অর্থাৎ দোযখের প্রাচীর এত চওড়া যে তা অতিক্রম করতে চল্লিশ বছর সময় ব্যয় হবে।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে দোযখের দরজা সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ط لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

'আর তাদের জন্যে ওয়াদা করা হয়েছে জাহান্নাম যার সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে তাদের পৃথক পৃথক ভাগ রয়েছে'।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে, তার মধ্যে একটি রয়েছে তাদের জন্যে, যারা আমার উম্মতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করেছে (মেশকাত শরীফ)।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এক হাজার বছর যাবত দোযখের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তখন আগুন লাল বর্ণের হয়েছে, এরপর এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তখন আগুন সাদা হয়েছে, এরপর এক হাজার বছর যাবত প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তখন তার আগুন কালো হয়ে গেছে। এখন দোযখের আগুন কালো এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়েছে (তিরমিজী)।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তা অন্ধকার রাতের ন্যায় কালো হয়ে রয়েছে। অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, তার আন্দোলিত হওয়ার সময় তার মধ্যে আলো পয়দা হয় না (তারগীব) অর্থাৎ অন্ধকার সব সময়ই থাকে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের এই আগুন (যা তোমরা ব্যবহার কর তা) দোযখের আগুনের উত্তাপের ৭০ ভাগের এক ভাগ'। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, '(পোড়ানোর জন্যে) এই আগুনই তো যথেষ্ট'। তিনি এরশাদ করলেন, '(তা সত্বেও) দুনিয়ার আগুনের চেয়ে দোযখের আগুনের উত্তাপ ৬৯ মাত্রা অধিক'। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, দোযখী ব্যক্তি যদি দুনিয়ার আগুনে (কোন প্রকারে) আসে তবে তার ঘুম এসে যাবে (তারগীব)। কারণ দোযখের আগুনের তুলনায় দুনিয়ার আগুন অনেক ঠান্ডা, তাই দোযখের তুলনায় তাদের জন্যে দুনিয়ার আগুন আরামদায়ক হবে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব সে ব্যক্তির হবে যার দু' পায়ের জুতা এবং জুতার ফিতা আগুনের হবে। সেই উত্তাপে তার মাথার মগজ (ফুটন্ত) হাঁড়ির মত ফুটতে থাকবে। সে অনুভব করবে যে, তাকেই সবচেয়ে অধিক আযাব দেয়া হচ্ছে অথচ তার আযাবই হবে সবচেয়ে কম (বোখারী, মুসলিম)।

মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক আরাম ও আয়েশের মধ্যে ছিল এরূপ এক দোযখী ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন দোযখের মধ্যে কিছুক্ষণ রেখে বের করা হবে, এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুই কি কোন দিন আরাম দেখেছিস'? জবাবে সে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! হে আমার রব, না (আমি কোন দিন আরাম পাইনি)'। তিনি আরও এরশাদ করেনঃ দুনিয়ায় সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক কষ্টে ছিল এরূপ এক জান্নাতী ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি কোন দিন কষ্ট দেখতে পেয়েছ? তোমার কি কোন দিন কোন পেরেশানী ছিল'? জবাবে সে বলবে, 'আল্লাহ পাকের শপথ! হে আমার পরওয়ারদেগার, আমার কোন দিন কোন পেরেশানী ছিলনা এবং আমি কোন দিন কোন কষ্ট দেখতে পাইনি'।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তীব্র গরম থাকে তখন জোহরের নামায বিলম্বে আদায় কর। কেননা, গরম তীব্র হয় দোযখের তেজ হবার কারণে। তিনি আরও এরশাদ করেন, দোযখ তার পরওয়ারদেগারের দরবারে অভিযোগ করে যে (আমার প্রখরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এমনকি) আমার কিছু অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে (তাই আমাকে অনুমতি দিন যেন কোন প্রকারে আমার উত্তাপ হালকা করি) তখন রব্বুল আলামীন তাকে দু' বার

নিঃশ্বাস গ্রহণের অনুমতি দেন; একটি নিঃশ্বাস শীত কালে এবং একটি গরম কালে। তাই তোমরা যে গরম অনুভব কর তা দোযখের গরম বাতাসের প্রভাব (যা নিঃশ্বাসের সময় বাইরে চলে আসে)। আর তীব্র শীত যা তোমরা অনুভব কর তা দোযখের শীতল অংশের প্রভাব (বোখারী শরীফ)। মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রত্যেক দিন দুপুর বেলায় দোযখকে উত্তপ্ত করা হয়।

দোযখের জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'হে মোমেনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি থেকে, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর'।

প্রশ্ন হতে পারে যে, পাথর কিভাবে জ্বালানী হবে? এ ব্যাপারে হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যে সব পাথর দোযখের জ্বালানী হবে তা হলো গন্ধকের পাথর। আল্লাহ পাক যেদিন আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেন সেদিন তিনি দুনিয়ার নিকটতম আসমানে এ পাথর সৃষ্টি করেন। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ পাক এ পাথর কাফেরদের (আযাবের জন্যে) সৃষ্টি করেছেন (হাকেম)।

এ পাথর ছাড়াও মুশরেকদের সে মূর্তিও দোযখের ইন্ধন হবে তারা যেগুলোর পূজা করতো। তাই সূরা আম্বিয়ায় এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ۝

'তোমরা এবং আল্লাহর পাকের পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে'।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তফসীরে বয়ানুল কোরআনে' উল্লেখিত হয়েছে যে, অনেকে বলে থাকেন যে, এর দ্বারা সাতটি শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীতে পৃথক পৃথক ধরনের আযাব রয়েছে। যে ব্যক্তি যেমন আযাবের উপযুক্ত হবে

সে তেমন শ্রেণীতে প্রবেশ করবে। যেহেতু প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের প্রবেশ পথ পৃথক পৃথক, সেজন্যে সাতটি দরজার উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, একথা দ্বারা সাতটি দরজাই বোঝানো হয়েছে। কারণ দোযখে প্রবেশকারীদের সংখ্যা এত অধিক হবে যে একটি দরজা যথেষ্ট হবে না, তাই সাতটি দরজা বানানো হয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, তিনি سبعة ابواب (সাতটি দরজা) সম্পর্কে হাত দিয়ে এভাবে ইঙ্গিত করেন যে, দোযখের দরজাগুলো উপরে নীচে ক্রমান্বয়ে রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, নীচে উপরে দোযখের সাতটি শ্রেণী রয়েছে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীর জন্যে পৃথক পৃথক সাতটি দরজা রয়েছে, যেমন কোরআনে পাকে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

'নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা দোযখের সবচেয়ে নীচের শ্রেণীতে যাবে'।

এ আয়াত থেকেও একথা পরিস্কার যে জাহান্নামের অনেকগুলো শ্রেণী রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এসব শ্রেণীর নাম এবং এদের অধিবাসীদের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে, সব চেয়ে নীচের শ্রেণীর নাম হলো 'হাবিয়া'। এখানে মুনাফেক সম্প্রদায়, ফেরআউন এবং তার সাহায্যকারীরা যাবে। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো 'হাবিয়া'-র উপরে। এর নাম হলো 'জাহীম'। এটি মুশরেক সম্প্রদায়ের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। জাহীমের উপরে রয়েছে তৃতীয় শ্রেণী। তার নাম 'সাকার'। যাদের কোন ধর্ম নাই, তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে এটি। শরীয়তের পরিভাষায় এদেরকে 'ছায়েবীন' বলা হয়। য়েমন এথিষ্ট, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি। চতুর্থ শ্রেণী হলো সাকারের উপরে যার নাম হলো 'নাত্তি'। এ হলো ইবলিস এবং তার অনুসারীদের জন্যে। তার উপরে রয়েছে পঞ্চম শ্রেণী, নাম হলো 'হুতামা'। তা ইহুদীদের জন্যে নিদৃষ্ট রয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর নাম হলো 'সায়ীর'। এখানে নাসারা বা খৃষ্টানরা থাকবে। সবার উপরে হলো সপ্তম শ্রেণী। এখানে থাকবে গুনাহগার মুসলমানেরা। এর উপরেই পুলসেরাত কায়েম হবে। যদিও সকল শ্রেণীর বেলায় 'জাহান্নাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আসলে এই শ্রেণীর নামই জাহান্নাম। একথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, জাহান্নামের শ্রেণী সমূহের একটি দরজার দূরত্ব অপর দরজা থেকে সাতশ' বছরের সফরের দূরত্ব।

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا ۢ بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۞

'এই যে আরো একটি দল তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে, তাদের জন্যে নেই কোন অভিনন্দন, নিশ্চয় তারা সবাই দোযখে প্রবেশ করবে'।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একথাগুলো দোযখের অভ্যন্তরে হবে। দোযখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণ দোযখে নিক্ষিপ্ত নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে বলবে।

কাফেরদের নেতারা যখন দোযখে প্রবেশ করবে, এরপর তাদের অনুসারীরা দোযখে প্রবেশ করবে, তখন ফেরেশতাগণ কাফেরদের তথাকথিত নেতাদেরকে বলবে, ঐ যে আরো এক দল শাস্তি প্রাপ্ত লোক তোমাদের সঙ্গে অবস্থানের জন্যে প্রবেশ করছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, একথাগুলো কাফের নেতারা একে অন্যকে বলবে, এই দেখ, তোমাদের অনুসারীদের এক দল প্রবেশ করছে তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দোযখের শাস্তি ভোগ করার জন্যে। তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, দোযখীদেরকে দোযখের তীরে নিয়ে গুরুজ দিয়ে প্রহার করা হবে। তখন ঐ প্রহারের ভয়ে দোযখীরা আপনা আপনিই দোযখে প্রবেশ করবে। আর তখন আলোচ্য আয়াতের কথাটি বলা হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এমন অন্যায় অনাচার থেকে বিরত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, যার অনিবার্য পরিণতি হলো দোযখের শাস্তি। কিন্তু অনেক লোকই এ হেদায়েত কবুল করেনি; বরং স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোযখে প্রবেশ করেছে, তথা এমন মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো দোযখের শাস্তি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো সে ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্বলিত করলো এবং অনেক পোকা মাকড় এসে তাতে পড়লো, ঐ ব্যক্তি এগুলোকে বাধা দিত কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতো এবং জ্বলে ছাই হয়ে যেত। আমিও তোমাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করছি (অর্থাৎ এমন কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করছি যা দোযখের শাস্তির কারণ হতে পারে) কিন্তু তোমরা তা মাননা এবং দোযখে প্রবেশ করতে থাক।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৩১

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًاۢ بِكُمْ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ﴿

‘অনুসারীরা (নেতাদেরকে) বলবে, বরং তোমাদেরই উপর হোক আল্লাহর গজব কেননা, তোমরাই তো এ মহা বিপদ আমাদের নিকট এনেছে। কত জঘন্য এ বাসস্থান’!

পূর্ববর্তী আয়াতের কথাটি ছিল কাফেরদের নেতাদের পক্ষ থেকে তাদের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে, আর আলোচ্য আয়াতের কথাটি হলো অনুসারীদের পক্ষ থেকে তাদের নেতাদের কথার প্রতি-উত্তর। তারা বলবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর গজব পতিত হোক, কেননা আমাদের এ মহা বিপদের জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমাদের অনুসরণের কারণেই আমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছি, তাঁর প্রেরীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছি, তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনকে অমান্য করেছি যার অনিবার্য শাস্তি হলো এ দোযখ। এজন্যে অনুসারীরা আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে দোযখে পৌছার পর বদদোয়া করবে। পরবর্তী আয়াতেই রয়েছে এর উল্লেখঃ

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ﴿

‘(অনুসারীরা) বলবে, হে পরওয়ারদেগার! যে (নেতা) আমাদের কাছে এ আযাব নিয়ে এসেছে তার শাস্তি বাড়িয়ে দাও’।

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যারা আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছে, যারা আমাদেরকে তোমার নাফরমানীর পথে নিয়ে গেছে এবং আমাদের জন্যে এ কঠিন শাস্তি ডেকে এনেছে, দোযখে তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ﴿

‘আর তারা আরো বলবে, ‘আমাদের কি হলো যে, আমরা যে সব লোককে মন্দ বলে মনে করতাম, তাদেরকে (এখানে) দেখতে পাই না কেন’?

অর্থাৎ কাফেররা দোযখে এ বিষয়ে কথা বলবে যে, দুনিয়াতে যাদেরকে মন্দ মনে করতাম, ভাগ্যাহত মনে করতাম, দোযখে তাদেরকে দেখতে পাই না কেন?

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আবু জেহেল বলবে, বেলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ) এবং সোহায়েব (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কোথায়? তাদেরকে দোযখে দেখা যায় না কেন? এভাবে প্রত্যেক কাফের বলবে, দুনিয়াতে যাদেরকে আমরা মন্দ বলতাম, নির্বোধ মনে করতাম, আজ তাদেরকে দেখি না কেন? আমরা যে তাদের কোন গুরুত্ব দিতাম না এটি কি আমাদের ভুল ছিল?

أَتَّخَذْنَٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ
تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا
كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي
خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
فَقَعُوا لَهُ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا
إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾

তরজমা

(৬৩) তবে কি আমরা তাদেরকে অযথা ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র মনে করতাম অথবা তাদের বেলায় আমাদেরই দৃষ্টিভ্রম হয়েছে?

(৬৪) নিশ্চয় দোযখীদের এ কলহ সত্য।

(৬৫) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। এক, অদ্বিতীয়, প্রবল, প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

(৬৬) তিনি আসমান, জমীন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুরই প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহান, মার্জনা-প্রিয়।

(৬৭) (হে রসূল!) আপনি বলুন, এটি এক মহা সংবাদ।

(৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে রেখেছ,

(৬৯) উর্দ্ধলোকে যখন তারা আলোচনা করছিলেন, তখন আমার কোন খবরই ছিলনা।

(৭০) আমার নিকট তো শুধু এ নির্দেশ এসেছে যে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

(৭১) (হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মাটি দ্বারা মানুষ তৈরী করবো।

(৭২) এরপর যখন আমি তাকে ঠিক করে নেব এবং তাতে আমার একটি রুহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তাঁর সম্মুখে সেজদায় পতিত হয়ো।

(৭৩) তখন ফেরেশতারা সকলেই একত্রিত অবস্থায় সেজদারত হলো।

(৭৪) শুধু ইবলিস ব্যতীত, সে অহংকার করলো, মূলতঃ সে কাফেরদেরই একজন ছিল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেররা দোযখে প্রবেশের পর যে কথা বলবে, তার উল্লেখ ছিল। তারা বলবে, দুনিয়াতে যাদেরকে আমরা নির্বোধ মনে করতাম, তাদেরকে যে দোযখে দেখি না, তারা কোথায়? তবে কি তাদের ব্যাপারে আমাদের আচরণ ভুল ছিল? আলোচ্য আয়াতেও কাফেরদের ঐ সংলাপের অংশ বিশেষ স্থান পেয়েছে।

أَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ۝

তারা বলবে, 'দুনিয়াতে আমরা যে তাদেরকে বিদ্রুপ করতাম, তা কি আমাদের অন্যায় ছিল'?

কাফেররা এভাবে প্রশ্ন করবে যে, যাদেরকে আমরা কোন গুরুত্ব দিতাম না, তারা কোথায়? আর কেউ বলবে, হয়তো দোযখে কোথাও আছে, আমরা দেখছিনা তাদেরকে, তখন বেহেশতবাসীগণের তরফ থেকে ঘোষণা করা হবে, হে দোযখবাসী! এদিকে দেখ, আমরা তো আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি, তোমাদের কথা বল, তোমরা কি আল্লাহ পাকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্য পেয়েছি। ঐ মুহূর্তে একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, জালেমদের উপর আল্লাহ পাকের লা'নত হোক।[১]

কোরআনে করীমের অন্যত্র আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَنَادٰى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۚ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৭২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৩২

'আর দোযখীরা জান্নাতবাসীদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, আমাদের দিকে একটু পানি নিক্ষেপ কর, অথবা যে রিয্ক আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দান করেছেন তা থেকে কিছু দাও, জান্নাতবাসীগণ বলবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে এ দু'টি বস্তু (খাদ্য ও পানীয়) হারাম করে দিয়েছেন'।

اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ۝

'নিশ্চয় দোযখীদের এ কলহ সত্য'।

অর্থাৎ দোযখীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সবই সম্পূর্ণ সত্য। তারা এভাবে বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হবে।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۝

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। এক, অদ্বিতীয়, প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরু থেকে পবিত্র কোরআনের সত্যতা এবং তৌহীদ ও রেসালতের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে নবী রসূলগণের ঈমান, তাকওয়া-পরহেযগারী, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা এবং তাঁদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এরপর কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত থেকে পুনরায় তৌহীদ ও রেসালতের বর্ণনা শুরু হয়েছে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ

তৌহীদে বিশ্বাসের আহবান

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন, আমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একজন সতর্ককারী মাত্র। আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তোমাদেরকে সতর্ক করাই আমার কাজ। অবশেষে তোমাদেরকে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। তাই তোমরা একথা জেনে রাখ যে, এক, অদ্বিতীয়, প্রবল, প্রতাপান্বিত আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে সতর্ককারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী।

ٱلۡوَاحِدُ

অর্থাৎ তাঁর পবিত্র সত্ত্বায় অথবা তাঁর গুণাবলীতে কোন শরীক নেই।

ٱلۡقَهَّارُ

অর্থাৎ পরাক্রমশালী, সব কিছুর উপর প্রভাব বিস্তারকারী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী রয়েছে যে, তিনি যে কোন মুহূর্তে অবাধ্য কাফেরদের শাস্তি বিধান করতে পারেন।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا الۡعَزِيۡزُ الۡغَفَّارُ۝

'তিনি আসমান জমীনে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক'।

ٱلۡعَزِيۡزُ

অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী, যদি তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চান, তবে দিতে পারেন, কেউ তাঁর মোকাবেলা করতে পারেনা।

ٱلۡغَفَّارُ

তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। ছোট বড় যে কোন গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন, সমগ্র বিশ্বের আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টি সম্পূর্ণ তাঁর অনুগত। এ আয়াত দ্বারা তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কাফের মুশরেকদের উদ্দেশ্যে আযাবের হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে।

قُلۡ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيۡمٌ۝ اَنۡتُمۡ عَنۡهُ مُعۡرِضُوۡنَ۝

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, এটি এক মহা সংবাদ, যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে রেখেছ'।

অর্থাৎ এই কোরআন, যা থেকে তোমরা বিমুখ হয়ে রয়েছ তা বিশ্ব-গ্রন্থ্ আল্লাহ পাকের মহান বাণী, যা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি এক মহা সংবাদ, যা থেকে তোমরা বিমুখ হয়ে আছ। মানব জাতির চিরসুখী হওয়ার পন্থা হলো আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

পক্ষান্তরে, যারা ঈমান ও নেক আমল থেকে বঞ্চিত হবে, এতে তাদের চির দুঃখী হওয়ার সংবাদ রয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যারা এ মত পোষণ করেন তারা আয়াতের ব্যাখ্যা করেন এভাবেঃ (হে রসূল!) আপনি বলুন, এটি এক মহা সংবাদ, আর সে সংবাদ হলো কেয়ামতের কঠিন দিনের, যেদিন একদল লোক চিরসুখী হবে, কেননা তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে, তারা দুনিয়াতে ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, আর যারা ঈমান ও নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করেনি তারা দোযখবাসী হবে এবং চির দুঃখী হবে। অথচ তোমরা এমন মহা সংবাদ সম্পর্কে বিমুখ হয়ে থাক, সতর্ক হওনা এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ কর-না, পবিত্র কোরআনের প্রতিও ঈমান আননা, আমার রেসালতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন কর-না, অথচ এসব কিছু আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই এসেছে।

مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۢ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ......

'উর্ধ্বলোকে যখন তারা আলোচনা করছিলেন, তখন আমার কোন খবরই ছিলনা, আমার নিকট শুধু এ নির্দেশ এসেছে যে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।

অর্থাৎ আল্লাহর ফেরেশতাগণ পরস্পরের মধ্যে কী আলোচনা করেছেন, আমি সে সম্পর্কে কোন খবরই রাখতাম না। আল্লাহ পাক দয়া করে আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তাই জানি, তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আমি আল্লাহ পাকের মনোনীত রসূল। আমি যেন সুস্পষ্ট ভাষায় তোমাদেরকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সতর্ক করি। কেয়ামত কবে আসবে সে সম্পর্কে আমি অবগত নই, আর আমার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরীও নয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ফেরেশতাদের কথাবার্তা হয়েছিল হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির ব্যাপারে, يختصمون শব্দ দ্বারা সে বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বলেছেনঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করবো, তখন ফেরেশতারা আরজ করেছিল, 'হে পরওয়ারদেগার! তুমি এমন জাতি সৃষ্টি করবে, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে'?

হযরত আবদুর রহমান এবনে আয়েশ হাজরামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি আমার প্রতিপালককে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি, তিনি আমাকে বলেছেন, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ফেরেশতাগণ কি বিষয়ে আলোচনা করে? আমি আরজ করলামঃ হে পরওয়ারদেগার! এ সম্পর্কে তুমি অত্যন্ত ভাল জান। একথাটি তিনি দু'বার বলেন। আমার পরওয়ারদেগার আমার দু' বাহুর উপরে তাঁর কুদরতী হস্ত রেখে দিলেন যার উষ্ণতা আমি উপলব্ধি করলাম, এর ফলে আসমান জমীনে যা কিছু হচ্ছে সবই আমার জানা হয়ে গেল। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একখানি আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

এবং তিনি এরশাদ করলেন, আমার প্রতিপালক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! উর্দ্ধ জগতে কি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে? আমি আরজ করলাম, কোন্ কোন্ আমল দ্বারা গুনাহর কাফ্ফারা হয় এ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। এরপর এরশাদ করেছেন, কাফ্ফারা কি? আমি আরজ করলাম, পদব্রজে নামাযের জামাতে গমন করা, নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে মসজিদে অপেক্ষা করা। কষ্টদায়ক বিষয় যথা প্রচন্ড ঠান্ডায়ও সঠিকভাবে অজু করা, যে তা করবে তার জীবন হবে কল্যাণময়, আর তার মৃত্যু হবে কল্যাণকর অবস্থায়, আর তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর সে ঐ দিনের ন্যায় নিঃস্পাপ হবে, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছিল। আর গুনাহর কাফ্ফারা আদায়ের পর উচ্চ মর্তবা অর্জনের পন্থা হল ক্ষুধার্ত মানুষকে আহার করানো, মুসলমানদেরকে সালাম দেয়া, আর যখন সব লোকেরা নিদ্রিত থাকে তখন নামাযের জন্যে দন্ডায়মান হওয়া। এরপর আমার প্রতিপালক এরশাদ করেছেন, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! বল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ চাই এবং মন্দ ও নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ পরিত্যাগ করার তৌফিক চাই, আর মিসকিনদেরকে যেন ভালবাসতে পারি তার আবেদন করি। আর মাগফেরাত দানের আরজী পেশ করি, আর আমার প্রতি রহম কর, আর যদি কোন সম্প্রদায়কে তুমি বিপদগ্রস্ত করতে ইচ্ছা কর, তবে তার পূর্বে আমাকে ওফাত দিও।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'সেই আল্লাহ পাকের শপথ, যাঁর হাতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণ রয়েছে, নিঃসন্দেহে এসব কথা সত্য'।

উর্দ্ধজগতে কাফ্‌ফারা সম্পর্কে আলোচনার তাৎপর্য হলো, ফেরেশতাগণ এসব নেক আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধকরণে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেন, যাতে করে সবার আগে আল্লাহ পাকের দরবারে তা পেশ করতে পারেন। হযরত রোফাআ এবনে রাফে (রাঃ) বর্ণিত হাদীসেও এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়।

হযরত রোফাআ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায় করছিলাম, তিনি রুকু থেকে দন্ডায়মান হয়ে যখন সামি আল্লাহু লিমান হামিদা বললেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে মোকতাদীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো–

ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষ হবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কথাগুলো কে বলেছে'? তখন ঐ ব্যক্তি বললো, আমি বলেছিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ ত্রিশেরও অধিক সংখ্যক ফেরেশতাকে দেখলাম যে তারা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করছেন, কে এ বাক্যগুলোকে সর্ব প্রথম লিপিবদ্ধ করবে। (বোখারী শরীফ)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ۝

'(হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মাটি দ্বারা মানুষ তৈরী করবো'।

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ۝

'এরপর যখন আমি তাকে ঠিক করে নেব এবং তাতে আমার একটি রুহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তাঁর সম্মুখে সেজদায় পতিত হয়ো'।

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ۝ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

'তখন ফেরেশতারা সবাই একত্রিত অবস্থায় সেজদারত হলো, শুধু ইবলিস ব্যতীত, সে অহংকার করলো, মূলতঃ সে কাফেরদেরই একজন ছিল'।

হযরত আদম (আঃ) ও ইবলিসের এ ঘটনা বিস্তারিত ভাবে সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করার কারণ হলো, এ সত্য প্রকাশ করা যে, যেভাবে ইবলিস হযরত আদম (আঃ)-কে অহংকার করে সেজদা করলো না এবং নিজেকে বড় মনে করে দম্ভ প্রকাশ করলো, পরিণামে চির অভিশপ্ত

হলো, ঠিক তেমনি মক্কার মুশরেকরা যদি অহংকার করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাদেরকেও ইবলিসের মত অপমানিত, লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত ও কোপগ্রস্ত হতে হবে।

قَالَ يٰۤاِبۡلِيۡسُ مَا مَنَعَكَ
اَنۡ تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَىَّ ؕ اَسۡتَكۡبَرۡتَ اَمۡ كُنۡتَ مِنَ
الۡعَالِيۡنَ ﴿۷۵﴾ قَالَ اَنَا خَيۡرٌ مِّنۡهُ ؕ خَلَقۡتَنِىۡ مِنۡ نَّارٍ وَّخَلَقۡتَهٗ
مِنۡ طِيۡنٍ ﴿۷۶﴾ قَالَ فَاخۡرُجۡ مِنۡهَا فَاِنَّكَ رَجِيۡمٌ ﴿۷۷﴾ وَّاِنَّ عَلَيۡكَ
لَعۡنَتِىۡۤ اِلٰى يَوۡمِ الدِّيۡنِ ﴿۷۸﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنۡظِرۡنِىۡۤ اِلٰى يَوۡمِ
يُبۡعَثُوۡنَ ﴿۷۹﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الۡمُنۡظَرِيۡنَ ﴿۸۰﴾ اِلٰى يَوۡمِ
الۡوَقۡتِ الۡمَعۡلُوۡمِ ﴿۸۱﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغۡوِيَنَّهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿۸۲﴾

তরজমা

(৭৫) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, 'হে ইবলিস! আমি যাকে স্বহস্তে তৈরী করেছি তাকে সেজদা দিতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি অহংকার করলি? অথবা তুই কি মর্যাদায় বড় ছিলি'?

(৭৬) ইবলিস বললো, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মাটি দিয়ে'।

(৭৭) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, 'তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, নিশ্চয় তুই বিতাড়িত'।

(৭৮) আর নিশ্চয় শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তোর প্রতি আমার লা'নত রইল।

(৭৯) ইবলিস বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত আপনি আমাকে অবকাশ দিন'।

(৮০) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, 'তোকে অবকাশ দেয়া হলো'।

(৮১) নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

(৮২) ইবলিস বললো, 'আপনার মর্যাদার শপথ! আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো'।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাদের প্রতি তাঁকে সেজদা করার আদেশ দিয়েছেন, ইবলিস ব্যতীত সমস্ত ফেরেশতাবৃন্দ আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক সেজদায় পতিত হন। এরপর আল্লাহ পাক ইবলিসকে সেজদা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আলোচ্য আয়াতে তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ يَٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط

'আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, 'হে ইবলিস! আমি যাকে স্বহস্তে তৈরী করেছি তাকে সেজদা দিতে তোকে কিসে বাধা দিল'?

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক মানব দেহকে তাঁর বাহ্যিক হাত দ্বারা (এর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে মানব জাতি অবগত নয়) এবং মানুষের রুহকে তাঁর অদৃশ্য হাত দ্বারা তথা কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন। আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির ব্যাপারে এ দু' প্রকার কুদরতী হস্তই ব্যবহৃত হয়েছে।

পূর্বকালের তফসীরকাগণ বলেছেন, আল্লাহ পাকের কুদরতী হাতে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন- একথার প্রতি আমরা ঈমান আনি, কিন্তু হাতের ব্যাখ্যা কি তা আমাদের অজানা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, 'আল্লাহ পাকের হাত দ্বারা' উক্তিতে বিশেষ দানকে বোঝানো হয়েছে। আর সুফীগণ বলেছেন, এর দ্বারা আল্লাহ পাকের 'সেফাতে জামাল ও জালাল'কে বোঝানো হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, কোন ফেরেশতা অথবা অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার না করে আল্লাহ পাক স্বয়ং মানব দেহ সৃষ্টি করছেন।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেছেন, দু' হাত দ্বারা মানব দেহকে সৃষ্টি করার তাৎপর্য হলো, পিতা-মাতার মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-এর দেহ সরাসরি নিজেই তৈরী করেছেন। এটি তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[২]

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯১৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৩৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২২৫

এবনে আবিদ্দুনিয়া, আবুশ শেখ এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে হারেস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক তিনটি জিনিস স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেনঃ (১) আদম (২) তৌরাত স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছেন (৩) ফেরদাউস স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, এরপর এরশাদ করেছেনঃ আমার ইজ্জতের শপথ! কোন মদ্যপায়ী এবং কোন দাইউস ফেরদাউসে বাস করতে পারবেনা।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। আল্লাহ পাক স্বহস্তে চারটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন (১) আরশ (২) জান্নাতে আদন (৩) কলম (৪) আদম, এরপর সমগ্র সৃষ্টি জগতের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'কুন' (হও) তখন সব কিছু হয়ে গেছে।

আবদ এবনে হোমায়েদ হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক তিনটি জিনিস ব্যতীত কিছুই স্বহস্তে সৃষ্টি করেননি (১) আদম (২) তৌরাতকে লিপিবদ্ধ করেছেন (৩) জান্নাতে আদন।[১]

أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ۝

'তুই কি অহংকার করলি? অথবা তুই কি মর্যাদায় বড় ছিলি'?

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

'ইবলিস বললো, 'আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা এবং তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন'। আগুন গরম এবং উত্তেজনাপূর্ণ, উর্দ্ধগামী, আর মাটি নীরব, নিরীহ এবং শীতল। আগুন উর্দ্ধগামী হওয়ার কারণে ইবলিস শয়তান নিজেকে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ মনে করলো, অথচ তার শ্রেষ্ঠত্বের এ অনুভূতি অহংকারের কারণ হল, আর অহংকার তার ধ্বংস ডেকে আনল। যদিও ইবলিস জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবুও সে ফেরেশতাদের মাঝেই সসম্মানে বাস করতো। কিন্তু তার অন্ধ অহংকারের কারণে সে প্রাপ্ত উচ্চ মর্যাদা থেকে চির বঞ্চিত হলো।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۝

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, 'তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, নিশ্চয় তুই বিতাড়িত'।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৩-৫৪

'এখান থেকে বের হয়ে যা' কথাটির তাৎপর্য হলো, জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়া অথবা আসমান থেকে বহিস্কৃত হওয়া।

হাসান বসরী (রঃ) এবং আবুল আলীয়া (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোকে যে সুন্দর আকৃতি দিয়ে তৈরী করেছি, তা থেকে বের হয়ে যা।

হাসান এবনে ফজল বলেছেন, এ ব্যাখ্যাটি অতি উত্তম। কেননা, এ আদেশের পরই ইবলিসের বর্ণ কৃষ্ণ হয়ে গেল, অথচ পূর্বে সুন্দর ছিল।

فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ

নিশ্চয় তুই অভিশপ্ত, দরবারে এলাহী থেকে বিতাড়িত। কোন অবস্থাতেই আদমের মোকাবেলায় তোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শুধু তাই নয়; বরং তোর প্রতি চিরস্থায়ী লা'নত। তাই এরশাদ করলেনঃ

وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۞

'আর বিচার দিন পর্যন্ত তোর প্রতি আমার লা'নত'। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কেয়ামতের দিনের পর ইবলিস লা'নত থেকে মুক্তি পাবে, বরং কেয়ামত পর্যন্ত লা'নত অব্যাহত থাকবে, এরপর লা'নতের পাশাপাশি আযাব হবে।

ইবলিস বললো, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। যেহেতু আদম (আঃ)-এর কারণেই ইবলিস বিতাড়িত এবং অভিশপ্ত হলো, তাই যতদিন পৃথিবীতে আদম সন্তান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সে মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট এবং বিপদগ্রস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকবে।

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ۞ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۞

'তোকে অবকাশ দেয়া হলো', একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যা আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন।

অর্থাৎ ইবলিসকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো, আর কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় কেবল আল্লাহ পাকই জানেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, কেয়ামতের জন্যে প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইবলিসকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ۞

'ইবলিস বললো, 'আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, অবকাশ পাওয়ার কারণেই ইবলিস মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করবে বলে দম্ভোক্তি করেছে।[১]

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ۚ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلْ
مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

তরজমা

(৮৩) তবে তাদের মধ্যে আপনার বিশিষ্ট ও একনিষ্ঠ বন্দাগণকে নয়।

(৮৪) আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, তবে এটিই সত্য, আর আমি সত্য কথাই বলছি।

(৮৫) তুই এবং যারা তোর অনুসারী হবে, তাদের সকলকে দিয়ে আমি অবশ্যই দোযখ পূর্ণ করবো।

(৮৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(৮৭) এটি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ মাত্র।

(৮৮) অচিরেই তোমরা এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক যখন ইবলিসকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার কথা ঘোষণা করলেন তখন সে বললো, এ সুযোগে আমি আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো। এরপর সে বলেছে, তবে হে আল্লাহ! যাদেরকে আপনি আপনার বন্দেগীর জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন, তাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করতে পারবোনা। আলোচ্য আয়াতে একথাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৩৮

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাদেরকে তাঁর বন্দেগীর জন্যে তৌফিক দান করেন, যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন, যারা আল্লাহ পাকের বিশিষ্ট এবং একনিষ্ঠ বন্দা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন, তাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবোনা।

ইবলিসের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার দৃষ্টান্ত

বর্ণিত আছে, একবার ইবলিস হযরত গওসুল আজম শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর নিকট অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র আকৃতি ধারণ করে হাযির হয়ে বলে, হযরত! আমি একজন ফেরেশতা, আমাকে আল্লাহ পাক আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন এ সুসংবাদ দেয়ার জন্যে যে, আল্লাহ পাক আপনার বন্দেগীতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, এখন আর আপনার কোন গুনাহ নেই। যেহেতু নবী ব্যতীত কোন মানুষ নিঃষ্পাপ নন, তাই হযরত গওসুল আজম (রঃ) মনে করলেন, এ হলো ইবলিস শয়তান, আমাকে প্রতারণার জন্যে হাযির হয়েছে। তাই তিনি পাঠ করলেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম', এ দোয়াটি ইবলিসের ক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্রের ন্যায় কার্যকর হয়। এ দোয়া শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ইবলিস পলায়নে বাধ্য হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধূর্ত ইবলিস পলায়নপর অবস্থাতেও হযরত শেখ জিলানী (রঃ)-কে পুনরায় ধোকা দেয়ার চেষ্টা করলো। তাঁর ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে সে পুনরায় বলে, হযরত! আমি অনেক বুজুর্গকে এভাবে প্রতারণা করেছি, কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমি ব্যর্থ হলাম, কেননা আপনি অত্যন্ত বিজ্ঞ আলেম, আপনার এলমের কারণেই আজ আমি ব্যর্থ হলাম। তখন হযরত গওসুল আজম (রঃ) উপলব্ধি করলেন, এটিও ইবলিস শয়তানের আরেকটি চাল, আমি যেন আমার এলমের কারণে অহংকারী হই তাই সে চায়, তখন তিনি বললেন, হে মিথ্যাবাদী ইবলিস! আমার এলমের কারণে নয়; বরং শুধু আল্লাহ পাকের রহমতেই তোর ধোকা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের উপর এক হাজার দলিল পেশ করতেন। একবার তিনি বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার দীক্ষা নিলেন। হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (রঃ) তাঁকে বললেন, আপনাকে কিছুদিন আমার নিকট অবস্থান করতে হবে। ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর নিকট কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন তিনি পীর ও মুর্শেদকে বললেন, হযরত! আমার এলম চলে যাচ্ছে। আমি অনেক কথা ভুলে যাচ্ছি। অথচ

অক্লান্ত সাধনা এবং কঠোর পরিশ্রমের পর আমি এ এলম হাসিল করেছিলাম। তখন হযরত নাজমুদ্দিন কোবরা (রঃ) বললেন, আপনার অন্তরকে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর সব কিছু থেকে মুক্ত করতে হবে। শুধু এভাবেই আপনার দিলকে আল্লাহ পাকের মহব্বত দ্বারা পরিপূর্ণ করা সম্ভব হবে। ইমাম রাজী (রঃ) বললেন, হযরত! সারা জীবনের কঠোর সাধনা-লব্ধ এই এলম হারাতে আমার বড় কষ্ট হয়, আধ্যাত্মিক সাধনার এই মহান কাজ আপাততঃ মূলতবী থাকুক। কিছুদিন পরই ইমাম রাজী (রঃ)-এর মৃত্যুর মুহূর্ত ঘণিয়ে এল। ইবলিস শয়তান তাঁকে প্রতারিত করতে উপস্থিত হলো। ইমাম রাজী (রঃ) আল্লাহ পাকের একত্ববাদের উপর একে একে এক হাজার দালিল উপস্থাপন করলেন। ইবলিস শয়তান তাঁর পেশকৃত প্রত্যেকটি দলিল খন্ডন করলো। তখন ইমাম রাজী (রঃ)-এর বেঈমান 'অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। এ সংকটজনক অবস্থার কাশ্‌ফ হলো হযরত নাজমুদ্দিন কোররা (রাঃ)-এর, তিনি তখন অজু করছিলেন। পানির পাত্রটি ইবলিস শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে ইমাম রাজী (রঃ)-কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'বল, কোন দলিল ব্যতীতই আল্লাহ পাক এক, তাঁর কোন শরীক নেই, এর উপর আমার ঈমান রয়েছে, তোমাকে দলিল দেয়ার আমার কোন প্রয়োজন নেই', ইমাম রাজী (রঃ) যখন একথা বললেন, তখন ইবলিস শয়তানের অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এভাবে আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় বন্দাগণ তাঁর বিশেষ রহমতে ইবলিস শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআন একথাই ঘোষণা করেছে।

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ۝

'তবে এটিই সত্য, আর আমি সত্য কথাই বলছি'।

অর্থাৎ আমার কথা সত্য, আর আমি সত্যই বলে থাকি, হে ইবলিস! তুই এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি দোযখকে পরিপূর্ণ করে দেবো।

এ ঘোষণা শ্রবণের পর বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়া, ইবলিস শয়তানের অনুগামী না হওয়া।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেউ যদি ঈমান না আনে, তবে (হে রসূল!) আপনার কর্তব্য হলো সুস্পষ্ট ভাষায় একটি কথা ঘোষণা করা, আর তা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ۝

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই'।

অর্থাৎ আমি যে তোমাদেরকে সত্য গ্রহণের জন্যে আহবান করছি অথবা তোমাদের নিকট পবিত্র কোরআনের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি, এতে আমার কোন স্বার্থ নেই, আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিকও চাই না, আমি কোন মিথ্যা কথার দাবীদারও নই; বরং আমি সত্য নবী, আমার নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যে যে পথ-নির্দেশ আসে তা আমি মানুষকে জানিয়ে দেই।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমাদেরকে বানানো কথা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, মসরুক (রহঃ) বলেছেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির ছিলাম, তিনি বলেছেন, যদি কেউ কোন কথা জানে তবে তা যেন বলে দেয়, আর যদি না জানে তবে বলা উচিত আল্লাহ পাক জানেন, এর বেশী নিজের তরফ থেকে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়।

এ আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ۝

অর্থাৎ এই কোরআন তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে একটি উপদেশ মাত্র যা আমার নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী স্বরূপ অবতীর্ণ হয়, আর আমি তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দেই আর এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক আমাকে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআনের মহা মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করলে, তোমাদেরই উপকার হবে, এতেই রয়েছে তোমাদের জীবন-সাধনার সার্থকতা, সার্বিক কল্যাণ। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ কর, আমার অনুসরণ কর, এটিই সরল সঠিক পথ।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ۝

এবং অচিরেই তোমরা এর ইতিবৃত্ত জানতে পারবে অর্থাৎ যদি তোমরা পবিত্র কোরআনের বাণী এবং আমার আহবানের সত্যতা উপলব্ধি করতে না পার তবে মনে রেখো, অদূর ভবিষ্যতে এর সত্যতা তোমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।

প্রশ্ন হলো, কবে কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করবে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষ ইসলামের সত্যতা, পবিত্র কোরআনের সত্যতা উপলব্ধি করবে।

আর একরামা (রহঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেকে এ সত্য উপলব্ধি করবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুই কেয়ামত, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করবে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন সবই সত্য, আর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন, এর দ্বারা বদরের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ বদরের দিন তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথাই সত্য, কেননা আল্লাহ পাক সেদিন সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সত্য-পন্থীদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং বাতিল-পন্থীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১২ অক্টোবর মোতাবেক ১৬ জমাদিউল উলা, রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় সূরা ছোয়াদের তফসীর শেষ হলো। হে আল্লাহ! দয়া করে কবুল কর এবং এই মহান গ্রন্থ পরিপূর্ণ করার তৌফিক দান কর। আমীন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৩৯-৪০
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা যুমার

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّثَمَانِيْ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ١ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ
الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ٢ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ
الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا
لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ٣ لَوْ اَرَادَ
اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۗ
هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٤ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ٥

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে (শুরু করছি)

তরজমা

(১) এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে।

(২) (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার নিকটই এই কিতাব যথাযথভাবে নাযিল করেছি, অতএব আপনি খাঁটি বিশ্বাস নিয়ে যথাযথভাবে আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করতে থাকুন।

(৩) মনে রাখুন, খাঁটি আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা তো তাদের পূজা শুধু এজন্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্যে এনে দেবে'। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক এমন ব্যক্তিকে হেদায়েত করেন না যে মিথ্যাবাদী এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

(৪) যদি আল্লাহ্ পাক সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি, তিনি এক আল্লাহ্ পাক, প্রবল পরাক্রমশালী।

(৫) তিনি আসমান জমীনকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি যার পর নাই ক্ষমা-প্রিয়।

সূরা যুমার প্রসঙ্গেঃ

এ সূরায় ৮ রুকু, ৭৫ আয়াত রয়েছে। ৩ খানি আয়াত ব্যতীত অবশিষ্ট আয়াত সমূহ মক্কা শরীফে অবতীর্ণ। ঐ ৩ খানি আয়াত মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় ১,১৯২টি বাক্য ও ৪,০০০ অক্ষর রয়েছে।[১]

নামকরণ

সূরা যুমারের আরো একটি নাম হলো 'সূরাতুল গোরাফ'। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে, তবে হযরত হামজা (রাঃ)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী সম্পর্কে যে ৩ খানি আয়াত রয়েছে, তা মদীনা মোনাওয়্যারায় নাযিল হয়েছে।[২]

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৮৫
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৩২

এ সূরার ফজিলত

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রাতে সূরা বাকারা এবং সূরা যুমার তেলাওয়াত করতেন।[১]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার অধিকাংশ বিষয় প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কীয় ছিল। আর এ সূরার অধিকাংশ বক্তব্য তৌহীদ সম্পর্কে রয়েছে। যারা তৌহীদে বিশ্বাস করে তাদের জন্যে পুরস্কার এবং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মানবতার কলংক শেরক বা অংশীবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, আর এ সূরার প্রথম আয়াতেও পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে।[২]

এ সূরার আমল

যে ব্যক্তি সূরা যুমারকে লিপিবদ্ধ করে নিজের সঙ্গে রাখবে, সে জনপ্রিয় হবে।

তফসীরুল কোরআন

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ۝

'এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে'।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়; আর এটি রসূলের নিজের রচিত নয়; বরং এটি এক মহান অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। সর্বশক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকই এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন।

অতএব, এর প্রচার-প্রসারে কেউ বাধা দিতে পারবেনা, কেউ এর মহান শিক্ষার বিস্তারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেনা, এমনিভাবে কেউ এর ভাষার অলংকার, সৌন্দর্য এবং এর মর্মবাণীর মহিমায় কখনো সমকক্ষতা দাবী করতে পারবেনা তথা এর অনুরূপ কালাম কেউ রচনা করতে সক্ষম হবেনা।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৭৫
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯

الْعَزِيزِ

আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তিনি সর্ব শক্তিমান, তাঁর কালামের বিরোধিতা যারা করবে, তৎক্ষণাৎ তাদের শাস্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি الحكيم। অর্থাৎ মহাজ্ঞানী, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তই হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, তাই পবিত্র কোরআনের বিরোধীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়া হয়না; বরং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়। এটি তাঁর হেকমতের দাবী।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী সূরায় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বিশেষভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, আর কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের উপর যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করতো, তার জবাব দেয়া হয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহ পাকের তৌহীদ বা একত্ববাদের বিবরণ বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে, আর শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং যারা শেরকের মত ঘৃণ্য এবং জঘণ্য তৎপরতায় লিপ্ত হয়, তাদের শোচনীয় পরিণামও ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ের ভূমিকা স্বরূপ আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের সত্যতা ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছে, বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই নাযিল হয়েছে। অতএব, এ মহান গ্রন্থকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখানো কারোই উচিত নয়। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতা ঘোষণা করে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

'(হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার নিকটই এই কিতাব পবিত্র কোরআন সঠিকভাবে নাযিল করেছি'।

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۝

'অতএব, আপনি খাঁটি বিশ্বাস নিয়ে যথাযথভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করতে থাকুন'।

একথার তাৎপর্য হলো শেরক, রিয়া তথা লোক দেখানোর মনোবৃত্তি বর্জন করে এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকা কর্তব্য। যদিও আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, তবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে। আল্লাহ

পাকের এবাদত যদি একনিষ্ঠভাবে না করা হয়, পবিত্র এবং বিশুদ্ধ মন নিয়ে যদি দরবারে এলাহীতে হাযিরী না দেয়া হয়, তবে সে এবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না। (হে রসূল!) একথা আপনি সকলকে জানিয়ে দিন।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ط

'মনে রাখুন, খাঁটি নির্ভেজাল আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই প্রাপ্য'।

এতদ্ব্যতীত, কোন এবাদত দরবারে এলাহীতে গ্রহণযোগ্য হয়না। আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবার জন্যে এবাদতে আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা, শেরক ও রিয়া থেকে মনের পবিত্রতা পূর্বশর্ত।

হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত এজীদ রোক্কাশী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরজ করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ পাকের রাহে ব্যয় করে, কিন্তু তাদের এ ইচ্ছাও থাকে যেন দাতা হিসেবে তাদের খ্যাতি হয়। এমন অবস্থায় তারা কি সওয়াব পাবে'? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ 'আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত শুধু সে জিনিসই কবুল করেন, যা শুধু তাঁর জন্যেই করা হয়'। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ط

'যারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো তাদের পূজা শুধু এজন্যে করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে এনে দেবে'।

যুগে যুগে নবী রসূলগণ শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করেছেন এবং তৌহীদের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, বিশেষতঃ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরে সাহাবায়ে কেরাম সারা বিশ্বে তৌহীদের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। এর ফলে বর্তমান বিশ্বে প্রকাশ্যে কেউ আর একাধিক স্রষ্টার অযৌক্তিক দাবী তোলার দুঃসাহস দেখায় না। মুশরেকরাও এমন অসুন্দর মন্তব্য করতে লজ্জাবোধ করে। যারা অগণিত দেব-দেবীর পূজা করে, তারাও বর্তমানে সরাসরি শেরকের কথা না বলে শেরকের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার অপচেষ্টা করে। যেমন তারা বলে, স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক তো একজনই, তিনি মহান, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তবে তাঁর নৈকট্য-ধন্য হবার উদ্দেশ্যে আমরা দেব-দেবীর পূজা করি। কোন কোন বাতিল ফেরকা ফেরেশতাদেরকে 'নৈকট্য

লাভের মাধ্যম' হিসেবে মনে করে, আর কোন কোন বাতিল মতাবলম্বী দেব-দেবীকে 'নৈকট্যের মাধ্যম' মনে করে তাদের পূজা করে। এসব অযৌক্তিক এবং বাতিল মতবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। যারা একথা মনে করে যে, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দেব-দেবী তাদের পূজারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে, তাদের নৈকট্য-ধন্য করার ব্যবস্থা করবে, তারা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। আল্লাহ্ পাক কখনও শেরককে পছন্দ করেন না, পরোক্ষভাবে হোক বা প্রত্যক্ষভাবে। যারা পরোক্ষ ভাবে শেরকে লিপ্ত থাকে আর মনে করে যে, এভাবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে, তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে'। কে সত্য, আর কে মিথ্যা, কে হক্ব, আর কে বাতিল, সেদিনই তা জানতে পারবে। কেননা, কেয়ামতের দিন তৌহীদে বিশ্বাসী, ঈমানদার ও নেককার লোকদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার এবং আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করার তৌফিক দেয়া হবে। পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়ার এ জীবনে শেরক ও কুফরে লিপ্ত হয়, পাপাচারে মগ্ন হয়ে জীবনকে কলুষিত করে, তাদেরকে দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর তখনই কার্যতঃ হক্ব ও বাতিলের ফয়সালা হয়ে যাবে।

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে আরবের তিনটি গোত্র সম্পর্কে, বনী আমের, বনী কেনানা এবং বনী সালমা। এ গোত্রের লোকেরা মূর্তিপূজা করতো, আর ফেরেশতদেরকে আল্লাহর কণ্যা বলে মনে করতো (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)। তারা বলতো, আমরা ফেরেশতাদের পূজা এজন্যে করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন তাদেরকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করতো, তোমাদের প্রতিপালক কে? তোমাদেরকে এবং আসমান জমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা জবাব দিত, সবাইকে আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে তখন জিজ্ঞাসা করা হতো, তবে মূর্তি পূজা কর কেন? তারা বলতো, দেব-দেবীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করে থাকি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক মিথ্যাবাদী নাফরমানদেরকে সুপথ দেখান না'।

মিথ্যাবাদী সত্যদ্রোহীদের শাস্তি অবধারিত

যারা একথা বলে যে, আল্লাহ পাকের সন্তান রয়েছে, তারা নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলে। যেমন, নাসারারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে, আর ইহুদীরা হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক), এরা সকলেই জঘন্য মিথ্যা বলে, আর যারা দেব-দেবীদেরকে আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশকারী মনে করে, তারাও মিথ্যাই বলে। এমন মিথ্যাবাদী সত্যদ্রোহীদেরকে আল্লাহ পাক সুপথ প্রদর্শন করেন না। তারা তাদের মিথ্যাবাদিতা, অকৃতজ্ঞতা এবং নাফরমানীর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

'যদি আল্লাহ পাক সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। তিনি যে পাক পবিত্র, তিনিই আল্লাহ, এক, অদ্বিতীয়, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাক সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন। আর স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে কোন ভাবেই শ্রেণীগত সাদৃশ্য থাকতে পারেনা। অথচ পিতা-পুত্রের মধ্যে শ্রেণীগত সাদৃশ্য একান্ত অনিবার্য। তাই কোন সৃষ্টি আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি হতে পারেনা।

মূলতঃ আল্লাহ পাক এমন সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর অনন্ত অসীম শক্তির কারণেই তিনি আসমান জমীনকে সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ

'তিনি আসমান জমীনকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন, তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা এবং তিনি সূর্য চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রণাধীন'।

অর্থাৎ আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য সবই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সূর্যোদয়ের সময় পূর্বাকাশে লক্ষ্য করা যায় যেন দিনের আলো রাতের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দেয়। ঠিক এমনিভাবে গোধূলি লগ্নে যখন সূর্য অস্তমিত হয় তখন দেখা যায় যেন রাতের অন্ধকার কালো চাদরের ন্যায় দিনের আলোর উপর ছড়িয়ে পড়ছে। এভাবে দিনের আলো কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় হয়ে যায়। দিবা-রাত্রির আগমন-নির্গমনে কোন ফাঁক থাকেনা, একটির পর একটি ক্রমশঃ যথানিয়মে হতেই থাকে। এটি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّىؕ

'প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত'। আর এ নির্দিষ্ট কাল কবে শেষ হবে, তা একমাত্র আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন।

اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ۝

'মনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি যার পর নাই ক্ষমা-প্রিয়'।

অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, যে কোন সময় অবাধ্য পাপীষ্ঠদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি অতিশয় মার্জনা–প্রিয়, তাই তাৎক্ষণিক শাস্তি বিধান করেন না। আর অবাধ্য পাপীষ্ঠদের থেকে তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ ছিনিয়ে নেননা।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, العزيز। শব্দটির তাৎপর্য হলো, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, তিনি তাদের শাস্তি বিধানে সম্পূর্ণ সক্ষম, আর الغفار। শব্দটির তাৎপর্য হলো, তওবাকারী, গুনাহগারদেরকে তিনি ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে দুনিয়াতে অবকাশ দিয়ে থাকেন এবং আখেরাতে মাগফেরাত দান করবেন।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২৩৯

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ
بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝٦ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ ۟ وَلَا
يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

তরজমা

(৬) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে, এরপর তিনি তার জোড়ও সৃষ্টি করেছেন ঐ দেহ থেকেই, আর তোমাদের জন্যে চতুঃষ্পদ জন্তু থেকে আট প্রকারের নর-মাদী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় তিনটি অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তিনি তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব শুধু তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। অতএব, তোমরা বিমুখ হয়ে কোথায় চলেছ?

(৭) যদি তোমরা কাফের হও, (তবে জেনে রাখ যে) নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। আর আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের নাফরমানী, নেমকহারামী পছন্দ করেন না। যদি তোমরা শোকর গুজার হও, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তাই পছন্দ করেন, (জেনে রেখ) একের বোঝা অন্যে বহন করবেনা, এরপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবগত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তর সমূহের গোপন কথা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাকই আসমান জমীনের একমাত্র স্রষ্টা, যথা নিয়মে রাত ও দিনের পরিবর্তনকারীও তিনি, চন্দ্র ও সূর্য তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলে

অবাধ্য কাফেরদের যে কোন সময় শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, তাই অবাধ্য-অকৃতজ্ঞদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেননা। অতএব, এক আল্লাহ পাকের অস্তিত্বে এবং তাঁর একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য। নভোমন্ডল-ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, আর সৃষ্টি মাত্রই স্রষ্টার প্রমাণ, অতএব বৈচিত্র্যময় এ বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকেনা।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

মানুষ তার নিজের সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ দেখতে পায়। হে মানব জাতি! লক্ষ্য কর, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের নিজেদের সৃষ্টিই তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অপূর্ব নিদর্শন।

পিতা-মাতা ব্যতীতই আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী হাতে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। এরপর আদম (আঃ)-এর দেহ থেকেই তাঁর জীবন-সঙ্গিনী হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ অর্থ হল, সৃষ্টির প্রথম দিনে আল্লাহ পাক তোমাদের সকলকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠ-দেশ থেকে বের করেছেন, আর আদম (আঃ)-এর দেহ থেকেই তাঁর জীবন-সঙ্গিনী হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছু এক আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জি, কুদরত এবং হেকমতেই হয়েছে, মানব সৃষ্টির এ অব্যাহত প্রক্রিয়া আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ, শুধু তাই নয়; বরং পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ পাক মানব জাতির উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

'তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন'। এ পর্যায়ে চতুষ্পদ জন্তুগুলোর উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ط

আর আল্লাহ পাক তোমাদের উপকারার্থেই আট প্রকার চতুঃষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। চার প্রকার নর, চার প্রকার মাদী। উট, গরু, ঘোড়া, ছাগল– এই আটটি নর ও মাদী মানুষের উপকারার্থেই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন।

যেহেতু আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত 'লওহে মাহফুজ' হয়ে দুনিয়াতে আসে এবং সে সিদ্ধান্ত মোতাবেকই দুনিয়াতে কাজ হয়, পৃথিবীতে হুকুম জারী হয়, তাই চতুঃষ্পদ জন্তুর এ আদেশকেও انزل। শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, যে সব উপকরণ দ্বারা এ চতুঃষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করা হয়, তা আসমান থেকে বা উর্দ্ধজগত থেকেই নীচে আসে। যেমন বৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জের আলো ও তাপ। অথবা এর অর্থ হলো, হযরত আদম (আঃ)-এর জান্নাতে অবস্থানকালে যে সব চতুঃষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করা হয়, সেগুলোকে হযরত আদম (আঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়।

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط

'তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় সৃষ্টি করেন তিনটি অন্ধকারের মধ্যে'।

মানব-সৃষ্টির ইতিকথা

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাক একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ আদম (আঃ) থেকে, আর আদম (আঃ)-এর দেহকে আল্লাহ পাক তাঁর দস্তে মোবারকে তৈরী করে তাতে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতে মানব-সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের আরেকটি বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, তার জীবন। মানুষ যদি তার সৃষ্টির ক্রমধারার প্রতি চিন্তা ও গবেষণা করে, তবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞাবনত হয়ে থাকাই তার একান্ত কর্তব্য বলে মনে করবে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক আত্মবিস্মৃত মানুষকে মানব-সৃষ্টির রহস্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনের এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম উপলব্ধি করার আহবান জানিয়েছেন।

خَلَقَكُمْ

অর্থাৎ হে আত্মভোলা মানুষ! আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় সৃষ্টি করেন, আর তাতে বিভিন্ন সময় একাধিক পরিবর্তন সূচিত হয়, আর তা হয় আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতেই। প্রথমতঃ শুক্র বিন্দু, আর তা থেকে আল্লাহ পাক রক্ত পিন্ড তৈরী করেন, এরপর তার ক্রমবিকাশ ঘটে মাংস পিন্ডের মাধ্যমে, এরপর তাতে অস্থি চর্ম প্রভৃতি সৃষ্টি করা হয়। মানব

সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিই আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

فِى ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক মানুষের সৃষ্টিকর্ম সুসম্পন্ন করেন 'তিনটি অন্ধকারের মধ্যে'। কেননা মানব সন্তান আল্লাহ পাকের কুদরতে একটি 'ঝিল্লী'র মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। আর তা জরায়ুতে স্থাপিত হয় এবং তা মাতৃগর্ভের নিম্নদেশে থাকে। তাহলে তিনটি অন্ধকার (১) পেট (২) জরায়ু (৩) ঝিল্লী যা প্রসব কালে বের হয়ে আসে।

হযরত সাঈদ এবনে মানসুর, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতের خلقامن' بعد خلق কথাটির অর্থ হলো, প্রথমে মানুষ শুক্র বিন্দু থাকে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তা রক্ত পিন্ডে পরিণত হয়, তৃতীয় পর্যায়ে তা মাংস পিন্ডে রূপান্তরিত হয়। এরপরে আসে অস্থি-চর্ম। এসব কিছুই আল্লাহ পাকের কুদরতে, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জিতে হয়। মানুষের প্রতি এসব আল্লাহ পাকের দান। আর 'তিনটি অন্ধকারের' ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একটি হলো পেটের অন্ধকার, দ্বিতীয়টি জরায়ুর অন্ধকার, তৃতীয়ঃ ঐ ঝিল্লীর অন্ধকার যাতে শিশুটিকে সংরক্ষণ করা হয়।[১]

সুদীর্ঘ নয় মাস যাবত মানব সন্তানকে এই তিনটি অন্ধকার অতিক্রম করে আল্লাহ পাকের হুকুমে পৃথিবীর আলো দেখতে হয়। এভাবে আল্লাহ পাক তাকে মাতৃ-গর্ভ থেকে বের করে আনেন, আর এ সম্পর্কেও আল্লাহ পাক ঘোষণা করেনঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ

'আর আল্লাহ পাক বের করে এনেছেন তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের গর্ভ থেকে, তখন তোমরা কিছুই জানতেনা। এরপর আল্লাহ পাক দান করেছেন তোমাদেরকে শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং (উপলব্ধি করার জন্য) অন্তর, হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে'।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৫

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেনঃ এলাহাবাদের একজন অমুসলিম চিকিৎসক এ আয়াত পাঠ করে মুসলমান হয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে মানব-সৃষ্টির ক্রমধারার যে বিবরণ স্থান পেয়েছে, তা দেখে তিনি বলেছিলেন, এসব কথা আরবের সেই উম্মী রসূলের হতে পারেনা, একথা মহাজ্ঞানী, মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাকেরই। এতে পবিত্র কোরআনের সত্যতা তথা ইসলাম যে সত্য ধর্ম তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশের যে ধারা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তাতে আল্লাহ পাকের দুটি বিস্ময়কর গুণের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে, একটি হলো আল্লাহ পাকের সর্বময় ক্ষমতা এবং বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের এবং দ্বিতীয়টি পরিপূর্ণ এলমের।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

'তিনিই আল্লাহ, তিনি তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব শুধু তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। অতএব, তোমরা বিমুখ হয়ে কোথায় চলেছ'?

এক আল্লাহ পাকই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

মানব সৃষ্টির যে ইতিকথা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাতে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের যে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যিনি তোমাদেরকে এভাবে জীবন দান করেছেন, তিনিই তো তোমাদের আল্লাহ, তিনিই তো তোমাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা, তিনিই মালিক, সব কিছু তাঁরই, তোমাদের সৃষ্টিতে কেউ তাঁর শরীক নেই, অতএব, তোমাদের এবাদতেও কেউ তাঁর শরীক হতে পারেনা। মা'বুদ বা উপাস্য হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আর কারো নয়। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হও কোন্ যুক্তিতে? কোন্ বুদ্ধিতে? এবং আল্লাহ পাকের দরবার থেকে বিমুখ হয়ে কোথাও যাও? আল্লাহ পাকের এক আদেশে পৃথিবীতে তোমাদের আগমন হয়েছে, আরেকটি আদেশে তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিতে হবে। অতএব, পৃথিবীতে অবস্থানকালেও আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির থাকাই তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা কোথায় যাও?

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯১৯
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৮৯

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ

'যদি তোমরা কাফের হও, (তবে জেনে রাখ যে) নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। আর আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের নাফরমানী পছন্দ করেন না। যদি তোমরা শোকর গুজার হও, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তাই পছন্দ করেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানব সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মহান দানের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এতদসত্ত্বেও যদি আল্লাহ পাকের অসামান্য দান এবং অনন্ত অসীম নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার কর, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হও তবে তাতে তাঁর কিছুই যায় আসেনা। কেননা আল্লাহ পাক কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। কারো ঈমানের কারণে তাঁর কোন উপকার হয়না, কারো কুফরী ও নাফরমানীর কারণেও তাঁর কোন ক্ষতি হয়না। এজন্যে তিনি কারো পরোয়া করেন না। তবে কারো কুফরী ও নাফরমানী তিনি পছন্দ করেন না। ঈমান ও কুফরের উপকার বা অপকার যে করে তারই হয়।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ

যদি তোমরা কুফরী ও নাফরমানী কর তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। তবে তোমাদের নাফরমানী তিনি পছন্দ করেন না, কেননা তাঁর কঠিন শাস্তি তোমাদের ভোগ করতে হবে।

মুসলিম শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, 'হে আমার বন্দা! যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে, সবাই একত্রিত হয়ে একটা মন্দ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায় তবুও আমার রাজত্বের কোন ক্ষতি হবেনা। তবে মনে রেখ, আল্লাহ পাক তোমাদের অকৃতজ্ঞতায় সন্তুষ্ট নন, আর যদি তোমরা তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাদেরকে আরো নেয়ামত দান করবেন। প্রত্যেকে তাই পাবে যা সে করে পাঠাবে'।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৭৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে মুশরেকদের একটি বাতিল আকীদার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের আকীদা ছিল ঠাকুর-দেবতারা নিজেই পূজারীদের পূজা এবং অন্যান্য বস্তুর মুখাপেক্ষী। পূজারীদের ইচ্ছা মোতাবেক তারা যাকে ইচ্ছা তাকে দেবতা মনোনীত করে এবং তাদের সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য উৎসর্গ করে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এ বাতিল আকীদার বাতুলতা ঘোষণা করেছেনঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنۡكُمۡ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কারো পরোয়া করেন না, কারো নিকট তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, সমস্ত সৃষ্টি জগত তাঁর দানের ভিখারী'।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা হল, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে, কেননা আল্লাহ পাক কোন ব্যাপারেই কারো মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের ঈমানেরও তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, তবে তোমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান না আন তবে তোমরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তোমাদের কুফরী ও নাফরমানী আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, আল্লাহ পাক মোমেন বন্দার জন্যে কুফরী ও নাফরমানী আদৌ পছন্দ করেন না। এরা হল সে সব বন্দা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইবলিসকে বলেছিলেন–

اِنَّ عِبَادِىۡ لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطٰنٌ

'নিশ্চয় আমার বন্দাদের উপর তোর কোন দৌরাত্ম চলবে না'।

মূলতঃ আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَآ اَمۡرُهٗۤ اِذَآ اَرَادَ شَيۡئًا اَنۡ يَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯১৯

'আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা তো এমন, কোন কিছুর ইচ্ছা করলে, তিনি বলেন 'হও' আর তখন তা হয়ে যায়'।[১]

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰی ط

'(মনে রেখ) একের বোঝা অন্যে বহন করবেনা'।

অর্থাৎ একের দায়ভার অন্যের বহন করার প্রয়োজন হবেনা। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এমন অবিচার নেই। এ আয়াত দ্বারা এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফেরদের কুফরীর পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে এবং তোমাদের কুফরীর জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতি হবেনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করছেন, যদি তোমরা এ আহবানে সাড়া দাও তবে তোমরাই উপকৃত হবে। পক্ষান্তরে, যদি তোমরা তাঁর আহবানে সাড়া না দাও তবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাঁর কোন ক্ষতি হবেনা।

ثُمَّ اِلٰی رَبِّکُمْ مَّرْجِعُکُمْ فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'এরপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবগত করবেন'।

মূলতঃ মানুষের এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, পরকালীন জীবনই হল চিরস্থায়ী। প্রত্যেককে অবশ্যই এ জীবনের পর আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে। এ জীবনের প্রতিটি কর্ম সম্পর্কে প্রত্যেককে জবাবদেহী করতে হবে। ভাল কাজ হলে তার পুরস্কার সুনিশ্চিত। আর মন্দ হলে তার শাস্তি হবে অবধারিত।

اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ۝

'নিশ্চয় তিনি অন্তর সমূহের গোপন কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন'। তাই তিনি তোমাদের নিয়ত মোতাবেক তোমাদের পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন।

পূর্ববর্তী আয়াতে আখেরাত সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, এ জীবনের মোহ-মায়ায় হারিয়ে যেওনা, পরকালীন জীবনের সাফল্য লাভের জন্যে সচেষ্ট হও। আর পরবর্তী আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে মানুষের কর্মের নিয়ত সম্পর্কে। ভাল কাজ যথেষ্ট নয়, যদি ভাল নিয়ত না থাকে। আর ভাল নিয়ত হল শুধু আল্লাহ

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৪৭

পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ করা, যদি এখলাস এবং মহব্বত নিয়ে সামান্য নেক আমলও করা হয় তবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এর গুরুত্ব অনেক বেশী হয়। পক্ষান্তরে, যদি নেক আমলের সাথে এখলাসের অভাব থাকে তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল না করা হয়, বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা হয় তবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এর কোন গুরুত্বই থাকেনা। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা এবং তোমাদের অর্থ-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিপাত করেন তোমাদের অন্তরের দিকে এবং তোমাদের আমলের দিকে'।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে পাপীষ্ঠ লোকদের জন্যে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহ পাক সবার আমল এবং তাদের অন্তরে নিহিত নিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। অতএব, কাল কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার আমল ও নিয়ত অনুসারে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া হবে। ইমাম রাজী (রঃ) আরও বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ঈমানদার ও নেককার লোকদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২৪৮

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ
مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ
مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ
بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ
اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ
وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

তরজমা

(৮) যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে তার প্রতিপালককে একান্ত মনে ডাকে। পুনরায় যখন তাকে আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেন তখন সে তা ভুলে যায়, যে জন্যে ইতোপূর্বে সে তাঁকে ডেকেছিল (শুধু তাই নয়; বরং) সে মহান আল্লাহ পাকের সাথে শরীক স্থির করে, যাতে করে অন্যদেরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে। (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তোমার কুফরী জীবন সামান্য কিছুদিন উপভোগ কর, নিশ্চয় তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত।

(৯) জিজ্ঞাসা করি-ঐ যে এক ব্যক্তি রাতের বেলা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল হয়ে সেজদারত হয়, দন্ডায়মান থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের রহমতের আশা করে, সে কি তার সমান যে তা করেনা, (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যারা জানে আর যারা জানেনা, তারা কি এক সমান হতে পারে? যারা বুদ্ধিমান, শুধু তারাই ভেবে দেখে এবং উপদেশ গ্রহণ করে।

(১০) (হে রসূল!) আপনি আমার কথা এভাবে জানিয়ে দিন) হে আমার মোমেন বন্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যারা এ পৃথিবীতে নেক আমল করে তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ, আর আল্লাহ পাকের এ পৃথিবী অত্যন্ত

বিশাল, যারা (এ জীবনে) সবর অবলম্বন করবে, তাদেরকে অগণিত পরিমাণে সওয়াব দান করা হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের শান বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ মানুষের চরিত্র বড়ই বিচিত্র, যখন সে বিপদগ্রস্ত হয়, জান বা মালের ব্যাপারে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়, সামুদ্রিক সফরে অথবা আকাশ ভ্রমণে জীবন নাশের আশঙ্কা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন কত কাতর হয়ে সে আল্লাহ পাককে ডাকে, এ মহা বিপদে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ রক্ষা করতে পারবেনা, মর্মে মর্মে সে এ সত্য উপলব্ধি করে এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে বিপদ-মুক্তির জন্যে দোয়া করতে থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে চরম বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেন, তার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেন, তখন সে আল্লাহ পাককে এমনভাবে ভুলে যায় যেন সে কখনো তাঁকে ডাকেনি, কখনো তাঁর মহান দরবারে সে দয়া প্রার্থী হয়নি, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ

'যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে তার প্রতিপালককে একান্ত মনে ডাকে। পুনরায় যখন তাকে আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেন, তখন সে তা ভুলে যায় যে জন্যে ইতোপূর্বে সে তাঁকে ডেকেছিল'।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কার কাফের সর্দার ওতবা এবনে রবীয়া সম্পর্কে। তবে অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা সাধারণভাবে সকল যুগের কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ইতোপূর্বে যে কাফেরদের আলোচনা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২৪৯

'(শুধু তাই নয়; বরং) সে মহান আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক স্থির করে যাতে করে অন্যদেরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত লাভের পর শুধু যে সে আল্লাহ্ পাককে ভুলে যায় তাই নয়; বরং সে আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক স্থাপন করে, তার ঠাকুর-দেবতাদেরকে ডাকে এবং তাদের সম্মুখে তোয়াজ করে, এমনকি সে একথাও মনে করে যে, তার ঠাকুর-দেবতাদের কারণেই সে বিপদমুক্ত হয়েছে, অথচ বিপদের সময় সে তাদের নাম মুখে আনেনি, ডেকেছে আল্লাহ্ পাককে। এভাবে শুধু যে সে নিজে পথভ্রষ্ট হয় তাই নয়; বরং অন্যদেরকেও বিপথগামী করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ النَّارِ ۞

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তোমার কুফরীর জীবন সামান্য কিছুদিন উপভোগ কর, নিশ্চয় তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত'।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন, কুফরী ও শেরক দ্বারা কলুষিত এ জীবনের সামান্য কয়েকটি দিন উপভোগ করে নাও, আর মনে রেখ, তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত।

قَلِيلًا

সামান্য কয়েক দিন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভোগ করে নাও।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু হোজায়মা এবনে মগীরা মাখজুমী সম্পর্কে। আর কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছন, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে উয়াইনাহ এবনে রবীয়াকে।[১]

বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী

বস্তুতঃ এ সংক্ষিপ্ত আয়াত খানিতে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্যে রয়েছে এক বিশেষ সতর্কবাণী। বর্তমান যুগে বিশ্ববাসী এ জীবনের সুখ শান্তিকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়, এ নশ্বর জগতের সীমিত সময়কে কীভাবে উপভোগ করা যায়-সবার মনে এই একই ভাবনা, কি মুসলিম আর কি অমুসলিম, এ ব্যাপারে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এ জীবনের ভোগ-সম্পদ অর্জনের জন্যে আজকের বিশ্বে কাফেরদের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৪৯

মত মুসলমানরাও হালাল-হারামের বাছ বিচার করতে প্রস্তুত নয়। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নির্ধারিত সীমা লজ্ঘন করতেও দ্বিধাবোধ করা হয়না, কাফের এবং মুসলমানদের জীবনধারায় ঈদ এবং শবেবরাতের ন্যায় কতিপয় বিশেষ দিনগুলো ব্যতীত অন্য সময় তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়না। পুঁজিবাদী দুনিয়ার মত সুদভিত্তিক অর্থনীতি মুসলিম দেশ সমূহেও প্রচলিত হয়েছে। পরিণামে সুদী লেন-দেনেও এখন অনেকের মধ্যে কোন অনীহা নেই, ঘুষ-দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে।

হিংসা-প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধের নেশা এখন সমাজ জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি, ছিনতাই, সন্ত্রাস সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে। জুলুম-অত্যাচার, অবিচার-অনাচার-ব্যাভিচার এখন নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরিণতিতে হত্যাকান্ড হচ্ছে সর্বত্র। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত দৈনন্দিন খবরগুলোই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সবাই এ পৃথিবীর স্থায়ী নাগরিক, কোন দিন তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবেনা, নিজেদের কীর্তিকলাপের জন্যে কখনো কারো নিকট জবাবদেহী করতে হবেনা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা মোটেই তা নয়; বরং অবশেষে প্রত্যেককেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর এ ছায়া মায়া ঘেরা পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর অলজ্ঘনীয় বিধান প্রত্যেকের ব্যাপারেই কার্যকর হবে এবং অবশেষে প্রত্যেককেই আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

'আর তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন তোমরা ফিরে যাবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে। এরপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় পুরোপুরিই দান করা হবে। আর তাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা'। পবিত্র কোরআনের অন্যত্র আরো এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۞ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۞

'যে কেউ শষ্য পরিমাণও সৎ কাজ করবে সে তার শুভ পরিণতি অবশ্যই দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে, যে শষ্য পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, সে তার শোচনীয় পরিণতিও দেখতে পাবে'।

অতএব, দায়িত্বহীন জীবন কারো জন্যেই কাম্য নয়, বাধা-বন্ধনহীন স্বেচ্ছাচারী জীবন কারো জন্যেই শোভনীয় নয়, ভোগের নেশায় মত্ত থাকা সহজ কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আদৌ সহজ নয়। বিশ্ব-গ্রন্থ পবিত্র কোরআন তাই আলোচ্য আয়াতে ভোগবাদী বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়ে ঘোষণা করেছেঃ

قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا......

'(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন, তুমি তোমার কুফরী ও নাফরমানীর এই জীবনকে সামান্য কিছু দিনের জন্যে ভোগ করে নাও', তবে এর ভয়াবহ পরিণতির জন্যেও প্রস্তুত থাক। কেননা একথা নিশ্চিত যে, তুমি দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

অন্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের এ সতর্কবাণীকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ

(সূরা হিজর ঃ ৩)

'তাদেরকে ছেড়ে দিন, খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং তাদের সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, অদূর ভবিষ্যতে তারা বুঝতে পারবে'।

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ط

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের একটি বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কুফর ও নাফরমানীকে আদৌ পছন্দ করেন না, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান, আনুগত্য এবং শোকর গুজারীই তাঁর দরবারে পছন্দনীয় কাজ। দ্বিতীয়তঃ তিনি কারো কাছে কোন ব্যাপারেই মুখাপেক্ষী নন। কারো কুফর ও নাফরমানী দ্বারা তাঁর কোন ক্ষতি হয়না, যে কুফর ও নাফরমানী করে, সে নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। এমনিভাবে, যে ঈমান আনে এবং আনুগত্য প্রকাশ করে, তার দ্বারা আল্লাহ পাকের কোন উপকার নেই, বরং এর দ্বারা সে-ই উপকৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে তাঁর বন্দেগীতে মশগুল হয়, তারা উচ্চ মর্তবা লাভ করে। যারা এ গুণে গুণান্বিত নয়, তারা কখনো ঈমানদার ও এবাদতগুজার লোকদের সমান হতে পারে না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ

رَبِّهٖ—

'জিজ্ঞাসা করি-ঐ যে এক ব্যক্তি রাতের বেলা আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে মশগুল হয়েছে, সেজদারত এবং দন্ডায়মান অবস্থায় রয়েছে, সে আখেরাতকে ভয় করে, তার প্রতিপালকের রহমতের আশা করে, সে কি তার সমান যে তা করেনা'?

নেককার ও বদকার কখনও সমান হতে পারেনা

এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ পাকের ভক্ত-প্রেমিক বন্দা, তারা রাতের সুখময় নিদ্রা পরিত্যাগ করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দন্ডায়মান হয়, সেজদারত হয় এবং একদিকে আল্লাহকে ভয় করে, অন্যদিকে তাঁর রহমতের আশাও করে, তারা কি সে সব লোকের সমান হতে পারে? যারা এমন নেক আমল করেনা। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা, তাঁর বিধি-নিষেধ মানেনা, কখনো দরবারে এলাহীতে হাযির হয়না, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, তারা কখনো নেককারদের সমান হতে পারে না। যেমন আলো-আঁধার, ভাল-মন্দ এক সমান হয় না।

আলোচ্য আয়াতে قانت শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, এ শব্দটি قنوت থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হলো পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত করা এবং আল্লাহ পাকের দরবারে নামাযে দন্ডায়মান হওয়া, অথবা সেজদারত হওয়া।

يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ

অর্থাৎ নিজেরা যত নেক আমলই করুক, কিন্তু তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে আমলের ক্রটির ব্যাপারে, যদি আল্লাহ পাক দয়া করে আমার এবাদত কবুল না করেন, তবে আখেরাতে আমার কী হবে? এজন্যে তারা সর্বদা আখেরাতের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এবং আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে, কেননা কোন মোমেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়না। এটি প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য।

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে।

১. যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াত যাঁর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)।

২. তফসীরকার কালবী (রঃ) আবু সালেহ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) সম্পর্কে।

৩. অন্য একটি সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ মতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) এবং হযরত সালেম মওলা আবু হোজায়ফা (রাঃ) সম্পর্কে।

৪. একরামা (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) সম্পর্কে।

৫. আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে।

৬. হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে। এবনে আবি হাতেমও একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

৭. কালবী (রঃ)-এর আরো একটি মতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ) এবং হযরত সালমান (রাঃ) সম্পর্কে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করার ফলশ্রুতি হলো, যাঁদের নাম এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াত তাঁদের সকলের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, তথা আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য উপরোক্ত সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে প্রযোজ্য।[১]

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, এবনে মরদবিয়া, আবু নাঈম এবং এবনে আসাকের হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত গুণাবলী ছিল হযরত ওসমান এবনে আফ্যান (রাঃ)-এর মধ্যে। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতেরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে তাঁদের কথা বলা হয়েছে যাঁরা রাত অতিবাহিত করেন নামাযে দন্ডায়মান হয়ে এবং সেজদারত অবস্থায়। আর قانت শব্দটির অর্থ হলো 'অনুগত'। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اٰنَاۤءَ الَّيْلِ (রাতের বেলা) কথাটির তাৎপর্য হলো 'অর্ধেক রাত'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৫০
২। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩০৬

মনসুর (রঃ) বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো মাগরেব থেকে এশার মধ্যবর্তী সময়।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, রাতের প্রথমাংশ, মধ্যভাগ এবং রাতের শেষ প্রহর।

এ আয়াতে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্য এই, তাঁরা আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত থাকেন। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা আল্লাহ পাকের রহমতের আশায় আশান্বিত থাকেন। তাঁদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো জীবনে ভয়ের প্রভাব অধিকতর থাকে, কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁদের অন্তরে ভয় থেকে রহমতের আশা অধিকতর থাকে।

বর্ণিত আছে, একজন সাহাবীর ইন্তেকালের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি অবস্থা'? তিনি আরজ করলেন, 'ভয় এবং আশার মাঝে রয়েছি'। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ 'যে ব্যক্তির অন্তরে এমন সময় এ দু'টি জিনিস একত্রিত হয়, আল্লাহ পাক তার আশা পূর্ণ করেন এবং তাকে তার ভয় থেকে নাজাত দান করেন' (তিরমিজী, এবনে মাজা)।

নেসায়ী শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এক রাতে একশত আয়াত পাঠ করে, তার আমলনামায় সারা রাতের এবাদত লিপিবদ্ধ হয়।[১]

রাতের এবাদত উত্তম

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দিনের এবাদতের চেয়ে রাতের এবাদত উত্তম, কেননা এ আয়াতে اٰنَاۤءَ الَّيْلِ (রাতের বেলার) কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কয়েকটি কারণও রয়েছে।

১. রাত্রিকালে যখন সারা বিশ্বের মানুষ নিদ্রিত থাকে তখন কেউ এ এবাদত দেখতে পায় না, ফলে রাতের এবাদত 'রিয়া' বা লোক দেখানোর ভয় থেকে সংরক্ষিত থাকে।

২. নিঝুম রাতে কোন কিছু দেখাও যায় না, কোন কিছু শোনাও যায় না, এমন অবস্থায় মন সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ পাকের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে কোন বাধা-বিপত্তি থাকেনা।

৩. রাত মূলতঃ নিদ্রা বা বিশ্রামের সময়, আল্লাহ পাকের মহব্বতে, তাঁর বন্দেগীর লক্ষ্যে নিদ্রা তথা বিশ্রাম পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, আর এজন্যে এর

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৭৯

সওয়াব অধিকতর। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত হওয়া এবং তাঁর সমীপে দন্ডায়মান থাকা তাঁর নৈকট্য-ধন্য হবারই প্রমাণ, তাই রাতের এবাদত উত্তম।[১]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ۞

'(হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি এক সমান হতে পারে? যারা বুদ্ধিমান শুধু তারাই এসব কথা ভেবে দেখে এবং উপদেশ গ্রহণ করে'।

অর্থাৎ যারা ঈমানদার, নেককার, এবাদত গুজার এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার, তারা এবং বেঈমান ও বদকার কখনো এক সমান হতে পারেনা যেমন মূর্খ ও শিক্ষিত, আলেম ও জাহেল কখনো সমান হতে পারেনা।

আলেমের মর্যাদা

এসব হাদীস নয় ১/৮৪-৮৫ পৃ:

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'আলেমগণ হলো নবীগণের উত্তরাধিকারী'। কাজেই আলেমগণের নিকট থেকে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য। এভাবেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু হোরায়রা! আল্লাহ পাকের আরশের নীচে স্বর্ণ-নির্মিত একটি শহর আছে, তার দ্বারে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন আলেমের সঙ্গে সাক্ষাত করলো, সে যেন আল্লাহর নবীগণের সঙ্গে সাক্ষাত করলো। যে আলেমগণের সঙ্গে বসলো, সে যেন নবীগণের মজলিসে বসলো। যে আলেমগণের উপকার করলো এবং তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলো, সে যেন নবীগণের উপকার করলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন আলেমের একদিন খেদমত করলো, সে যেন অন্য লোকের সত্তর বছর সেবা করলো। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে আবু হোরায়রা! চার প্রকার লোকের উপর দ্বীন নির্ভরশীল (১) পরহেযগার আলেম, (২) দানশীল ধনী, (৩) ধৈর্যশীল

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৫০

ফকীর, (৪) ন্যায় পরায়ণ রাষ্ট্রপরিচালক। তিনি আরো এরশাদ করেছেনঃ কোন আলেমের মৃত্যু হলে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে ইসলামে ফাটল সৃষ্টি হয়। একজন আলেম এক হাজার (অ-আলেম) এবাদতকারী অপেক্ষা ইবলিসের উপর অধিক ভারী। তিনি আরো এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক কোন সম্প্রদায়ের উপর রহমত নাযিল করার ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে একজন আলেম ও উপদেশ প্রদানকারী প্রেরণ করেন। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ পাক কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণের ইচ্ছা করলে তাদের আলেমের মৃত্যু ঘটান, এরপর তাদের উপর আসে বালা-মসিবত।

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

এসব কথা শুধু তারাই ভেবে দেখে যারা বুদ্ধিমান, আর এ থেকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, যারা নির্বোধ, তারা এসব কথা বোঝেও না, আর পবিত্র কোরআন থেকে উপদেশও গ্রহণ করেনা।

الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ যারা জানে, যারা আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করে, যারা আল্লাহ্ পাকের জ্বালালী ও জ্বামালী গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়, তারা আল্লাহর আযাবকে ভয় করে এবং তাঁর রহমতের আশাও করে, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন এবং পাপাচার থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকে, তারা এবং যারা কিছু জানেনা, এ দু'দল কখনও সমতুল্য হতে পারেনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'যারা জানে' একথা বলে হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ)-এর প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। আর 'যারা জানে না' একথা বলে আবু হোজায়মা মাখজুমীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শিক্ষিত এবং মূর্খ যেমন এক সমান নয়; ঈমানদার ও বেঈমান, নেককার ও বদকারও তেমনি এক সমান নয়; শুধু বুদ্ধিমান লোকেরাই এ দু'দলের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে।

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط

'(হে রসূল!) আপনি আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দিন) হে আমার মোমেন বন্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যারা এ পৃথিবীতে নেক আমল করে তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ'।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কখনো এক সমান হতে পারেনা, আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমার মোমেন বন্দাদেরকে আমার নির্দেশ জানিয়ে দিন যে, তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, অর্থাৎ ঈমানের পর তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর, ঈমানের পরিপূরক হলো তাকওয়া পরহেযগারী, ঈমান পরিপূর্ণ হয় তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের মাধ্যমে। এজন্যে কোরআনে করীমে বারে বারে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। আর যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে, তাদের শুভ-পরিণতি ঘোষণা করে পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছে–

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا

'যারা নেক আমল করে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ', আর এ নেক আমলের মানদন্ড হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভাষায়ঃ 'তোমরা এভাবে আল্লাহ পাকের এবাদত কর, যেন তোমরা তাঁকে দেখছ, যদি তোমাদের মনের এ অবস্থা না হয় তবে একথা জেনে রাখ যে, তিনি তোমাদেরকে দেখছেন'। এ অবস্থায় যেভাবে তিনি সন্তুষ্ট হন, সেভাবে তাঁর এবাদত কর। যদি পৃথিবীর এমন স্থানে বাস কর, যেখানে সঠিক ভাবে আল্লাহ পাকের এবাদত করা সম্ভব হয়না, তবে সেখান থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাও এবং আল্লাহ পাকের বন্দেগীর হক্ব আদায় কর। তাই এরশাদ হয়েছে–

وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ط

'আর আল্লাহ পাকের এ পৃথিবী অত্যন্ত বিশাল'।

যেখানে সঠিকভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা সম্ভব না হয়, সেখান থেকে মোমেন বন্দার হিজরত করাই কর্তব্য কেননা, জীবনের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ পাকের বন্দেগী, যদি বন্দেগীই সম্ভবপর না হয় তবে জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ, তাই জীবনকে সফলকাম করার প্রয়োজনে মোমেন বন্দাকে হিজরত করতে হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা মক্কা শরীফ থেকে হিজরত কর।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমার জমীন বিশাল, অতএব তোমরা মক্কা শরীফ থেকে হিজরত কর। আর সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ)

বলেছেন, কোন এলাকায় যদি মুসলমানদেরকে গুনাহ্ করার জন্যে হুকুম দেয়া হয়, তবে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া তাদের কর্তব্য।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'যারা সবর অবলম্বন করবে, তাদেরকে অগণিত পরিমাণে সওয়াব দান করা হবে'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যারা আল্লাহর রাহে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, দ্বীন ইসলামের উপর কায়েম থাকার জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেয়, দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করার নিমিত্তে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, আত্মীয়-স্বজনের বিরহ-জ্বালা সহ্য করে যে কোন মূল্যে দ্বীন ইসলামের হেফাজত করে, তাদেরকে আলোচ্য আয়াতে সরব অবলম্বনকারী বলা হয়েছে। আর তাদেরকে অগণিত সওয়াব দানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

তফসীরকারগণ এ-ও বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত জাফর এবনে আবি তালেব (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে। তিনি মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে আবিসিনিয়ায় গমন করেন। আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জনদের ছেড়ে যান তিনি, কিন্তু দ্বীন ইসলাম ছেড়ে দিতে রাজী হননি তিনি, শত নির্যাতন সহ্য করেও দ্বীন ইসলামের প্রতি তিনি ছিলেন অবিচল। যত দুঃখ-যাতনাই এসেছে তাঁরা তা হাসি মুখে বরণ করেছেন এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, সকল অনুগত বন্দাকে তার আমলের সওয়াব পরিমাপ করে দেয়া হবে, কিন্তু সবর অবলম্বনকারীদেরকে বে-হিসাব দেয়া হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (কেয়ামতের দিন) পরিমাপের জন্যে পাল্লা স্থাপন করা হবে। নামাযীদেরকে হাযির করা হবে, তাদের নামাযের ওজন করে তাদেরকে পুরোপুরি সওয়াব দেয়া হবে এবং সদকা খয়রাত দানকারীদেরকে আনা হবে এবং তাদের আমলের ওজন মোতাবেক তাদেরকেও পুরোপুরি সওয়াব দেয়া হবে। হাজীদেরকে হাযির করা হবে, তাদের আমলের ওজন করে পুরোপুরি সওয়াব দেয়া হবে। আর যারা দ্বীন ইসলামের জন্যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, তাদেরকেও ডাকা হবে, কিন্তু তাদের আমল পরিমাপের জন্যে কোন পাল্লা থাকবেনা, তাদের আমলের রেকর্ডের জন্যে কোন দফতর খোলা হবেনা, তবে তাদেরকে অগণিত সওয়াব দান করা হবে। তাদেরকে এত বেশী দান করা হবে যে, দুনিয়াতে যারা নিরাপদ অবস্থায়

জীবন যাপন করেছে, তারা এ আক্ষেপ করবে যে, যদি দুনিয়াতে তাদের দেহকে কেচি দ্বারা কর্তন করা হতো তবুও ভাল ছিল, কেননা তারা আজ এ অগণিত সওয়াব লাভ করতো। আলোচ্য আয়াতের এটিই হলো অর্থ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, কেয়ামতের দিন শহীদকে হাযির করা হবে, হিসাবের জন্যে তাকে দাঁড় করানো হবে, এরপর যাকাত আদায়কারীকেও হিসাবের জন্যে হাযির করা হবে, এরপর যারা (দ্বীন ইসলামের জন্যে) বিপদাপদ সহ্য করেছে তাদেরকে হাযির করা হবে, তবে তাদের আমলের হিসাবের জন্যে কোন পাল্লা কায়েম করা হবেনা, তাদের আমলের কোন দফতরও খোলা হবেনা, তবে তাদের উপর করুণা-বৃষ্টি হতে থাকবে, এ দৃশ্য দেখে অন্য লোকেরা আক্ষেপ করবে, যদি দুনিয়াতে তাদের দেহকে কর্তন করা হতো তবে তারা অগণিত সওয়াব লাভে ধন্য হতো।[১]

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ
أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوا مَا
شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَ
أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُم مِّن
فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ
بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿١٦﴾

তরজমা

(১১) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকের আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর এবাদত করার জন্যে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৫২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫৬
তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৫৪

(১২) আর আমাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে, যেন আমি সর্ব প্রথম মুসলমান হই।

(১৩) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি আমি আমার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি তবে আমি এক মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

(১৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি এক আল্লাহ্ পাকেরই বন্দেগী করি, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।

(১৫) অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের স্থলে যার ইচ্ছা বন্দেগী কর, (হে রসূল!) আপনি বলুন, কেয়ামতের দিন যারা নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচাতে পারবেনা তারাই প্রকৃত সর্বহারা। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট সর্বনাশ।

(১৬) তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন এবং নীচেও থাকবে আচ্ছাদন, এর দ্বারা আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন (এবং ঘোষণা করছেন) হে আমার বন্দারা! তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হয়ে সবর অবলম্বন করে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অগণিত সওয়াব দান করবেন। আর তা করবেন আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালনের কারণে। এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমাকে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এ আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে একনিষ্ঠভাবে তাঁর বন্দেগী করি, তাঁর বন্দেগীতে কোন কিছুকে শরীক না করি, আর আমার প্রতি এ আদেশও হয়েছে যেন আমি সর্ব প্রথম মুসলমান হই।

শানে নুযুল

তফসীকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি কি কারণে আমাদের নিকট এই নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, আপনি কি দেখেননি আপনার পূর্ব পুরুষরা লাত উজ্জা নামক মূর্তির পূজা করতো। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنِّىْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকের আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর এবাদত করার জন্যে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আর আমাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে, যেন আমি সর্ব প্রথম মুসলমান হই'।

আলোচ্য আয়াত সমূহে দুটি আদেশের উল্লেখ রয়েছে (১) মুসলমান হিসেবে শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা (২) আর দ্বিতীয় আদেশ হল, নবী হিসাবে সর্ব প্রথম মুসলমান হওয়া। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তিনি মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করেন, আর তা তখনই সম্ভব যখন সর্ব প্রথম তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ আয়াতে সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের এবাদতের আদেশ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সে এবাদত হতে হবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্ব প্রকার শেরক থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাতে লোক দেখানোর তথা রিয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবেনা। এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এর দ্বারা সমগ্র উম্মতকে সতর্ক করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এ আদেশও হয়েছে যেন তিনি বলেনঃ আমি সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি, যাতে করে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ আমার আনুগত্যকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে। আর আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগী এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য চাই সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের ভয়। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنِّىْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি আমি আমার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি, তবে আমি এক মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি'।

কেননা আল্লাহ পাকের আদেশ অমান্য করে কেউ নাজাত পায়না, তাই আমি আল্লাহ পাকের কঠিন আযাবকে ভয় করি।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত তখন নাযিল হয়েছে যখন কাফেরদের তরফ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর

পিতা-পিতামহের ধর্ম গ্রহণের আহবান জানানো হয়। তখন তাদের কথার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

قُلِ اللّٰهَ اَعۡبُدُ مُخۡلِصًا لَّهٗ دِيۡنِىۡ ۙ﴿۱۴﴾ فَاعۡبُدُوۡا مَا شِئۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ ؕ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করি, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের স্থলে যার ইচ্ছা তার বন্দেগী কর'।

ইতোপূর্বে শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার আদেশ হয়েছিল, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের একথা জানিয়ে দিন যে, আমি শুধু এক আল্লাহ্ পাকেরই বন্দেগী কর, আর কারো নয়। তোমরা যার ইচ্ছা তার পূজা কর, তবে এর শাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন এবং যিনি আমাকে তাঁর নবী মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের নিকট পথ প্রদর্শক, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি শুধু তাঁরই বন্দেগী করি, একনিষ্ঠভাবে তাঁর বন্দেগী করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ এবং পরিপূর্ণ সাফল্য। যদি তোমরা আমার আহবানে সাড়া না দাও, সত্য গ্রহণে ব্যর্থ হও, সত্যকে বাধাগ্রস্ত করার অপেচষ্টায় লিপ্ত থাক, তবে তার পরিণতিতে যে আযাব আসবে, তা ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাক।

قُلۡ اِنَّ الۡخٰسِرِيۡنَ الَّذِيۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ وَاَهۡلِيۡهِمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, কেয়ামতের দিন যারা নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে বাঁচাতে পারবেনা, তারাই হবে প্রকৃত সর্বহারা'।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে এবং তার পরিবারবর্গের জন্যে জান্নাতে স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যদি বন্দা ঈমানদার ও নেককার হয়, তবে সে জান্নাতের নির্দিষ্ট স্থানই লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যদি বন্দা বেঈমান হয়, তবে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটি অন্য কোন মোমেনকে দিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, সেদিন সে হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত।

অন্য একখানি হাদীসে একথাও বর্ণিত আছে যে, ঐ ব্যক্তিকে দোযখের সে স্থানটিও দেখিয়ে দেয়া হবে, যা থেকে আল্লাহ্ পাক তাকে তার ঈমান ও নেক

আমলের বরকতে নাজাত দিয়েছেন। এমনিভাবে যাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে জান্নাতে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দেয়া হবে, যা সে বেঈমানী ও নাফরমানীর কারণে হারিয়েছে।

اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ۞

'জেনে রাখ এটিই সুস্পষ্ট সর্বনাশ'।

দুনিয়াতে যদি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তার প্রতিক্রিয়া হয় সাময়িক, কিন্তু আখেরাতের সুখ যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি দুঃখও চিরস্থায়ী। যারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা চির দুঃখী হয়, এজন্যেই একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান কে? তিনি এরশাদ করেছেন, যে অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং আখেরাতের জন্যে অধিকতর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর আখেরাতের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যে সুস্পষ্ট সর্বনাশ এবং মহাবিপদ তার বিবরণ স্থান পেয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ

তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন এবং নীচেও থাকবে আগুনের আচ্ছাদন। এক কথায় উপরে নীচে চতুর্দিক থেকে আগুন তাদেরকে ঘিরে রাখবে। দোযখের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তারা ভোগ করতে থাকবে।

ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ

আর এজন্যেই আল্লাহ পাক পূর্বেই এ ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে তাঁর বন্দাদেরকে সতর্ক করে এরশাদ করেছেনঃ

يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ۞

'হে আমার বন্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর'।

অর্থাৎ এমন কাজ থেকে বিরত থাক, যা আমার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এমন অপরাধ করোনা, যার শাস্তি অনিবার্য। তোমরা যদি আমাকে ভয় করে জীবন যাপন কর, তবে আমার নাফরমানী তথা পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারবে, আর এভাবেই পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ
يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ
يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ
وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ
اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ
فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ
اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ
فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾

তরজমা

(১৭) আর যারা শয়তানের পূজা পরিহার করে চলে এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি মনোনিবেশ করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, (হে রসূল!) আমার বন্দাগণকে সুসংবাদ দিন।

(১৮) যারা মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করে এবং যা উত্তম তা মেনে চলে, তারাই সে সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।

(১৯) যার উপর আযাবের আদেশ অবধারিত রয়েছে (সে কি সাফল্যের পথ পেতে পারে?) (হে রসূল!) আপনি কি সে ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারবেন, যে দোযখে রয়েছে।

(২০) কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে বহু প্রাসাদ এবং প্রাসাদের উপর প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত। এসব আল্লাহ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ পাক কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করেন না।

(২১) (হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, এরপর তা পৃথিবীর নদ-নদীতে প্রবাহিত করেন, এবং তা দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের রকমারী ফসল উৎপন্ন করেন, এরপর যখন তা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহ্ পাক তা খড়কুটোয় পরিণত করেন। নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরেক মূর্তিপূজক তথা অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য এই, যেখানে কাফেরদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় বা তাদের শাস্তির ঘোষণা থাকে, তার পাশাপাশি মোমেনদের উদ্দেশ্যে পুরস্কারের ঘোষণাও স্থান পায়। তাই এ আয়াতে মোমেনদের জন্যে পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج

'আর যারা শয়তানের পূজা পরিহার করে চলে এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি মনোনিবেশ করে তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ'।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, বর্ণিত আছে যে এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত যায়েদ এবনে আমর (রাঃ), হযরত আবু জর (রাঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) সম্পর্কে। অনেকের মতে, এ আয়াত যেভাবে উপরোল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত, ঠিক তেমনি সকল যুগের সে সব লোকও এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে আয়াতে উল্লেখিত গুণাবলী রয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত সব কিছু থেকে যারা নিজেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যে যারা মশগুল থাকে, যারা শয়তানের অনুগামী হয়না, যারা শয়তানের পথ পরিহার করে চলে, যা উত্তম তা গ্রহণ করে আর যা অন্যায়-অনাচার তা বর্জন করে তাদের ভবিষ্যত হবে উজ্জ্বল, তাদের পরিণাম হবে শুভ, তারা আখেরাতে লাভ করবে উচ্চ মর্যাদা।[১]

আলোচ্য আয়াতের طاغوت শব্দটি طغيان থেকে নিস্পন্ন, যার অর্থ হলো চরম অবাধ্যতা। এজন্যেই শয়তানকে 'তাগুত' বলা হয়, কেননা সে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৮১

হয়েছে। কারো মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা শয়তানের পূজা পরিহার করে চলে অথচ কেউ শয়তানের পূজা করেনা, সেক্ষেত্রে এ কথার তাৎপর্য কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাব দিয়েছেন, যেহেতু ইবলিস শয়তানই মানুষকে মূর্তির পূজা করার দুর্বুদ্ধি যোগায়, আর এটিই হলো আল্লাহ পাকের চরম অবাধ্যতা, তাই 'তাগুত' শব্দটি দ্বারা ইবলিস শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর যারা আল্লাহ পাকের দিকে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছে তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ, আর এ সুসংবাদ দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে এবং মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

'অতএব, (হে রসূল!) আমার বন্দাগণকে সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করে এবং যা উত্তম তা মেনে চলে। তারাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছেন এবং তারাই বুদ্ধিমান'।

শানে নুযুল

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন একজন আনসারী সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার সাতটি গোলাম রয়েছে, আমি একেক দ্বারে প্রবেশের জন্যে একটি গোলামকে আজাদ করে দিলাম'। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ যারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে, এরপর পবিত্র কোরআনের হেদায়েত মেনে চলে, তাদের জন্যেই রয়েছে এ সুসংবাদ।

তফসীরকার আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ), হরযত তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ), হযরত যোবায়ের এবনে আওয়াম (রাঃ), হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং হযরত সাঈদ এবনে যায়েদ (রাঃ) সমবেত হয়ে তাঁর নিকট আসলেন এবং তাঁর মুসলমান হবার খবরের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন

হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'হ্যাঁ আমি ঈমান এনেছি', তখন তাঁরা সকলেও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

আলোচ্য আয়াতে দু'টি সুসংবাদ রয়েছেঃ

১. যারা আল্লাহ পাকের মহান বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত নসীব করেন।

২. আর তারাই হলো বুদ্ধিমান, অতএব হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া এবং বুদ্ধিমান হওয়া- এ দুটিই হলো সুসংবাদ।

হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের জন্যে প্রযোজ্য। এমনিভাবে, বুদ্ধিমান হওয়ার সুসংবাদও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তফসীরকার এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এ দু'খানি আয়াত তিন ব্যক্তির সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগেও তারা তৌহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা হলেন (১) যায়েদ এবনে আমর এবনে নোফায়েল অথবা সাঈদ এবনে যায়েদ। (২) আবুজর গিফারী (রাঃ) (৩) সালমান ফারসী (রাঃ)। আর আয়াতে যে 'উত্তম কথা'র উল্লেখ রয়েছে, তা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই)।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে বিষয়কে উত্তম বলা হয়েছে তা হলো আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধি-নিষেধ, যা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ যারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে এবং তাতে বর্ণিত বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে, তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত এবং তারাই বুদ্ধিমান।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, পবিত্র কোরআনে জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অথবা ক্ষমা করার অনুমতি রয়েছে, তবে ক্ষমা করাই উত্তম। আলোচ্য আয়াতে উত্তম কথা বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ۞

'যার প্রতি আযাবের হুকুম অবধারিত রয়েছে (সে কি সাফল্যের পথ পেতে পারে?) (হে রসূল!) যে দোযখে পতিত হয়েছে আপনি কি তাকে নাজাত দিতে পারবেন'?

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এলমে যার দোযখী হওয়া নির্ধারিত রয়েছে, তাকে কি আপনি দোযখ থেকে রেহাই দিতে পারবেন?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৫৬-৫৭

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু লাহাব ও তার পুত্র সম্পর্কে। অর্থাৎ কাফেরদের অন্যায় অনাচারের কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে দোযখের শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। (হে রসূল!) আপনি যতই তাদেরকে ইসলাম কবুল করার আহবান জানান, তারা কখনো আপনার আহবানে সাড়া দেবেনা, আর আপনি তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারবেন না। যারা কুফর ও নাফরমানীতে সর্বদা লিপ্ত থাকে, শেরক করে এবং তার উপর জেদ বজায় রাখে, দোযখের অগ্নিকুন্ডই তাদের উপযুক্ত স্থান। সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, সেক্ষেত্রে কোন কাফেরের নাজাত লাভের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রচেষ্টা কি কার্যকর হবে না? এরই জবাব রয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۟ؕ

‘কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্যে রয়েছে বহু প্রাসাদ, এবং প্রাসাদের উপর প্রাসাদ নির্মিত রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত’।

অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে, যারা পরিণামদর্শী, বাস্তববাদী এবং কল্যাণকামী, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত কবুল করে। এমন নেককার, পরহেযগার লোকদের জন্যে বেহেশতে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ নির্মিত রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত হয়।

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝

‘এসব হলো আল্লাহ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ পাক কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করেন না’, প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করা একটি ত্রুটি, আর আল্লাহ পাক সর্ব প্রকার ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র।

জান্নাতে মর্যাদার পার্থক্য

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতবাসীগণ তাদের উপরস্থ প্রাসাদের অধিবাসীদেরকে এভাবে দেখবে, যেমন তোমরা পশ্চিমাকাশে বা পূর্বাকাশে জ্বলন্ত তারকারাজিকে দেখতে পাও। এ অবস্থা হবে জান্নাতবাসীদের পরস্পরের মর্যাদার

পার্থক্যের কারণে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সে স্থানটি হয়তো শুধু নবী রসূলগণের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকবে, যেখানে আর কেউ পৌঁছতে পারবেনা'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ, শপথ সেই আল্লাহ পাকের যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং সকল নবী রসূলগণকে সত্য জানে (তারাও ঐ উচ্চতর স্থানের অধিবাসী হবে)'। (তিরমিজী)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'জান্নাতে এমন মহল রয়েছে, যার ভেতরের অংশ বাইর থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে পরিস্কার দেখা যায়'। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ মহল কাদের জন্যে'? তিনি এরশাদ করলেন, 'যারা দুনিয়াতে বিনম্র ভাষায় কথা বলে, যারা মানুষকে আহার করায় এবং রাত্রিকালে যখন সাধারণতঃ মানুষ নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দন্ডায়মান হয়ে কান্নাকাটি করে, নামায আদায় করে তাদের জন্যে ঐ মহল' (তিরমিজী)।

একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাত কোন্ বস্তু দ্বারা নির্মিত হয়েছে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ একটি ইট স্বর্ণের, আরেকটি ইট রৌপ্যের, আর তার চুনা হলো কস্তুরীর, তার কংকর হল লুলু এবং ইয়াকুত পাথরের আর জান্নাতের মাটি হবে জাফরান, যে তাতে প্রবেশ করবে সে ভাগ্যবান হবে, আর কখনও তার কোন আশঙ্কা বা কোন ভয় হবেনা, সে চিরদিনই সেখানে থাকবে। সেখান থেকে বহিস্কৃত হবার কোন সম্ভাবনা নেই, মৃত্যুরও কোন আশঙ্কা থাকবে না। জান্নাতবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদ পুরাতন হবেনা। তাদের যৌবন সর্বদা থাকবে। শোন, তিন ব্যক্তির দোয়া কখনও ফেরত দেয়া হয়না (১) সুবিচারক রাষ্ট্রপ্রধান, (২) রোজাদার (৩) মজলুম। তাদের দোয়া উপরে উত্থিত হয়, এর জন্যে আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত এরশাদ করেন, 'আমার ইজ্জতের শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও তাতে কিছু বিলম্ব হয়' (তিরমিজী, এবনে মাজা)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের এ প্রতিশ্রুতির কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক কখনও তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট করেন না।[১]

জান্নাতের মহল ও বাগানের বিবরণে আশ্চর্যন্বিত হবার কিছুই নেই, কেননা আল্লাহ পাক দুনিয়াতে তাঁর বন্দাদেরকে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছেন তার

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৮২

প্রতি লক্ষ্য করলেও জান্নাতের বিষয় অনুধাবন করা সহজ হয়ে পড়ে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ۝

'(হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, এরপর তা পৃথিবীর নদ-নদীতে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, এরপর যখন তা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও তখন তা খড়কুটোয় পরিণত করেন। নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে'।

আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা অহরহ পৃথিবীতে দেখা যায়। আর মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের যে অনন্ত অসীম নেয়ামত নাযিল হচ্ছে তা-ও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। আসমান থেকে আল্লাহ পাক বৃষ্টিপাত করেন। নদ-নদী খাল-বিল সব বৃষ্টির পানিতে ভরে যায়। আর ঐ পানি দ্বারাই জমিনে রকমারী ফল ও ফসল উৎপন্ন হয়। আর ঐ ফল বা ফসল যখন পেকে যায় তখন তা পীতবর্ণ ধারণ করে। কয়েকদিন পরে লোকেরা ঐ ফসল কেটে আনে। ঐ সবুজের মেলা শেষ হয়ে যায়, আর তা মানুষের খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। যারা বুদ্ধিমান তারা বিশ্বের এই বিশাল-বিস্তৃত কারখানার প্রতি দৃষ্টিপাত করেও শিক্ষা গ্রহণ করে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রাণবন্ত একজন যুবক কীভাবে একদিন বয়সের ভারে নুয়ে পড়ে, অ ত্যন্ত দুর্বল অসহায়, নিজের শক্তিতে চলাফেরা করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়না। অবশেষে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হয়, সে পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে, এরই নাম জীবন, এই তো জীবনের খেলা, আর এইতো দুনিয়ার মেলা, যা একদিন শেষ হয়ে যাবে।

লক্ষ্যনীয়, ফসলের মধ্যে যেমন মানুষের খাদ্য-দানা থাকে, প্রত্যেকটি জিনিষকে আলাদা না করা পর্যন্ত তার সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয়না, ঠিক তেমনি বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে সমগ্র বিশ্বকে ভেঙে-চুরে তার প্রতিটি অংশ ব্যবহার করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা অহরহ দেখছি আল্লাহ পাক আসমান থেকে বৃষ্টি নাযিল করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বৃষ্টির উৎস রয়েছে উর্দ্ধলোকে। যেভাবে

তিনি আসমান থেকে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করেন, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক জান্নাতেও নির্ঝরমালা প্রবাহিত করবেন।[১]

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ
لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ
نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(২২) আল্লাহ পাক যার বক্ষকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, ফলে সে তার প্রতিপালকের প্রদত্ত নূরের মধ্যে রয়েছে। (সে কি তার সমান? যে এমন নয়) সে সব লোকদের জন্যে বড়ই সর্বনাশ, যাদের অন্তর আল্লাহ পাকের স্মরণে প্রভাবান্বিত হয় না, তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(২৩) আল্লাহ পাক অতি উত্তম বাণী নাযিল করেছেন যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা বার বার আবৃত্তি করা হয়, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের দেহ এর দ্বারা প্রকম্পিত হয়। এরপর তাদের দেহ-মন কোমল হয়ে আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় হয়ে পড়ে, এটিই আল্লাহ পাকের হেদায়েত, তিনি যাকে ইচ্ছা তার দ্বারা হেদায়েত করে থাকেন, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন (হেদায়েত লাভের তৌফিক না দেন) তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক নেই।

(২৪) যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দিয়ে কঠিন কঠোর শাস্তি প্রতিরোধ করতে চাইবে, সে কি পরহেযগার মোমেনের ন্যায় হতে পারে? (সে দিন) পাপীষ্ঠদের বলা হবে, তোমরা যা উপার্জন করেছিলে তার শাস্তি ভোগ করতে থাক।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৫৯৭

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের কিছু নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হেদায়েত লাভের এবং সত্যকে গ্রহণ করার কিছু পূর্ব শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে–

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ ط

'আল্লাহ পাক যার বক্ষকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, ফলে সে তার প্রতিপালকের প্রদত্ত নূরের মধ্যে রয়েছে'।

'শরহে সদরে'র ব্যাখ্যা

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক যার অন্তরকে ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন, ইসলামের সত্যতা এবং সার্থকতা যার অন্তরে বিকশিত হয়, আল্লাহ পাক যার অন্তরকে সকল সন্দেহ থেকে মুক্ত এবং পবিত্র করেন, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নূরের আলোকে যার অন্তর আলোকিত হয়, সে বিনা বাধায়, বিনা দ্বিধায় ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। তার অন্তর-দৃষ্টি খুলে যায়, ইসলামের সত্যতা সে দেখতে পায়, ফলে সে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নূরের মধ্যে থাকে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) একথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, মূলতঃ আল্লাহ পাক বন্দার অন্তরে একটি নূর সৃষ্টি করেন, যার আলোকে বন্দা হক্বকে হক্ব এবং বাতিলকে বাতিল দেখতে পায় এবং বিন্দুমাত্রও সন্দেহ তার মনের কাছেও থাকেনা। সে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত দ্বীনের প্রতি নির্দ্বিধায় ঈমান আনে, মানব মনের এ অবস্থাকে আলোচ্য আয়াতে 'শরহে সদর' বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের 'সূরা আনআমে' আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেন–

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

'আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন, ইসলাম গ্রহণের জন্যে তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেন' তথা ইসলামের সত্যতা অনুধাবনের জন্যে তার মনের কপাট উম্মুক্ত করে দেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে হেদায়েত করার ব্যাপারে যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হয়, তবে তিনি তার জন্যে ইসলাম গ্রহণের পথটিকে সহজ করে দেন। আর এটিই হলো 'শরহে সদর' এর তাৎপর্য।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন আমরা আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! শরহে সদর বা বক্ষ প্রশস্ত করার তাৎপর্য কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন, তার অন্তরে নূর প্রবেশ করিয়ে দেন, ফলে তার বক্ষ প্রশস্ত হয়, তথা ইসলামকে বুঝবার জন্যে তার মনের কপাট খুলে যায়, তার মনে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকেনা। আমরা আরজ করলাম, এর কোন আলামত আছে কী? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ, সে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও জগতের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ থাকেনা, মৃত্যুর পূর্বেই সে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে।[১]

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ নেয়ামত লাভে বঞ্চিত হয়, তারা কঠোর অন্তর বিশিষ্ট হয়, সত্যের আহবান তাদের মনে কোন রেখাপাত করেনা, পরিণামে তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের ব্যাপারে আকৃষ্ট হয় না। এর জন্যে কোন প্রকার প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ۝

'সে সব লোকদের জন্যে বড়ই সর্বনাশ, যাদের অন্তর আল্লাহ পাকের স্মরণে প্রভাবান্বিত হয় না, তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে'।

যাদের মন কঠোর-কঠিন, আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করার কারণে যাদের মনে কোন দাগ কাটেনা, যারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করতেও প্রস্তুত হয়না, তাদের সর্বনাশ অনিবার্য। তাদের পথভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট। বিখ্যাত সুফী-সাধক হযরত মালেক এবনে দিনার (রঃ) বলেছেন, মনের কঠোরতার চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছুই নেই। কোন জাতির প্রতি তখনই আল্লাহ পাকের গজব নাযিল হয়, যখন তাদের মনের নম্রতা শেষ হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে যে সব কোপগ্রস্ত জাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তাতে তাদের মনের কঠোরতার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। পবিত্র কোরআনে সে সব জাতির কথাও বর্ণিত হয়েছে যাদের অন্তর কঠিন নয়; বরং বিনম্র যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৬০

'আর রসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তারা যখন তা শ্রবণ করে তখন তারা যে সত্যের পরিচয় পায়, তার জন্যে তুমি তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখতে পাবে'।

এটি হলো বিনম্র অন্তরের পরিচয়, কিন্তু যারা কঠোর অন্তর বিশিষ্ট, তাদের এ অবস্থা কখনো হয়না, তাই তাদের সর্বনাশ অবধারিত।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ط

'আল্লাহ পাক অতি উত্তম বাণী নাযিল করেছেন, যা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা বার বার আবৃত্তি করা হয়, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের দেহ এর দ্বারা প্রকম্পিত হয়, এরপর তাদের দেহ মন কোমল হয়ে আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় হয়ে পড়ে'।

শানে নুযুল

হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল হতে থাকে, যা তিনি সাহাবায়ে কেরামকে পাঠ করে শোনান, একবার সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এতদ্ব্যতীত, অন্য কিছু যদি শোনাতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

পবিত্র কোরআনের ভাষার অলংকারে, সৌন্দর্য ও মাধুর্য এবং ভাবের উচ্ছাসে, আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্যে পৃথিবীর কোন গ্রন্থই তার সমকক্ষ নয়, এমনকি তার অনুরূপও নয়; কেননা এটি স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান বাণী। মানব রচিত কোন গ্রন্থই মহা গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের সমতুল্য হতে পারেনা, এমন জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ পৃথিবীতে আরেকটি নেই, এর প্রাঞ্জল, মধুর ভাষা অন্যত্র সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। প্রত্যেকটি আয়াত একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সর্বত্র যোগসূত্র বিদ্যমান। এটি এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আল্লাহ পাকের মহান বাণী ব্যতীত মানব রচিত গ্রন্থে এমন যোগসূত্র অকল্পনীয়। এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনের একটি অংশ আরেকটি অংশের ব্যাখ্যায় সহায়ক হিসেবে কাজ করে, এ মহান গ্রন্থের বিধি-নিষেধ, উপদেশ নসিহত বিভিন্ন ভাবে বারে বারে বর্ণিত হয়েছে, যাতে করে পাঠক সহজে এর মর্ম অনুধাবন করতে পারে এবং তা আয়ত্বও করতে পারে। এটিও বন্দার প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া।

পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণই গদ্যে রচিত, অথচ ক্ষেত্র বিশেষে তাতে কবিতার ছন্দ অবর্তমান নয়। পবিত্র কোরআনই এমনি একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ, যা লক্ষ লক্ষ মানুষ মুখস্ত করে রেখেছেন, পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থের ব্যাপারে এ বিষয়টি চিন্তারও অতীত। এ মহান গ্রন্থে একই ধরণের একই মর্মের আয়াত স্থান পেয়েছে, আবার বিপরীত মর্মের আয়াতও একত্রিত রয়েছে, কিন্তু তার সৌন্দর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْ أَنِّىْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ

'(হে রসূল!) আপনি আমার বন্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, আর নিশ্চয় আমার আযাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক'।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্যও বর্ণনাতীত। এর অনেক কিছু উপলব্ধি করার যায়, কিন্তু বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ.......

যাদের মন আল্লাহর ভয়ে ভীত, পবিত্র কোরআন শ্রবণ করলে তাদের দেহ শিহরিত হয়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমাঞ্চ সৃষ্টি হয়, দেহ ও মন কোমল হয়ে আসে, আর মন তখন আল্লাহ পাকের জিকরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন আল্লাহ পাকের ভয়ে বন্দার দেহ শিহরিয়ে ওঠে, তখন তার গুনাহ এভাবে ঝরে যায়, যেমন গাছের শুকনো পাতা।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

এটিই আল্লাহ পাকের হেদায়েত, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা হেদায়েত করেন, আর যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েতের তৌফিক না দেন তথা যে পথভ্রষ্ট হয়, তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই। অর্থাৎ মানব মনে আল্লাহ পাকের ভয় এবং তার রহমতের আশা অথবা কোরআনে করীম। এসবই হলো আল্লাহ পাকের হেদায়েত, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এর দ্বারা হেদায়েত নসীব করেন। আর যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত না করেন, তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারেনা। আর আল্লাহ পাকের হেদায়েত পেতে হলে অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় থাকা একান্ত জরুরী। এজন্যেই পবিত্র কোরআনের শুরুতেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

(এই কিতাব পথ প্রদর্শক, তাদের জন্যে যাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয় রয়েছে।)

اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ۝

'যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দিয়ে কঠিন কঠোর শাস্তি প্রতিরোধ করতে চাইবে, সে কি পরহেযগার মোমেনের ন্যায় হতে পারে? (সেদিন) পাপীষ্ঠদেরকে বলা হবে, তোমরা যা উপার্জন করেছিল তার শাস্তি ভোগ করতে থাক'।

এ আয়াতে কেয়ামতের দিন কাফেরদের যে করুণ অবস্থা হবে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাধারণতঃ কারো প্রতি যদি কেউ আক্রমণ করে সে তা তার হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে, কিন্তু কেয়ামতের দিন কাফেরদের হাত বাঁধা থাকবে, এজন্যে আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা হাত ব্যবহার করতে পারবে না, তাদের মুখমন্ডলেই হবে আযাবের আঘাত, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ 'যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দিয়ে কঠিন আযাব প্রতিরোধ করতে চাইবে সে ব্যক্তি কি পরহেযগার মোমেনের ন্যায় হবে? (তা কখনও নয়)'।

মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু কাফেরদেরকে হাত পা বেঁধে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তাই তাদের চেহারাতেই সর্ব প্রথম অগ্নি দগ্ধ করবে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, যেহেতু কাফেরের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং গন্ধকের পাহাড় তার ঘাড়ের সাথে ঝুলন্ত থাকবে এবং দোযখে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধকে আগুন ধরে যাবে, অতএব সে আর দোযখের আযাব থেকে রক্ষা পাবেনা। এবং তাদেরকে তখন বলা হবে তোমরা দুনিয়ার জীবনে যা উপার্জন করেছিলে আজ তাই ভোগ করতে থাক। এমন হতভাগা ব্যক্তি কখনও নেককার মোমেনের ন্যায় হতে পারেনা, যারা আল্লাহ্ পাকের রহমতে দোযখ থেকে নাজাত পেয়েছে।

كَذَّبَ

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ

اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا

الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ

ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ

شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ

مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

তরজমা

(২৫) তাদের পূর্ববর্তী লোকরাও (নবী রসূলগণকে) মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, পরিণামে তাদের উপর এভাবে শাস্তি উপস্থিত হল যে তারা কিছুই বুঝতে পারেনি।

(২৬) আল্লাহ পাক তাদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানের জ্বালা ভোগ করতে দেন, আর আখেরাতের আযাব অত্যন্ত কঠিন, যদি তারা তা বুঝতে পারে।

(২৭) নিশ্চয় আমি এই কোরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(২৮) আরবী ভাষায় এই কোরআন, তাতে কোন জটিলতা নেই, যাতে করে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করে।

(২৯) আল্লাহ পাক একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন, আর এক ব্যক্তির প্রভু শুধু একজন, এ দু' ব্যক্তির অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যেই, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

(৩০) (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে এবং নিশ্চয় তারাও মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

(৩১) এরপর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে বাদানুবাদ করবে।

তফসীরুল কোরআন

যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাকের রসূল হিসেবে মেনে নিতে পারেনি; বরং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, ইসলামের প্রচার-প্রসারে পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, পূর্ববর্তী আয়াতে সে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ নবী রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করা নতুন কিছু নয়, মক্কার কাফেররা যেভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করছে, এমনিভাবে ইতোপূর্বেও বিভিন্ন যুগে প্রেরিত নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে। আর তারা তার ভয়াবহ পরিণতিও ভোগ করেছে।

فَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ۞

নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞানকারী কাফেরদের উপর এভাবে আযাব এসেছে, যা তারা কখনো চিন্তাও করেনি। অতএব, (হে রসূল!) বর্তমানে যারা আপনার বিরোধিতা করছে, তাদের পরিণামও যে ভয়াবহ হবে, তা নিশ্চিতভাবে যেন তারা জেনে রাখে। ইতোপূর্বে পৃথিবীতে কত জাতির আগমন হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের বিরোধিতার কারণে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُمۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۞

'আল্লাহ পাক তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করতে দেন, আর আখেরাতের আযাব অত্যন্ত কঠিন, যদি তারা তা বুঝতে পারে'।

আলোচ্য আয়াতের الخزى শব্দটির অর্থ হলো অবমাননা, লাঞ্ছনা অর্থাৎ ইতোপূর্বে যারা নবী রসূলের বিরোধিতা করেছে, তারা পৃথিবীতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। কারো কারো চেহারা বিকৃত করা হয়েছে, তাদেরকে শুকর বানরে পরিণত করা হয়েছে, আর কোন জাতিকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ শাস্তিই শেষ নয়; বরং আখেরাতের কঠিনতম শাস্তি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

'আর আখেরাতের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন, যদি তারা বুঝতে পারে'। যদি এ কাফেররা আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করার ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে পারতো, তবে এমন অন্যায় কাজ করতো না। অথবা এর অর্থ হলো, যদি মক্কাবাসী বুদ্ধিমান হতো, তবে পূর্ববর্তী কোপগ্রস্ত জাতিগুলোর পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতো।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যদিও দুনিয়াতে কাফেরদের কঠিন শাস্তি হয়েছে এবং তাদের অবমাননা এবং লাঞ্ছনাও হয়েছে অনেক, এমনকি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, কিন্তু আখেরাতের আযাব দুনিয়ার আযাবের চেয়ে অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হবে, দুনিয়ার আযাব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও আখেরাতের আযাব চিরস্থায়ী, কখনো শেষ হবার নয়। এভাবে কাফেরদের সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।[২]

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

'আর নিশ্চয় আমি এই কোরআনের মধ্যে মানুষের হেদায়েতের সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক যার অন্তরের দ্বার ঈমান আনয়নের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে ভাগ্যবান হয়েছে। কেননা, সে হেদায়েতের নূর লাভ করেছে। আর যে হেদায়েতের নূর থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৬১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২৭৫

ভাগ্যাহত হয়েছে। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হক্ব ও বাতিলের এ পার্থক্য বোঝানোর জন্যে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অনেক দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, আর তা করেছেন এজন্যে যেন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং সরল সঠিক পথ অবলম্বন করে।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ۝

'আর এ কোরআন হলো আরবী ভাষায়, এতে কোন জটিলতা নেই, হয়তো তারা তাকওয়া প্ররহেযগারী অবলম্বন করবে'।

কাফেরদের আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীনতা এবং শেরক ও কুফরের প্রতি জেদী মনোভাবই পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম না করার কারণ, তা না হলে কত সুন্দর, প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, তাতে কোন প্রকার জটিলতা নেই। সহজ সরল ভাষায় কোরআনে করীমের এ মহান বাণী পাঠ করে মানুষ যেন আল্লাহকে ভয় করে, তার ভবিষ্যত চিন্তা করে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যের জন্যেই পবিত্র কোরআন নাযিল করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ কথাটির অনুবাদ করা হয়েছে 'তাতে কোন জটিলতা নেই'। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেনঃ পবিত্র কোরআনে কোন স্ববিরোধিতা নেই। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো পবিত্র কোরআনে কোন প্রকার সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো পবিত্র কোরআন সৃষ্ট নয়; বরং মহান স্রষ্টার নিজস্ব কথা। সৃষ্টির কথায় সন্দেহ থাকতে পারে, থাকতে পারে স্ব-বিরোধিতা, কিন্তু মহান স্রষ্টার কালামে এমন দুর্বলতার কোন সম্ভাবনা নেই। ইমাম মালেক (রঃ)-ও আলোচ্য বাক্যের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো এতে কোন স্ব-বিরোধিতা নেই, এজন্যেই আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

'যদি এই কোরআন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে হতো, তবে লোকেরা তাতে অনেক মতবিরোধ দেখতে পেত'।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৬৬
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২৭৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৬২

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا

'আল্লাহ পাক একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, এক ব্যক্তির মধ্যে কয়েকজন জেদী অংশীদার রয়েছে, আর এক ব্যক্তি পুরোপুরি একজনেরই, তাদের উভয়ের দৃষ্টান্ত কি সমান হতে পারে'?

শেরক এবং তৌহীদের পার্থক্য অনুধাবনের জন্যে এ আয়াতে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। একটি গোলামের কয়েকজন মালিক রয়েছে, তারা পরস্পরের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাকে ক্রয় করেছে। এবং ঐ মালিকদের পরস্পরের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব রয়েছে। তারা পরস্পর বিবদমান থাকে, প্রত্যেকে চায় গোলাম শুধু আমার মর্জিতেই চলুক, সে শুধু আমার কথাই শুনুক। পরিণামে সে কারো সেবাই করতে পারেনা, সে মালিকদের পরস্পরের জেদ, অহংকার এবং বিবাদের শিকার হয়।

দ্বিতীয় গোলামের মুনিব একজনই, সে সর্বক্ষণ তার মুনিবের সেবায় রত থাকে। আর তার মুনিবও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তারা উভয়ে কি এক সমান হতে পারে? তা কখনো নয়; কেননা যার অধিক সংখ্যক মুনিব রয়েছে সে সকলের খোশামোদ করেই সময় অতিবাহিত করে, তবু সবাইকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করতে পারেনা, অথচ যার একজন মাত্র মুনিব, সে তার মুনিবের সেবায় সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিয়োগ করে। এ দু'জন কখনো এক সমান হতে পারেনা। কেননা যার একজন মাত্র মুনিব, সে নিশ্চিন্ত, নিঃশঙ্ক মনে জীবন যাপন করে, আর যার একাধিক মুনীব সে সর্বদা অস্থির ও ব্যাকুল থাকে।

বস্তুতঃ এটিই হলো তৌহীদপন্থী এবং মুশরেকের পার্থক্য, যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং ঈমান আনয়নের পর তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে, সে নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করে, আর যে মুশরেক, যার প্রভূ বহু, তার জীবনে শান্তি নেই, বরং চরম অশান্তিতেই তার জীবন অতিবাহিত হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই, তবে অধিকাংশ লোক একথা জানেনা'। মূর্খতার কারণে তারা অন্য কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করে।

কোন কোন তফসীরকার এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এ বাক্যটির পূর্বে قل শব্দটি গুপ্ত আছে। অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকই তৌহীদের

নেয়ামত দান করেছেন এবং তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের তৌফিক দান করেছেন, অতএব প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ পাকের জন্য, অনেকেই এ সত্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়। অথবা এর অর্থ হল আল্লাহ পাক এত সুন্দরভাবে হক্ব ও বাতিলের তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং এত সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন, অতএব সমস্ত প্রশংসা নিশ্চয় আল্লাহ পাকের জন্যে। আর এ তত্ত্ব ও তথ্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে দরবারে এলাহীতে আমরা শোকর গুজার।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝

'(হে রসূল!) আপনাকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে এবং তারাও নিঃসন্দেহে মৃত্যুমুখে পতিত হবে'।

অর্থাৎ প্রত্যেকেরই মৃত্যু অনিবার্য, যে করেছে পৃথিবীতে আগমন, তাকে পৃথিবী থেকে অবশ্যই করতে হবে গমন।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যু কামনা করতো, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ (হে রসূল!) এতে কোন সন্দেহ নেই একদিন আপনাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। কিন্তু তাতে এ কাফেরদের খুশি হওয়ার কিছু নেই, কেননা অবশেষে তাদেরকেও মৃত্যু মুখে পতিত হতে হবে। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে (হে রসূল!) আপনাকেও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আপনার প্রতিপালকের নিকট হাযির হতে হবে। আর এ কাফেরদেরকেও হাযির করা হবে। তখন তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝

'এরপর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে বাদানুবাদ করবে'।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, এ বাদানুবাদ বা ঝগড়া হবে মোমেন ও কাফের এবং জালেম ও মজলুমের মধ্যে। আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীও একথাই বলেছেন।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেনঃ যখন এ আয়াত নাযিল হল, আমরা মনে করেছি পরস্পরের ঝগড়া হবে আমাদের ও কাফেরদের মধ্যে, আমাদের নিজেদের মধ্যে হবে না, কেননা আমাদের দ্বীন এক, আমাদের রসূল এক, কিন্তু যখন হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-

এর মধ্যে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ হল তখন আমরা উপলব্ধি করলাম আলোচ্য আয়াতে যে বিবাদের কথা বলা হয়েছে, এটিই হল সেই বিবাদ।

আবদুর রাজ্জাক, এবনে হোমায়েদ, এবনে আসাকের ইবরাহীম নখয়ীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল তখন আমরা মনে করলাম আমরা সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই, আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই, কিন্তু যখন হযরত ওসমান (রাঃ)-কে শহীদ করা হল, তখন আমরা উপলব্ধি করলাম যে, আলোচ্য আয়াতে যে বিবাদের কথা বলা হয়েছে এটি তার অন্যতম।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই মোকদ্দমা পেশ করবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে অথচ আমি সত্যের উপর ছিলাম, আমি তাদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছিলাম, তারা ছিল বাতিলপন্থী, মুশরেক, আমি তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি, আমি তাদের নিকট তোমার বিধি-নিষেধ পৌছিয়েছি, কিন্তু তবুও তারা তাদের সত্যদ্রোহীতা অব্যাহত রাখে। তখন কাফেররা বলবে, আমাদের নিকট কোন নবী রসূল পৌছেন নাই। তাদের একথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে ফেরেশতাদের এবং আসমান জমিনের সাক্ষ্য দ্বারা, এমনকি তাদের হাত পা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এভাবে কেয়ামতের দিন পরস্পরের বাদানুবাদের নিষ্পত্তি করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষের পরস্পরের কলহ দ্বন্দ্বের মধ্যে সর্ব প্রথম হত্যাকান্ডের বিচার হবে।

তিরমিজী ও এবনে মাজা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিহত ব্যক্তি তার এক হাতে তার মাথাকে ঝুলন্ত অবস্থায় আর এক হাতে তার ঘাতককে ধরে নিয়ে আসবে এবং দরবারে এলাহীতে আরজ করবে, এ ব্যক্তিই আমাকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ পাক ঘাতককে বলবেন, তোর ধ্বংস হোক, এরপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (তিরমিজী)

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৬৪

তেবরানী হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার ব্যাপারে মোকদ্দমা পেশ করা হবে। আল্লাহর শপথ! স্বামী তার রসনা দ্বারা কিছু বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত পা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এমনিভাবে পুরুষের হাত পা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে সে তার স্ত্রীর উপর কি জুলুম করেছিল। এমনিভাবে মনিব এবং চাকরের বিষয়ও সেখানে পেশ করা হবে।

হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম দু' প্রতিবেশী তাদের মোকাদ্দমা নিয়ে হাযির হবে।

বোখারী শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কারো প্রতি যদি তার ভাইয়ের হক্ব থাকে তবে দুনিয়াতেই তার মীমাংসা করে নেয়া উচিত, কেননা (আখেরাতে) দেরহাম, দিনার বা টাকা পয়সা থাকবে না। যদি কারো কোন নেক আমল থাকে তবে হক্বদারকে তার হক্ব মোতাবেক ঐ নেক আমল দিয়ে দেয়া হবে। যদি জালেমের কোন নেক আমল না থাকে তবে মজলুমের গুনাহ তার উপর চড়িয়ে দেয়া হবে।[১]

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২৩শে অক্টোবর মোতাবেক ২৭শে জমাদিউল উলা রোজ সোমবার বেলা ১টায় তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৩ তম খন্ডের রচনা সমাপ্ত হল। হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনা এবং এ মহান গ্রন্থকে পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। আমীন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৬৯-১৭১